Presented to Dharaniranjan
Bhattacharya as a mark
of sincere respect.
23rd April ? Sivanath Sastri

ধর্ম্মজীবন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত

উপদেশাবলী।
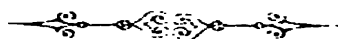
দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক
বিবৃত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রবাসী কার্য্যালয়।
২১০।৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

১৩২১

ভূমিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া "ধর্ম্মজীবন" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগরূপে প্রকাশিত হইল। এগুলি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকারা যদি আপনাদিগকে উপকৃত বোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। আমার শরীর পীড়িত, সুতরাং মনে ভয় রহিয়াছে, যে গ্রন্থখানি যেরূপ ভ্রম-প্রমাদ-শূণ্য হওয়া উচিত ছিল, তাহা বুঝি হইল না। যাহা হউক জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, এতদ্দ্বারা তাঁহারই নাম মহিমান্বিত হউক।

কলিকাতা।
২৯ পৌষ ১৩২১।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

সূচিপত্র।

ধৰ্ম্মজীবন

ঈশ্বরান্বেষণ

The young lions *do* lack and suffer hunger; but they that seek the Lord *shall* not want any good thing.—Ps. XXXIV—Verse 10.

অর্থ—যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ও অভাব হয়, সে ও ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে নিশ্চয় তাহা-দের কোনও উৎকৃস্ট বিষয়ের অভাব হইবে না।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধৰ্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যে দায়ুদের সঙ্গীতাবলী নামে যে গ্রন্থ আছে, তাহা হইতে পুর্ব্বোক্ত বচন উদ্ধৃত হইল।

সর্ব্বাগ্রে সকলকে shall শব্দটীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। এই শব্দটী কিরূপ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক! দায়ুদ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, যে যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে, তাহাদের কোনও উৎকৃস্ট বিষয়ের অভাব হইবে না। এই সুদৃঢ় প্রতীতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? তিনি নিশ্চয় নিজ জীবনে অথবা অপরাপর বিশ্বাসিগণের জীবনে

ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন, নতুবা এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

সে যাহা হউক এখন আমরা আলোচনা করি—"যৌবন-প্রাপ্ত সিংহেরও অভাব হয়"—একথা বলিবার অভিপ্রায় কি? যৌবন-প্রাপ্ত সিংহ পদাবলী আমাদের অন্তরে কি ভাব আনিয়া দিতেছে? সিংহ যত দিন শিশু থাকে, তত দিন তাহার মাতার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে; সে মাতার সঙ্গে বিচরণ করে; মাতার কাছে কাছে থাকে; মাতা অপর প্রাণীকে হত্যা করিয়া দিলে তবে আহার করিতে পায়। কিন্তু সে যৌবন-প্রাপ্ত হইলেই এ সমুদায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন সে আর মাতার উপর নির্ভর করে না; তখন নিজ বলের পরিচয় পাইয়া তাহার মন যৌবন-মদে উন্মত্ত প্রায় হয়; তখন তাহার গর্জ্জনে অরণ্যবাসী প্রাণী সকল কাঁপিতে থাকে; তখন সে নিজে অপর প্রাণীদিগকে হত্যা করিতে আনন্দ পায়; বলদর্পে স্ফীত হইয়া অপর প্রাণীদিগের উপর লম্ফ দিয়া পড়ে; এবং দন্ত ও নখের আঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহ বলিলে এই বল-জনিত দর্পের ভাবই আমাদের অন্তরে আসে।

এ জগতে মানুষও অনেক সময়ে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় নিজ বল-দর্পে দৃপ্ত হইয়া থাকে। ধন-বল, জন-বল, জ্ঞান-বল, ধর্ম্ম-বল প্রভৃতি অনেক প্রকার বল আছে। এই সকল প্রকার বলের দর্পেই মানুষকে স্ফীত দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনীদিগের ধনের দর্প, রাজাদিগের রাজশক্তির দর্প, সকলেরই সুপরিচিত, বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতেছি সভ্যতাভিমানী পরাক্রমশালী জাতি সকল যেখানে কৃষ্ণবর্ণ দুর্ব্বল জাতিদিগের সংস্রবে আসিতেছেন, সেখানেই তাহাদিগকে পশুযূথের ন্যায় হত্যা করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের পরাক্রম ও শক্তির জ্ঞান-জনিত দর্পেরই কাজ। জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও পরের প্রতি উৎপীড়ন আছে তাহার মূলে বল-জ্ঞান-জনিত দর্প বিদ্যমান।

এই বল-জ্ঞান-জনিত দম্ভ যে কেবল ধনবান ও পরাক্রমশালী ব্যক্তিদিগেরই হয়, তাহা নহে, জ্ঞান ও ধর্ম্মজনিত দম্ভও আছে। একজন কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোচনা করিয়াছেন, হয় ত দর্শনশাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি অপরের সহিত আপনার তুলনা করিয়া দেখিতেছেন যে, পাদপহীন দেশে যেমন এরণ্ড বৃক্ষের মস্তক উন্নত দেখায়, তেমনি অজ্ঞ সমাজের মধ্যে তাঁহার মস্তক উন্নত দেখাইতেছে, অতএব তিনি এই ভাবিয়া মনে মনে দম্ভ করিতেছেন যে, আমার ন্যায় জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক আর নাই। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় এই সকল ব্যক্তি প্রধানতঃ আপনাদেরই উপরে নির্ভর করিয়া থাকেন; সুতরাং প্রকৃত উৎকৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন লাভে তাঁহারা বঞ্চিত হন।

এই দম্ভের ন্যায় ধর্ম্মজীবনের শত্রু আর নাই। এই কারণেই ভক্তি-পথাবলম্বিগণ দীনতাকে ভক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ করিয়াছেন। তোমার সমক্ষে যদি একটি দশ হস্ত উচ্চ মৃত্তি-

কার স্তূপ থাকে, তাহাতে যেমন হিমালয়কেও তোমার দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে, তেমনি একটু দম্ভ তোমার দৃষ্টি হইতে অপরের পর্ব্বত প্রমাণ সাধুতাকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। তুমি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে যে দিকে চাহিতে যাও সেই দিকেই একটা স্তূপ তোমার দৃষ্টিকে রোধ করে, সেটা তোমার নিজের মস্তক, তবে আর তুমি সাধু জনের সাধুতা বা কি দেখিবে এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বই বা কি বুঝিবে! যে রূপবতী নারীর নিজের রূপের জ্ঞান আছে এবং প্রতি পদবিক্ষেপে সেই রূপের জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাঁহাকে যেমন সেই কারণেই কদর্য্য দেখায়, তেমনি যাহার মনে জ্ঞান-জনিত বা ধর্ম্ম-জনিত দম্ভ আছে, তাঁহাকে ও কদর্য্য দেখায়। তবে দেখিতেছি ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা সর্ব্ববিধ দম্ভ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। তৎপরে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরান্বেষণ কাহাকে বলে? এবং ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কি প্রকার মন লইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বচনে বলা হইয়াছে—"যাহারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে," এরূপ বলা হয় নাই—"যাহারা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করে।" যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে ও যাহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, এ উভয়ে যে অনেক প্রভেদ তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। কেবল মাত্র নির্ভয়

বলিলে সকল কথা বলা হয় না। কারণ নিতান্ত স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যক্তি ও ইষ্ট-দেবতার প্রতি নির্ভর করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালী পূজা করে; কারণ তাহারা আশা করে যে, কালীর সাহায্যে স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইবে; কালীর সাহায্যের প্রতি তাহাদের নির্ভর থাকে। এই নির্ভরের মূলে কি ভাব? তাহারা তদ্দ্বারা কি কালীকে অন্বেষণ করে? অথবা আপনা-দিগকেই অন্বেষণ করে? সকলেই বলিবেন—তাহারা আপনা-দিগকেই প্রধানতঃ অন্বেষণ করে; স্বার্থ-সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য, কালী তাহার সহায় ও উপায় মাত্র। তেমনি মানুষ অনেক স্থলে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাহার মূলে এই ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে—হে ঈশ্বর আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার দ্বারা। ইহা ত ঈশ্বরান্বেষণ নহে, ইহা নিজেরই অন্বেষণ। প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী ব্যক্তির প্রার্থনা এই—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার দ্বারা।" ঈশ্বরান্বেষণের মূলে আত্ম-বিস্মৃতি; যেখানে আত্ম-বিস্মৃতি নাই, সেখানে ঈশ্বরান্বেষণও নাই।

এই আত্ম-বিস্মৃতি হইতেই অকৃত্রিম বৈরাগ্যের উদয় হয়। একটী বালকের একটী পায়রা উড়িয়া যাইতেছে, সে সেই পায়রাটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিমগ্নচিত্তে দৌড়িতেছে, ও দিকে তাহার স্কন্ধের চাদর কাদায় লুটাইতেছে, সে তাহা জানিতেও পারিতেছে না, পথের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ওরে তোর চাদর গেল।" তেমনি যে সাধু একাগ্র-

চিত্তে, ঈশ্বরান্বেষণ করেন, তাঁহার স্বার্থের বসন খসিয়া যায়, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না, জগতের লোক হয় ত বলাবলি করে, "দেখ দেখ লোকটার স্বার্থ একেবারে খসিয়া গেল?" ইহাকেই বলে আত্ম-বিস্মৃতি-জনিত প্রকৃত বৈরাগ্য।

অতএব প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণের প্রথম ও মূলগত ভাব আত্ম-বিস্মৃতি;। যেখানে আত্ম-বিস্মৃতি সেই খানেই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা! যিনি প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তাঁহার ঈশ্বরান্বেষণ ভিন্ন অন্য অভিসন্ধি নাই। যে মনে অভিসন্ধি নাই,তাহাই নির্ম্মল মন। এরূপ নির্ম্মল মনেই ঈশ্বরের মুখজ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে সর্ব্বদেশেরও সর্ব্বকালের সাধুগণের একবাক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ বলেন—"জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই নিষ্কল পুরুষকে দেখিতে পান। বাই-বেল গ্রন্থে আছে—"Blessed are the pure in heart for they shall see God" অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহারাই ধন্য; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন। ইহা একই উপদেশ। নির্ম্মল মন না হইলে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করা যায় না; কিন্তু নির্ম্মল মন লাভ করার ন্যায় কঠিন সাধন ও আর নাই! আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে দিবানিশি সজাগ থাকিয়াও অনেক সময়ে আপনাদের হৃদয়কে ক্ষুদ্র অভি-সন্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারিনা। এমন কি ক্ষুদ্র অভিসন্ধি

অনেক সময়ে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসে। তখন আমাদের আর উপায় থাকে না। আপনাদের এই দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে একটী প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কথা স্মরণ হয়। সে কাহিনীটী এই ;—ক্রূরমতি মহীরাবণ রাত্রিযোগে রাম লক্ষ্মণকে হরণ করিবার চেষ্টাতে আছে। বিভীষণ হনুমানকে দ্বারে রাখিয়া বলিয়া গেলেন,—"স্বয়ং কৌশল্যা আসিলেও দ্বার ছাড়িবে না।" হনূ তথাস্তু বলিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহীরাবণ নানারূপ ধারণ করিয়া আসিতে লাগিল। কখনও ভরত হইয়া, কখনও জনক হইয়া, কখনও কৌশল্যা সাজিয়া আসিল, হনূ কিছুতেই দ্বার ছাড়িলেন না। অবশেষে মহীরাবণ বিভীষণের আকার ধারণ করিয়া আসিল। তখন হনূর সতর্কতাতে আর কুলাইল না। যে বিভীষণ তাঁহাকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শত্রু যখন তাঁহার আকারে আসিল, তখন হনূ পরাস্ত হইয়া গেলেন। সেইরূপ যে ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে দ্বার রক্ষাতে নিযুক্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র অভিসন্ধি যখন সেই ধর্ম্মবুদ্ধির আকার ধারণ করিয়া আসে তখন আমরা আর আত্মরক্ষা করিতে পারি না। এই জন্যই বলিয়াছি সকল প্রকার ক্ষুদ্র অভিসন্ধি হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার ন্যায় কঠিন সাধন আর নাই। অথচ ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা না হইলে প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণই হয় না।

তৃতীয়তঃ যে সাধু প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তিনি ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইবার জন্য প্রস্তুত। তুমি যদি ঈশ্বরকে এ কথা

বলিতে না পার—'তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিব, যাহা ছাড়া প্রয়োজন তাহা ছাড়িব,' তবে তুমি কিরূপ ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছ? ইহাকে যদি তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ মনে না কর, তবে কি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইহার অন্বেষণ করিতে পার? আমার পাইলেও হয়, না পাইলেও ক্ষতি নাই, এরূপ মনের ভাব লইয়া কি কেহ নিমগ্ন চিত্তে কোনও বিষয়ের অন্বেষণ করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরকে লাভ করিতে গিয়া যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্—এরূপ চিত্ত ভিন্ন তাঁহার অন্বেষণ হয় না। এরূপ ভাবের মূলে আনুগত্য—অর্থাৎ আমি সর্ব্বতো-ভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইতে প্রস্তুত এই ভাব। এটীও ঈশ্বরান্বেষণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই ভাব হইতেই ধর্ম্মজীবের বীরত্বের উদয় হয়। এরূপ ব্যক্তি অকুতোভয়ে সত্যের অনুসরণ করেন, এবং ক্ষতিলাভের চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন।

পূর্ব্বোক্ত বচনের সর্ব্বশেষ উক্তি—ঈশ্বরান্বেষীর কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভাব হইবে না। ইহা আমরা দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট বিষয় আর নাই, অতএব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ যে কোনও বিষয়ের প্রয়োজন তাহারও অভাব হইবে না। তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে

ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যদি তোমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, অর্থ পাইবে, মানুষের প্রয়োজন হয় মানুষ পাইবে, সে জন্য ভাবিও না, কেবল এই দেখ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতেছ কি না? সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ ধন জনেরও অভাব হইবে না, তাহা হয় ত অনেকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অথচ জগতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যেখানেই মানব নিঃস্বার্থ ও অকপট ভাবে ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছে, অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কার্য্যে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছে, সেই খানেই ধন জনের অপ্রতুল থাকিতেছে না। অপর দিকে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের নিজের অভাব নিবারণের কারণ ও আয়োজন সত্বেও সে যেমন কখন কখনও ক্ষুধায় মরে, তেমনি ধনে জনে বলবান ব্যক্তিরাও হয় ত কৃতকার্য্যতা লাভে অসমর্থ হইতেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ও বিনয়ী সাধু ঈশ্বরের প্রচুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

ধর্ম্মজীবনের উপাদান

আমরা ধর্ম্মজগতে তিন প্রকার বিভিন্ন ভাবাপন্ন তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শ্রেণীর সাধকগণ মতের বিশুদ্ধতাকেই ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ মতকে সত্য মত ও ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি কেহ সেই মতগুলিকে অবলম্বন না করে, তবে তাঁহারা সেরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম্মজীবন হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই বিদ্বেষ-বুদ্ধির মূলে প্রবেশ করিলে আর একটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের এই বিশ্বাস আছে যে বিকৃত-হৃদয় না হইলে কেহ সত্যকে বিকৃত ভাবে দর্শন করে না। আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি তাহাই সত্য, সুতরাং যাহারা তাহাকে বিকৃত ভাবে দর্শন করিতেছে তাহাদের হৃদয় নিশ্চয় বিকৃত। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ সামান্য মত ভেদের জন্য বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগকে দস্যু তস্করের ন্যায় শাস্তি দিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বদেশে বিদেশে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের সহিত বিবাদ, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও

পরস্পরকে নিগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি বঙ্গবাসীদিগের সুবিদিত; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে এরূপ বিরোধ ঘটনা হইয়াছে যে দ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণদিগের জল গ্রহণ করেন না; অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবাদীদিগের জল গ্রহণ করেন না। এক জাতীয় লোক হইয়াও তাঁহারা পরস্পরকে বিভিন্ন জাতীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ত গেল বর্ত্তমান সময়ে; এ দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তেও এই মত-বিভেদ-জনিত বিদ্বেষের প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশে এক কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধকদিগের মধ্যে যে বিবাদ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার সমুদয় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু এই মত-বিরোধ-নিবন্ধন যে পরস্পরকে অনেক নিগ্রহ করা হইত তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে এতদ্দেশেই এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে; অপরাপর দেশেও এই ভাবাপন্ন লোক-দিগের কার্য্যের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কথাতে প্রয়োজন কি, প্রাচীন গ্রীকগণ যে খ্যাতনামা সক্রেটিসকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? তিনি কোন্ অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন? কোন্ গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন? তিনি কি দস্যু বা তস্করের ন্যায় পরস্বাপহরণ করিয়াছিলেন? অথবা দুষ্ক্রিয়ান্বিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিহীন লোকের ন্যায় ধর্ম্ম-শৃঙ্খলকে ভগ্ন করিয়াছিলেন? তবে কোন্ অপরাধে তাঁহার প্রতি এই গুরুতর দণ্ডের

বিধান হইল ? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা শত শত যুবকের মনে ঈশ্বর-পরায়ণতা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তিনি কোন্ অপরাধে নরহন্তা দস্যুর ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন ? ইহার উত্তর এই—সক্রেটিস এমন কোনও কোনও মত প্রচার করিয়াছিলেন যাহা প্রচলিত মতের বিরোধী। সুতরাং প্রাচীন মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ তাঁহাকে চোরের অধম বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে যদি আমরা মহাত্মা যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই ? তিনি কোন্ অপরাধে চোরের শাস্তি পাইলেন ? তিনি কি দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক ছিলেন ? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জগতের কোটি কোটি নরনারী ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে তিনি কি এক জন দস্যুর শাস্তি ভোগ করিবার উপযুক্ত ? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাইলেট যখন য়িহুদীদিগকে বলিলেন,—"বিশেষ উৎসবের দিনে একজন কয়েদীকে নিষ্কৃতি দিতে চাই,—তোমরা কি বল ? এই যীশুকে কি নিষ্কৃতি দিব ?" তখন য়িহুদিগণ বলিল, —"না বরং বারাবাস নামক চোরকে নিষ্কৃতি দিন, কিন্তু যীশুকে হত্যা করুন।" একজন দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক নিষ্কৃতি পাইয়া তাহাদের সমাজে প্রবেশ করে, ইহা তাহাদের পক্ষে শ্রেয় বোধ হইল ; কিন্তু যীশুর প্রাণ রক্ষা শ্রেয় বোধ হইল না। তিনি চোরেরও অধম বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহার কারণ কি ? কারণ মতের বিশুদ্ধতার প্রতি য়িহুদীদিগের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাহারা মতের বিশুদ্ধতার দ্বারাই মানুষের বিচার করিত।

সর্ব্বত্রই মতের বিশুদ্ধতাবাদীদিগের অল্লাধিক পরিমাণে এই ভাব।

এই মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ যেমন এক দিকে মতের বিশুদ্ধতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্মজীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের যদি মতের বিশুদ্ধতা থাকে কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অপরাপর লক্ষণ-গুলি না থাকে, তথাপি তাঁহারা সে ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মনে কর একজন ব্রাহ্ম আছেন, যিনি দিনের পর দিন ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করেন না; ভুলিয়াও একদিন সাপ্তাহিক উপাসনা মন্দিরে আসেন না; সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে হয় ত গৃহে বসিয়া বন্ধুদিগের সহিত তাস খেলিয়া কাটান; তাঁহার গৃহে কোনও প্রকার গার্হস্থ্য বা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখা যায় না; কিন্তু তাঁহার মতগুলি অতি বিশুদ্ধ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। মতের বিশুদ্ধতা দ্বারা প্রধানতঃ যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করেন, তাঁহাদের নিকট ইনি একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার মতের বিশুদ্ধতার দ্বারা যেন সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে!

এইরূপ ধর্ম্ম-জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ভাবুকতাকেই ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। উৎসাহের সহিত দশজনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলে, অথবা প্রাণায়াম সহকারে একাগ্রতার

সহিত মন্ত্রাবশেষ জপ করিলে যে ভাবোদয়-জনিত এক-প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্তি সুখের আবির্ভাব হয়, তাহাকেই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সুতরাং তদ্দ্বারাই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃস্ফূর্ত্তি সুখ লইয়াই তাঁহারা চরিতার্থ; অপর সকল বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন। মানুষের মত অথবা নীতি বিশুদ্ধ হউক বা না হউক সে দিকে ইঁহাদের দৃষ্টি নাই। একজন সাকারবাদীই হউক অথবা নিরাকারবাদীই হউক, বাক্যে ও ব্যবহারে সত্য-নিষ্ঠই হউক বা কপটচারীই হউক, তাহাতে আসে যায় না; এই বিশেষ ভাবের সাধনে যিনি যত অগ্রসর তিনি এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে তত অধিক সাধক নামের উপযুক্ত।

তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়ার আচরণ ও বাহিরের বিধি ব্যবস্থা পালনকেই ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-সাধন ইঁহাদের চক্ষে কতকগুলি বাহিরের নিয়ম পালন মাত্র; এবং যিনি যে পরিমাণে সেই সকল নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, তিনিই ইঁহাদের চক্ষে সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এই বাহ্য নিয়ম পালনের তুলনায় ধর্ম্ম-জীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের মত বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ হউক, তাহার হৃদয়ে প্রেম থাকুক, বা না থাকুক, তাহাতে আসে যায় না, সে যদি শাস্ত্রোক্ত বা কুলক্রমা-গত নিয়ম সকল মানিয়া চলে, তবেই এই শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবস্থা দেখিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্বয় অগ্রে যাহাই থাকুক এক্ষণে কেবল বাহ্য নিয়ম পালনে দাঁড়াইয়াছে। তোমার মত ও ভাব যেরূপই হউক না কেন, তুমি বাহিরের নিয়মগুলি পালন করিলেই তাহাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

অগ্রে ধর্ম্মজীবনের যে তিন প্রকার উপাদানের উল্লেখ করা গেল, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার কোনওটীকেই অবহেলা করেন না। এই তিনটীই ধর্ম্মজীবনের উপাদান, এবং ধর্ম্মজীবন গঠনে তিনটীরই প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিনটীকে প্রধান উপাদান বলিয়াও সন্তুষ্ট নহেন; আরও কতকগুলি উপাদান আছে, যাহা প্রধান না হইলেও এগুলির পরিপোষক ও সহায়। সেগুলির অভাবে এগুলি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণরূপ কার্য্যকারী হয় না। সেগুলিকে নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীরের পাদরক্ষক ভিত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই পাদরক্ষক ভিত্তিকে এতদ্দেশে পোস্তগাঁথা বলে। ইহা অনেকেরই বিদিত আছে, যে নদীতীরে প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অনেক দূর হইতে পোস্ত গাঁথিয়া তুলিতে হয়। ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, পোস্ত যেমন প্রাচীর নহে, কিন্তু প্রাচীরের দৃঢ়তাবিধান ও রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি এই উপাদানগুলি মুখ্য না হইলেও ধর্ম্মজীবনের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক। সেগুলিকে আর একপ্রকার পদার্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বদা

দেখিতে পাই, যাহারা কোনও পদার্থে কোনও প্রকার রং ধরাইতে চায়,তাহারা সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার রংএর আস্তর দিয়া থাকে। আস্তর না দিলে তাহাতে রং ভাল করিয়া ফলে না, অর্থাৎ সুন্দর দেখায় না। আমি ধর্ম্মজীবনের যে উপাদান-গুলির উল্লেখ করিব তাহারা যেন ধর্ম্মসাধনের আস্তরস্বরূপ। সেগুলি না থাকিলে ধর্ম্মসাধনের ফল সমুচিতরূপ ফলে না।

সেই গৌণ উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম জ্ঞানালোচনা। জ্ঞানালোচনার অভ্যাস ও সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে না। জ্ঞানা-লোচনা বলিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা বুঝিতে হইবে না। সামান্য লৌকিক জ্ঞানের আলোচনাও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া থাকে। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, অঙ্ক, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি কোন ও জ্ঞানই ফেলিবার জিনিষ নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনে সকলেরই উপযোগিতা আছে। যাহাতে চিন্তাশীলতাকে বর্দ্ধিত করে, আত্ম-দৃষ্টিকে জাগরুক করে, চিন্তার উপকরণ সামগ্রী সকলকে মনের মধ্যে সংগৃহীত করে, চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করে মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত ও হৃদয় কে উদার করে, সে সমুদায় কি ধর্ম্মজীবন গঠনের উপযোগী নহে? অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে জ্ঞানালোচনা কখনই উপেক্ষ-ণীয় বস্তু নহে। ব্রাহ্মপরিবার সকলের এ বিষয়ে মনোযোগ

থাকা অতীব আবশ্যক। এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মমাত্রেই জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। এখন অনেক ব্রাহ্মপরিবারের অবস্থা এরূপ দেখা যায় যে তাঁহাদের সমগ্র ভবন অনুসন্ধান করিলে দশখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ মিলা দুষ্কর। অনেকের পাঠাগার প্রাচীরে সংলগ্ন একটী শেলফে পর্য্যবসিত; তাহাও ব্যবহারের অভাবে কীটাকুলিত। এরূপ অবস্থা অতীব শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ইহাকে ধর্ম্মজীবনের একটী প্রধান উপাদান বলাই কর্ত্তব্য। অথচ ইহা ছোট বড় সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আমাদের সকলকেই সংসারে বাস করিতে হয়, গৃহধর্ম্ম করিতে হয়, সকলেরই কিছু না কিছু কাজ আছে। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার কোনও কর্ত্তব্য নাই? যদি আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যকে অতি পবিত্র জ্ঞানে যথোচিত রূপে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করি, তদ্দ্বারা আমাদের চরিত্রের এরূপ শিক্ষা হয় ও ধর্ম্মবুদ্ধির এরূপ বিকাশ হয়, যে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। আমরা কখন কখনও এক প্রকার ধর্ম্মসাধন দেখিতে পাই, যাহা আমাদের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আমরা এক প্রকার ভাবুক লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা ধর্ম্মের কথা বলিতে ও শুনিতে ভাল বাসেন, সেইরূপ আলাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাপন করিতে প্রস্তুত, উপাসনাদিতে বেশ অনুরাগ, ভাবের

উচ্ছ্বাস ও বেশ আছে, ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে তাঁহারা ভাল বাসেন, কিন্তু কর্ত্তব্য-সাধনে মনোযোগ নাই। তাঁহাদের প্রতি কোন ও কার্য্যের ভার দিয়া নির্ভর করিতে পারা যায় না, যে তাহা যথাসময়েও সমুচিত রূপে সম্পাদিত হইবে। একটু সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া বিষয়ান্তরে প্রস্থান করেন। মনে কর ব্রাহ্ম-সমাজের খাতা পত্র রাখিবার ভার একজনের প্রতি আছে ; যেই অদূরে খোলের শব্দ উঠিয়াছে, বা একজন কথা কহিবার লোক জুটিয়াছে, অমনি খাতা পত্র পড়িয়া রহিল, তিনি সেখানে গিয়া জুটিলেন। স্পষ্ট বলিতে কি আমি এরূপ চরিত্রের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করি না। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনের একটা প্রধান লক্ষণ।

তৃতীয় উপাদান নর-হিতৈষণা। আমাদের সমুদায় প্রীতি ও সমুদায় সেবা অল্প-সংখ্যক সমবিশ্বাসী ও সমভাবাপন্ন লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। আমাদের প্রেমকে সমগ্র জগতে বিতরণ করিতে হইবে. ও আমাদের সেবাকে সমগ্র জগতের পরিচর্য্যাতে নিয়োগ করিতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ উদারভাব ভাষাতে ব্যক্ত করিতে ভাল এবং শুনিতেও ভাল, কিন্তু কার্য্যে করা দুষ্কর। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার হৃদয় কিরূপ বিশাল ও প্রীতি কিরূপ উদার ছিল, তাহা সকলে একবার চিন্তা

করুন। স্পেনদেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী স্থাপিত হইলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় টাউনহল-গৃহে ইউরোপীয়দিগকে ভোজ দিয়াছিলেন। ইটালীদেশ-বাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে. এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, তিনি এক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ কিরূপ হৃদয়ের বিশালতা ও কিরূপ প্রেম! তাঁহার সমগ্র চেষ্টা নর-হিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। বল দেখি রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে ভাল ব্রাহ্ম ছিলেন কি আমাদের ন্যায় সংকীর্ণ ও অনুদারচেতা লোক ভাল ব্রাহ্ম ? তাই বলি যখন জ্ঞানালোচনা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নরহিতৈষণা এই তিনটী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-জীবনের ত্রিবিধ উপাদানের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনি পুষ্কল ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া থাকে।

জীবনের উচ্চ আদর্শ।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহং॥
ভগবদ্গীতা।

অর্থ—কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে প্রকার কর্ম্মের আচরণ করে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোক-সংগ্রহ করিবার মানসে, সেইরূপ আচরণ করিবেন।

ভগবদ্গীতাতে পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতা-গ্রন্থ যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, যে গীতাতে সর্ব্বত্রই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; এক শ্রেণী অজ্ঞ ও কর্ম্মে আসক্ত, অপর শ্রেণী জ্ঞানী ও কর্ম্মে অনাসক্ত। গীতার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই, জ্ঞানিগণও অজ্ঞদিগের ন্যায় কর্ম্মের আচরণ করিবেন; প্রভেদ এই মাত্র থাকিবে যে, জ্ঞানিগণ কর্ম্মের আচরণ করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিবেন।

আমরা জানি গীতার এই উপদেশ অনেকের মনঃপূত নহে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে, গীতা জ্ঞানিগণকে কপটাচরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন; যাহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, যাহাকে তাঁহারা অজ্ঞ-জনোচিত মনে করেন, যাহার

আচরণে তাঁহাদিগকে অসত্যের বা অন্যায়ের আচরণ করিতে হয়, গীতা জ্ঞানীদিগকে কেবল মাত্র লোক-সংগ্রহের মানসে এমন কর্ম্মেরও আচরণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় গীতার অভিপ্রায় তাহা নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই গীতার সৃষ্টি। এতদ্দেশে এক শ্রেণীর জ্ঞানী দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহারা সন্ন্যাসকে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগকে ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। এখনও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণ এদেশে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা কর্ম্মের ও আশ্রম-ধর্ম্মের সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ যে অসত্য, অন্যায়, বা অধর্ম্ম বোধে কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম বন্ধন-রজ্জু এই বোধেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গীতা এই শ্রেণীর সাধককে বলিতেছেন ;—কর্ম্ম তোমাদের পক্ষে নিস্প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শনের জন্য ইহার আচরণ কর। এই ভাব যে ধর্ম্মজগতে সম্পূর্ণ নূতন, অথবা গীতাতেই কেবল ইহা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে ; অন্যান্য অনেক স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশীয় বৈষ্ণবগণের একটী বচন প্রচলিত আছে,— "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" মহাত্মা চৈতন্যের সম্বন্ধে তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। চৈতন্যকে তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, স্বয়ং ভগবানের পক্ষে

ধর্ম্মসাধনের বাহিরের নিয়ম সকল পালন করা প্রয়োজনীয় না হইলেও লোক-শিক্ষার জন্য তিনি ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়গণও এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং ভগবান জগতকে পুত্রত্বের ও বাধ্যতার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য পুত্ররূপী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহই তাঁহার অবতারত্ব স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য। লোক-সংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মের আচরণ, এই ভাব অপরাপর স্থলে এবং অপরাপর ভাবেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডে এরূপ অনেক ভদ্রলোক আছেন যাঁহারা লোক-সংগ্রহের উদ্দেশেই, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই, সম্পূর্ণ-রূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনও দিন পরিমিত পরিমাণে একটু সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না; অথচ এইজন্য সম্পূর্ণরূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটু পান করিবার রীতি রাখিলে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সুরাপায়ী হইয়া অতিরিক্ত মাত্রাতে গমন করে। এ যুক্তি যে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর তাহাও বলিতে পারা যায় না।

সে যাহা হউক, আমরা গীতার পূর্ব্বোক্ত বচনটী হইতে আর এক প্রকার উপদেশ লাভ করিতে পারি। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতেছি—অজ্ঞ এবং জ্ঞানী। এই উভয় শ্রেণীর ভাব পরস্পর হইতে বিভিন্ন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন যে কর্ম্মের আচরণ করে, তখন সেই কর্ম্মের অতি-

রিক্ত আর কিছু জানে না; তাহাদের দৃষ্টি সেই কর্ম্মরূপ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে যায় না; তাহারা সেই কর্ম্মকেই পরমার্থ মনে করে; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত থাকে। জ্ঞানিগণের ভাব অন্য প্রকার; তাঁহাদের দৃষ্টি কর্ম্মের বাহিরে, জ্ঞানরাজ্যে, অনেক দূর প্রসারিত; তাঁহারা কর্ম্মের আচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মকে সামান্য বলিয়াই জানেন; তাঁহারা কর্ম্মকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন না; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মে বাস করিয়াও কর্ম্মের অতীত সুদূর প্রসারিত জ্ঞানরাজ্যে বাস করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মের আচরণে অনেক প্রভেদ আছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উভয় প্রকার ভাবের প্রভেদ কিয়ৎ পরিমাণে বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর কোনও গৃহস্থের কুলবধূ কোনও পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতাতে স্বীয় পতির নিকটে থাকিবার জন্য আসিতেছেন। এক দিন রজনীযোগে তাঁহাকে সহরের বাড়ীতে আনা হইল; তিনি নৈশ অন্ধকারে সহরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না; এমন কি যে ভবনে আসিলেন, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না; পরদিন প্রাতে উঠিয়া নিজ বাস ভবনটী দেখিয়া বলিলেন —"ও বাবা! এ যে দেখি প্রকাণ্ড পাকা কোঠা বাড়া, এ যে দেখি গ্রামের অমুক বাবুর বাড়ীর মত?" তিনি গ্রামে পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন এবং জন্মের মধ্যে গ্রামের একঘর ধনীর

ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন ভিন্ন আর ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন দেখেন নাই ; সুতরাং সহরের স্বীয় বাস ভবনটী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, সেই ভবনটী সহরের একটী প্রধান ভবন ও সেই পাড়াটী সহরের একটী প্রধান স্থান। তিনি যে ভবনটীতে বাস করিতেছেন তাহা হইতে বাহিরের কিছু দেখিবার যো নাই, সুতরাং তাঁহার এই ভ্রান্তিও ঘুচিবার উপায় নাই। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক দিন তাঁহার পতি বলিলেন,—"চল তোমাকে সহর দেখাইয়া আনি।" এই বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সহর দেখাইয়া আনিলেন। বধূটী সহর দেখিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিয়া বলিলেন,—"মাগো সহর এত বড়! ওমা সহরের কি ওঁচা জায়গাতে আছি, এ কি ছোট বাড়ীতেই আছি!" জিজ্ঞাসা করি, এই রমণীর পূর্ব্বভাব ও বর্ত্তমানভাবে প্রভেদ কি হইল? তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে বাস করিতেছিলেন এখনও সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে যে গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেছিলেন এখনও তাহাই করিতে লাগিলেন, তবে প্রভেদ কোথায় রহিল? প্রভেদ রহিল জ্ঞানে ; পূর্ব্বে জানিতেন তাঁহাদের ভবনটী সহরের মধ্যে একটী প্রধান ভবন, এখন জানিলেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র ; পূর্ব্বে স্বীয় ভবনটীকে মহৎ জানিয়া হৃদয়ে একটু অহঙ্কার ছিল, এখন তাহাকে ক্ষুদ্র জানিয়া হৃদয়ে একটু বিনয় আসিল ;—এইমাত্র প্রভেদ। গীতোক্ত অজ্ঞ ও জ্ঞানীর মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ প্রভেদ। উভয়ে একই কর্ম্মের মধ্যে বাস করিতে পারেন, অথচ উভয়ের ভাব বিভিন্ন।

ভগবদ্গীতা কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সাধারণ মানব-জীবন সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারি। আমরা মানবকে বলিতে পারি,—"হে মানব! তুমি এই জীবনের মধ্যে বাস কর, কিন্তু চিত্তকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখিও না; জীবনের মহৎ ও উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীবনের দৈনিক সীমাকে ক্ষুদ্র জানিয়া, ইহার মধ্যে বাস কর। এই জীবনটার আদর্শ আমাদের যাঁহার মনে যে প্রকার, তিনি সেই ভাবেই এ জীবনে বাস করিয়া থাকেন। অনেক মানবের মনে আহার, নিদ্রা, বংশরক্ষা, সন্তান-পালন, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থসঞ্চয় ইহার অতিরিক্ত জীবনের উচ্চতর আদর্শ নাই। ব্রাহ্মের পক্ষেও কি তাহাই? ব্রাহ্ম! তোমার মনে জীবনের যে ভাব আছে তাহা কি ইহাতেই পর্য্যবসিত? তুমি যদি খাইয়া ও ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া যাও, তাহা হইলেই কি মনে করিবে যে তোমার জীবনের সার্থকতা হইয়াছে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে এক মহৎ ও উচ্চ আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আমরা এই জগতের জীবনকে আমাদের জীবনের শৈশবাবস্থা মনে করি। এ জগৎ আমাদের কর্ম্মফল ভোগের জন্য কারাগার নয়, আন্দামান দ্বীপ নয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি, আমাদের করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা আমাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিবার জন্য এখানে রাখিয়াছেন। তিনি এই জগতকে ও মানবজীবনকে

আমাদের শিক্ষা ও উন্নতির উপযোগী এবং আমাদিগকে জগতের উপযোগী করিয়াছেন। এ জগতে থাকিয়া আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও ধর্ম্মে উন্নত হইব, এবং এ জগত হইতে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া যখন শেষ হইবে, তখন অপর জগতে আহূত হইব ;—ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। এ সম্বন্ধে জন্মের সহিত মৃত্যুর যেন সাদৃশ্য দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আমরা কি দেখি ? দেখিতে পাই, মাতৃ-গর্ভের যাহা দিবার ছিল, তাহা যখন দেওয়া হইল, তখন যেন মাতৃগর্ভ শিশুকে বলিল,—'হে ভ্রূণ-দেহ ! আমার যাহা দিবার ছিল দিয়াছি, এখন তুমি আলোকময় রাজ্যের উপযুক্ত হইয়াছ অতএব সেখানে গমন কর।' ইহারই নাম জন্ম। ঈশ্বর-ভক্ত সাধুর মৃত্যু সময়েও যেন তাহাই ঘটে। এ জগত যেন বলে—'হে সাধো ! আমার যে কিছু শিক্ষা দিবার ছিল, তাহা তোমাকে দিয়াছি, এখন তুমি অপর জগতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব সেখানে গমন কর।'

এখানে বাস করিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই যদি মানব-জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে খাইয়া, ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া গেলেই তাহা সংসিদ্ধ হয় না। এ জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। জ্ঞানালোচনা দ্বারা মনকে উন্নত করা, প্রীতির দ্বারা হৃদয়কে প্রসারিত করা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে সবল করা, ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি

দ্বারা ভক্তিকে উজ্জ্বল করা, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহার অকরণে আমরা প্রত্যবায়ভাগী।

আমাদের দৈনিক জীবনটা যে সমগ্র জীবন নয়, তাহা স্মরণ রাখিয়া এই জীবনের মধ্যে বাস করিলে, আমরা ইহার মধ্যে অনাসক্ত ভাবে বাস করিতে পারি। মহতের জ্ঞান ও মহতের ধ্যান হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাস করিলেও মন ক্ষুদ্রতার দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না। তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেছ, এবং তদপেক্ষা কোনও মহত্তর বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, ততক্ষণ কখনই তুমি সেই ক্ষুদ্রে আসক্ত হইতে পার না। অনাসক্ত ভাবে এ জীবনে বাস করিবার সঙ্কেত এই। জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিলে যে কেবল অনাসক্ত ভাবে জীবনে বাস করা যায় তাহা নহে, জীবন-পথের অনেক পাপ প্রলোভন হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। মনকে সর্ব্বদা মহৎ ও পবিত্র বিষয়ে রত রাখাই জীবনকে পবিত্র রাখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও সাধন করা, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন-প্রণালীর একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে।

অপরা বিদ্যা !

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ

শিক্ষা কল্পোব াকরণং

নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর

মধিগম্যতে। উপনিষদ।

অর্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জোতিষ, এ সকলের বিদ্যা অপরা বিদ্যা—আর সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা যদ্দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিতে পারা যায়।

যে উপনিষদ গ্রন্থ সকল এদেশে শ্রুতির মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে শ্রুতির হীনতা-বাচক পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। ভিতরকার কথা এই, এতদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে উপনিষদ গ্রন্থগুলির একটা বিশেষ স্থান আছে। সে সময়ের সাধারণ লোকে যে সকল অসার যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহা-দের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিমল ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিদেহাধি-পতি জনক এই উপনিষদকার ঋষিগণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। বেদোক্ত লৌকিক ক্রিয়া কলাপের অসারতা প্রতি-

পাদন করিবার জন্য এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদের অনেক স্থলেই ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামক অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গার্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ-সহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

অর্থ—হে গার্গি! কোনও ব্যক্তি যদি এই অবিনাশী পরম পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা প্রভৃতি করে তাহার সে সকল বিফল হয়।

উপনিষদকার ঋষিগণ সময়ে সময়ে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন যাগ যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন বেদজ্ঞতার হীনতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বচনটী তাহার নিদর্শন স্বরূপ। কেবল যে উপনিষদেই বেদ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা-সূচক বচন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপ বচন পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতাতে আছে ঃ—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

অর্থ—সমগ্র দেশ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইলে মানুষের

সামান্য চৌবাচ্চাতে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, তেমনি ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষেও সমুদায় বেদে ততটুকু প্রয়োজন।

এখানেও ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তুলনায় বেদবেদাঙ্গ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু অপরা বিদ্যা বলিতে কেবল বেদ বেদাঙ্গের বিদ্যা বুঝিতে হইবে না। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, তর্ক প্রভৃতি সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। এই অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যা অপেক্ষা হীন হইলেও কি ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই? হীন বোধে কি এ সকল উপেক্ষণীয়? আমরা জানি এ দেশীয় ধর্ম্মসাধকদিগের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ঈশ্বরের শ্রবণ মনন, ও তাঁহার সেবাই মানবাত্মার মুক্তির সোপান, লৌকিক জ্ঞান লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই? ইঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে, অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা হইতে নিকৃষ্ট হইলেও মানব-জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সে প্রয়োজনীয়তা কোনও লৌকিক প্রয়োজনীয়তা নহে। আমরা সকলেই জানি যে মানুষ নানা প্রকার পার্থিব ইষ্ট-সিদ্ধির বাসনাতে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ধন লাভ হইয়া থাকে; এজন্য অনেকে অপরা বিদ্যার সেবা করে। কিন্তু ইহা বিদ্যার আলোচনার অতি নিকৃষ্ট ভাব। এভাবে যাঁহারা অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সচরাচর ধন লাভের উপায় হইবামাত্র সে বিদ্যার

চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমান শিক্ষিত দলের মধ্যে শত শত দেখিতে পাইতেছি।

তৎপরে অপরা বিদ্যা আর এক ভাবে অনুশীলিত হইতে পারে;—তাহা যশোলাভের জন্য। ধনাগমস্পৃহা অপেক্ষা যশঃস্পৃহা কিঞ্চিৎ উন্নত। বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য মানুষকে গভীররূপে জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, বিদ্যানুশীলনে ঐকান্তিক ভাবে মনোনিবেশ করিতে হয়, অনলস হইয়া সাহিত্য চর্চ্চাতে কালযাপন করিতে হয়, এবং এ শ্রমের আর অবসান হয় না। ইহাও মানবাত্মার পক্ষে ভাল।

তৃতীয়তঃ মানুষ সুখের জন্য অপরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারে। সে সুখ দুই প্রকার, প্রথম কৌতুহল-বৃত্তির চরিতার্থতা-জনিত সুখ, দ্বিতীয় মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। এ জগতে অনেক ব্যক্তি কেবলমাত্র কৌতুহল বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন। নূতন নূতন বিষয় জানিলে মনে চমৎকারিত্ব-প্রসূত এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই আনন্দের লোভেই অপরা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ইহার অধিক আর কোনও উচ্চতর ভাব নাই। কিন্তু এই ভাব অপর দুই ভাব হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে।

বিদ্যার অনুশীলনে আর এক প্রকার সুখ আছে, মানসিক

বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন, তাহাদিগের চালনা করিলেই আমাদের চিত্তে এক প্রকার সুখোদয় হইয়া থাকে। তাহাদের রক্ষা ও বিকাশের জন্য চালনার প্রয়োজন, এই জন্য বোধ হয় মঙ্গলময় বিধাতা তাহাদের চালনার সঙ্গে সুখের যোগ করিয়া দিয়াছেন। শীত কালের প্রাতঃকালে অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কুকুরগণ অকারণ দৌড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও অপর পশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, বা কোনও আসন্ন বিপদ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু তাহা নহে, তাহারা দৌড়িবার জন্যই দৌড়িতেছে। ইহার কারণ এই, দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে তাহাদের অঙ্গ সকলের চালনা-জনিত যে সুখ হয়, সেই সুখের লোভেই তাহারা ঐ প্রকার করিয়া থাকে। অঙ্গ সকলের চালনাতেই এক প্রকার সুখ আছে। তুমি যদি দশদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিমল বায়ুতে সঞ্চরণ কর, একাদশ দিবসে তোমার চিত্ত স্বতঃই সেই সুখ ভোগ করিতে চাহিবে। আমাদের প্রকৃতির গূঢ় সুখ-প্রিয়তা এই প্রকার! ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদের আর বিশ্রাম নাই; হস্তপদগুলি নিরন্তর চলিতেছে; যদি বাধা দেও, যদি ক্ষণকালের জন্য তাহাদের গতিরোধ কর, তখনি দেখিবে শিশুগুলি ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। ক্রন্দন করে

কেন ? সুখের ব্যাঘাত না হইলে কি ক্রন্দন করে ? তাহাদের সেই হস্ত পদের সঞ্চালন এতই সুখজনক যে তাহার অভাবে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। এইরূপ মানসিক বৃত্তি নিচয়ের চালনাতেও এক প্রকার সুখ আছে; সেই সুখটুকুর লোভেই অনেকে অপরা বিদ্যার আলোচনাতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

আমি অপরা বিদ্যার যে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছি তাহা এ প্রকার নহে। পরা বিদ্যার পোষকতা করিবার জন্যই অপরা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। যেমন শাখানদী সকল মহা-নদীতে পতিত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে, এবং মহানদীর সহিত একীভূত হইয়া মহাসমুদ্রে গমন করে, তেমনি অপরা বিদ্যা সকল পরাবিদ্যাতে সম্মিলিত হইয়া তাহার আয়তন ও বল বৃদ্ধি করে, এবং চরমে মানবকে সেই পূর্ণ পরাৎপর পরম পুরুষের চরণে উপনীত করে। তাঁহাকে লাভ করাই যখন মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, তখন তাঁহাকে লাভ করা মানবের বিদ্যারও উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যাতেও আমাদের ধর্ম্মজীবনের ও ব্রহ্মসাধনের কিরূপ সহায়তা করিতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়া যাই। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরা বিদ্যার প্রকৃত অনুশীলন দ্বারা মানব-চরিত্র ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মলাভের উপ-যোগী হয়।

প্রথমতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা অনেক সময়ে মানব-

চরিত্রে অনাসক্তি উৎপাদন করে। একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের উপ-করণীভূত বিবিধ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইলেই মানুষকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইতে ও তাহাদের একটু উপরে উঠিতে হয়। মহাতত্ত্ব সকলের আলোচনাতে মন নিযুক্ত থাকিলে, মন আর ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ের অতীত। তাঁহারা সে সকলের মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে বাস করেন না।

দ্বিতীয়তঃ—অপরা বিদ্যাতে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিতে হয়। উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে অসংযত রাখিয়া কেহই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। গভীর তত্ত্বান্বেষণের পক্ষে চিত্তের স্থিরতার নিতান্ত প্রয়োজন। এমন কি পদার্থ-বিদ্যাতে যে সকল পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার বিধি আছে, তাহা সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে হইলে চিত্তের স্থিরতা, দৃষ্টির স্থিরতা ও স্নায়ুমণ্ডলের স্থিরতা একান্ত প্রয়োজনীয়। অসংযত ও প্রবৃত্তিপরতন্ত্র ব্যক্তি কি কখনও সেই স্থিরতা লাভ করিতে পারে? অতএব একাগ্রচিত্তে অপরা বিদ্যা অনুশীলন করিতে গেলেও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ—অপরা বিদ্যার অনুশীলনের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে, মানুষের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হয় ও আত্ম-দৃষ্টি জাগে।

চিন্তাশক্তির উন্মেষ একবার হইলে, সে শক্তি আর কেবলমাত্র বাহিরের পার্থিব বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও প্রসারিত হয়। সেই চিন্তাশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তনে এবং জগত ও আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচারে নিযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা হৃদয় মনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জগতের কিছু না জানিলে মানুষ স্বভাবতঃই আপনার যাহা আছে, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে থাকে। যতই জগতের সহিত পরিচয় বৃদ্ধি হয়, ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের উন্নতি ও অবনতির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতে থাকে, ততই মানুষের মন উদার হইতে থাকে; ততই মানুষ মনে করে আমি আজ যেরূপ ভাবিতেছি এরূপ আর কত শত শত ব্যক্তি ভাবিয়াছে, আমি যাহাকে অকস্মাৎ উৎপন্ন মনে করিতেছি তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মিয়াছে, আমি যে তত্ত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি শত শত ব্যক্তি সেই তত্ত্বকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এই তুলনায় বিচার দ্বারা মানব-চিত্ত উদারতা লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—প্রকৃত ভাবে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিলে মানব-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিনয়ের সঞ্চার হয়। বিদ্যার সহিত বিনয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রে বলিয়াছে—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—বিদ্যা বিনয়কে দান করে। যদিও অনেক

স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে অপরা বিদ্যা বিনয়কে প্রসব না করিয়া অহমিকাকেই প্রসব করিতেছে, তথাপি বিদ্যার সহিত বিনয়ের যে গূঢ় যোগ আছে, তাহা সুনিশ্চিত। প্রকৃত বিদ্যা যেখানে আছে, সুগভীর তত্ত্বান্বেষণ যেখানে আছে, সেইখানেই মানবের নিজের অজ্ঞতা-জ্ঞান সমুজ্জ্বল। কি পদার্থতত্ত্ব, কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, যে রাজ্যেই মানব মন গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, সেই বিভাগেই দুরবগাহ সমস্যা সকলের মধ্যে পতিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, যে এ ব্রহ্মাণ্ডে মানব ঘোর অজ্ঞতাতে জড়িত। মানব এজগতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় যবনিকার অন্তরালে বসিয়া আছে। সেই যবনিকা ভেদ করিয়া যে দুই এক রশ্মি আলোক আসিতেছে, তাহাতেই আপনাকে ও আপনার পিঞ্জরকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিতে পাইতেছে, এইমাত্র। এরূপ অবস্থাতে মানব-মনে বিনয়ই শোভা পায়।

ষষ্ঠতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও বিভাগে আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল বিভাগেই সেই জ্ঞানময় পুরুষের অপার জ্ঞানের লীলা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং অপরা বিদ্যা যে বিভাগেই গমন করুক না কেন, বিনীত ও প্রেমিক ব্যক্তির চক্ষে সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

অতএব অমরা দেখিতেছি, অপরা বিদ্যা অনাসক্তিকে

উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত করে, চিন্তাশক্তির উন্মেষ করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগরুক করে, দীনতাকে উৎপন্ন করে, এবং চিত্তে ঈশ্বরের মহিমা-জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল কি আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায় নহে? অপরা বিদ্যার আলোচনাকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ-স্বরূপ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

অর্থ—ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত উক্তিটী আমাদের দেশে সুপ্রচলিত। ক্ষুদ্র ও মহৎ, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও রমণী প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়,—"একজন ধর্ম্ম আছেন ত, তিনিই রক্ষা করেন।" কিন্তু এ কথার প্রকৃত অর্থ কি?

চীন দেশীয় মহাপুরুষ কংফুচকে একবার তথাকার কোনও এক রাজা প্রশ্ন করিলেন,—"হে সুধী-শ্রেষ্ঠ! রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ও প্রজা মণ্ডলীকে সুশাসনে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে দুষ্ট প্রজাদিগকে অথবা রাজ্যের শত্রুদিগকে হত্যা করা কি আবশ্যক নয়?" মহামতি কংফুচ উত্তর করিলেন,—"হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন হইয়া ন্যায়পরায়ণতার সহিত স্বীয় রাজ-কার্য্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে রাজ্য সুশাসনে রাখিবার জন্য আপনাকে কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে না; এবং দেখিবেন বায়ু প্রবাহিত হইলে ক্ষেত্রের শস্য সকল যেমন তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে, তদ্রূপ আপনার প্রজাগণও আপনার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে।" কংফুচের বক্তব্য এই ছিল যে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মের শাসনাধীন। মানব-হৃদয়কে

শাসনে রাখিবার জন্য ধর্ম্মাস্ত্রের ন্যায় অস্ত্র আর নাই। যিনি অকপটচিত্তে এজগতে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারেন তিনি নিরাপদ। ইতিবৃত্তে ইহাঁর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজ ও স্পেনীস প্রভৃতি ইউরোপবাসী শ্বেতকায় খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে বিদেশে গিয়া নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন, সে সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই ? এই সকল জাতি সেখানে গিয়াই শারীরিক বলের দ্বারা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা, তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; রণে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের ভূ-সম্পত্তি সকল হরণ করিলেন এবং পশুযূথের ন্যায় দলে দলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তখন সেই সকল অত্যাচরিত অধিবাসিগণ কি করিল ? তাহারা স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া বনে বনে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঐ সকল শ্বেতকায় জেতাদের প্রতি বিবিধ প্রকারে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ পাইলেই কোনও না কোনও প্রকারে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের রমণীদিগকে পথে ঘাটে পাইলে, হরণ করিয়া লইয়া যাইত; অথবা দস্যুতা করিয়া ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঐ সকল বিজিত লোকের উপদ্রবে ইঁহারা সুস্থির হইয়া বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু উইলিয়ম পেন নামক সুবিখ্যাত কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত

ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ সত্যবাদী পুরুষ যখন সেখানে গিয়া সৌজন্য সদ্ভাব ও ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল আদিম অধিবাসীরাই তাঁহার বশীভূত হইল। এমন কি পেনকে তাহারা দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সহিত যে সন্ধিপত্র করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কখনও ভঙ্গ করে নাই। তরবার যাহা করিতে পারে নাই, ধর্ম্মও সাধুতা তাহা করিয়াছিল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি কংফুচের কথা অতীব সত্য,—"বায়ুর গতির অগ্রে যেমন ক্ষেত্রের শস্য মস্তক অবনত করে, ধার্ম্মিক রাজার সম্মুখে সেইরূপ প্রজা সকল ও মস্তক অবনত করে।" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এই উক্তিকে আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা এইঃ—এজগতে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা পার্থিব ও পাশব বলের উপরে অধিক নির্ভর করে; তাহারা ধন-বল, জন-বল ও বুদ্ধি-বলের উপরে নির্ভর করিয়া জগতে চলিতে চায়; তাহাদের দৃষ্টি ধনের উপরে, সহায় সম্বলের উপরে এবং আপনাদের বুদ্ধির উপরে। কাহারও সহিত যদি বিবাদ আরম্ভ হয় তখন তাহারা মনে করে,—"আমার এত টাকা আছে, আমি এত বড় ধনী, অমুক ব্যক্তি আমার সহিত বিবাদ করিয়া কি বাঁচিবে? আবার কেহ বা আপনার প্রখর মেধার উপরে নির্ভর করিয়া তাহার বিপক্ষ ব্যক্তিকে শাসাইয়া বলে,—"কি হে

বাপু! আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তুমি কি তিষ্টিবে? আমার বুদ্ধির সম্মুখে, আমার চক্রান্তের নিকট তুমি কি দাঁড়াইবে?” কোনও দেশেই কোনও সমাজেই এইরূপ লোকের অপ্রতুল নাই। এই সকল লোক মূর্খের শেষ; ইহারাই প্রকৃত ছোট লোক! ধর্ম্মের উপরে বিশ্বাস রাখিবার শক্তি ইহাদের হয় না।

যাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে যীশুর মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্য ষ্টিফেন যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন য়িহুদিগণ ইষ্টক ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তাহারা পাশব বলের দ্বারা ধার্ম্মিকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে নষ্ট করিতে চাহিল। কিন্তু কালে ষ্টিফেনেরই মত জগতে প্রবল হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন তখন তিনি ‘ব্রহ্মসভা’ নামে এক সভা স্থাপন করেন। তখন ইহার সভ্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কলিকাতার ধনিগণ সকলে একত্র হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভাকে বিনাশ করিবার জন্য ‘ধর্ম্মসভা’ নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ ধনী এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা চাঁদা করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সভা হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল রামমোহন রায়ের কুৎসা এবং নিন্দা বাহির হইত। আমি রাজার সম-সাময়িক কোনও এক জন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি

যে এই ধর্ম্ম সভার অধিবেশনের দিন এক মাইল রাস্তা ব্যপিয়া ইঁহাদের গাড়ী দাঁড়াইত এবং সভা ভঙ্গ হইলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সকলে বলাবলি করিতেন, "স্ত্রীলোকেরা যেমন অঙ্গুলির দ্বারা চাপ দিয়া পুঁটিমাছের পোঁটা বাহির করে, আমরাও সেইরূপ করিয়া রামমোহন রায়ের সভার পোঁটা বাহির করিব।" আপনাদের ধন বল, জন বলের প্রতি তাঁহাদের প্রধান নির্ভর ছিল। কিন্তু পরিণামে কি হইল? তিনি ত তাঁহার সভাকে তদবস্থায় রাখিয়া বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সভা ত একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছিল; কিন্তু এখন কি দাঁড়াইয়াছে? এখন সেই পুঁঠি মাছের পোঁটাতে কাঁটা জন্মিয়া লোকের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। মূর্খেরা মনে করে, পার্থিব ও পাশব বলের দ্বারা, কুৎসা ও গ্লানি রটনা দ্বারা ধর্ম্মকে নষ্ট করা যায়। জগতের ইতিবৃত্তে সত্যের পরাজয় কি কখনও হইয়াছে? বিষ-প্রয়োগে সক্রেটিসের প্রাণ গেল; কিন্তু সক্রেটিসের কি মৃত্যু হইয়াছে? তিনি "Father of Western Philosophy" হইয়া চিরদিনই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর আচরণে লোক যীশুর প্রাণবধ করিল, কিন্তু তিনি চিরদিনই অমর হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আজ রুশিয়ার সম্রাটের মস্তক "প্রভু, প্রভু" বলিয়া সেই সূত্রধর তনয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। জগতের মুর্খ ব্যক্তিরা ধন, মান, পাশব অত্যাচার, নিপীড়ন এই সকলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা,

সাধুরা ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করেন। তাঁহারা তুলাদণ্ডের এক দিকে বিন্দু পরিমাণ সত্যকে এবং অপর দিকে জগতের প্রভূত পার্থিব সম্পদ রাখিয়া দেখিয়াছেন, ধর্ম্মই ভারী হইয়াছে। একটী সর্ষপ পরিমাণ ধর্ম্মের তুলনায় হিমালয় সমান পার্থিব সম্পদকে তাঁহারা অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হয় না। এপৃথিবীতে বাস করিবার জন্য মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকল তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। মানুষ আপনা হইতেই সে সকল সাধুদিগকে প্রদান করে। ধর্ম্মের যে পোষাকটা, তাহার যে খোসাটা, তাহার যে নকলটা, তাহারই জগতে কত আদর! কত সম্মান! প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পাইলে ত কথাই নাই। আমার সহিত চল, উভয়ে গৈরিক বসন পরিধানে বাহির হই, একটী পয়সা সঙ্গে লইতে হইবে না, অথচ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিব। উত্তম আহার করিবে, উত্তম স্থানে বাস করিবে, অবশেষে হৃষ্ট পুষ্ট দেহ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ধর্ম্মের পরিচ্ছদেরও এত আদর! এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী অতি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। একবার একজন নবাব মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি কোনও সাঁচ্চা অর্থাৎ আসল ফকির পান, তবে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন। এমন ফকির দেখিয়া বিবাহ

দিবেন যাহার আর জগতে কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই এবং এক কপর্দ্দক সম্বল নাই। তখন নবাব খাঁটি ফকির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদি শুনিতে পান যে, তাঁহার রাজ্যের নিকটে কোনও ফকির আসিয়াছে, অমনি তাঁহার নিকটে নানা প্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। যাহার কিঞ্চিৎ লালসা দেখেন তাহাকেই নকল ফকির বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক দিন গেল, মনের মতন ফকির পাইলেন না। অবশেষে অপর কোনও দেশের নবাবের এক পুত্র কোনও প্রকারে সেই কন্যার গুণের কথা শুনিয়া বা রূপলাবণ্যের প্রশংসা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেরূপে পারি, এই কন্যাকেই বিবাহ করিতে হইবে।" এক দিন সেই যুবক নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আমি অমুক নবাবের পুত্র; আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া যদি উঁহাকে আমার সহিত বিবাহ দেন, তবে আমি পরম উপকৃত হই।" তখন নবাব উত্তর করিলেন, "আমি সাঁচ্চা ফকির দেখিয়া আমার কন্যার বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।" তখন সেই যুবক নিরাশ অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং ফকিরের বেশ পরিধান করিয়া ফকির সাজিল এক বৎসর অতীত হইলে ফকির বেশধারী সেই যুবক আসিয়া নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে একস্থানে বাস করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল যে আর এক

জন ফকির আসিয়াছে। নবাব প্রথমতঃ তাহার নিকটে উপ-ঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ফকির দূতকে বলিলেন, "সে কি? আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার উপঢৌকনের প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় নবাব তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ ভবনে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ফকির বলিলেন. "এ প্রস্তাব ত মন্দ নয়! কত লোক আমার নিকট নিত্য আসিতেছে, আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজভবনে গিয়া বসিয়া থাকি। নবাব সাহেবের প্রয়োজন হয় ত এখানে আসুন। আমার যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া নবাব ভাবিলেন এইবারে যথার্থ সাচ্চা ফকির পাইয়াছি. ইহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ওদিকে সেই ফকিরের হৃদয়ে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত। তিনি ভাবিলেন,—"যে জিনিসের পোষাকের এত মূল্য, যাহার ছালের দাম এত, তাহার ভিতরটা না জানি কেমন! আমি ধর্ম্মের নামে কপটতা করিতেছি, তাহাতেই লোকে আমাকে এত সম্মান করিতেছে, আসল ধর্ম্ম তবে না জানি কেমন! আমাকে সেই আসল বস্তু লাভ করিতে হইবে।" তৎপরে যখন নবাব স্বয়ং ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে সাধো! আপনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" তখন ফকির বলিলেন,—"মহারাজ! আমি অমুক দেশের নবাবের পুত্র। এক বৎসর পূর্ব্বে আমিই আপনার কন্যাকে

বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তখন আপনি বলিয়াছিলেন যে, সাঁচ্চা ফকির পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন। আপনার কন্যাকে লাভ করিবার জন্যই আমি এই সকল প্রতারণা করিয়াছি। এক্ষণে আমার অন্তরে এই প্রতিজ্ঞার উদয় হইয়াছে, "যাহার নকলের এত সম্মান, তাহার আসল কি প্রকার তাহা আমি দেখিব। আর আপনার কন্যাকে পাইবার ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া ফকির চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্মান সর্ব্বত্র, সে ব্যক্তির কোনও প্রকার পদার্থের অভাব হয় না। যীশু বলিয়াছেন,— 'শৃগাল কুকুরের শয়ন করিবার গর্ত্ত আছে; আকাশের পক্ষিগণের থাকিবার স্থান আছে; আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" অথচ তিনি ইচ্ছামাত্র অনায়াসে দুই হাজার লোককে আহার করাইতে পারিতেন। এ দেশে একটী কথা প্রচলিত আছে, "সাধু সাপের ন্যায়; ইঁদুর গর্ত্ত করে, সাপ তাহাতে বাস করে; তেমনি বিষয়ী লোক বিষয় করে, সাধুরা তাহা ভোগ করেন।"

চতুর্থতঃ এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহাকে যতই উৎপীড়ন করুক না কেন, তিনি তদ্দ্বারা আপনার হৃদয়কে কলুষিত হইতে দেন না। তিনি দৃঢ়রূপে ধর্ম্মের পথে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। অবশ্য একথা সত্য যে তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে

লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, এবং লোকে তাঁহাকে নির্য্যাতন করে; কিন্তু তিনি নিজে বিদ্বেষ বুদ্ধির অতীত হইয়া বাস করেন; লোকের উৎপীড়নে লোকের বিদ্বেষে তিনি প্রতিহিংসা-পরবশ হন না। তাঁহার মন ঠিক্ জলের ন্যায়, জলে যেমন যতই আঘাত কর, তাহাতে দাগ পড়ে না, তাঁহার মনেও সেইরূপ লোকের হিংসা বিদ্বেষের দাগ পড়ে না। বরং তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করেন।

পঞ্চমতঃ এই উক্তির সর্ব্বশেষ ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি চাতুরীর হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য কোনও প্রকার অসাধু উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন না; তিনি বাঁকা পথ ভুলিয়া গিয়া সরলভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অসাধু লোক মিথ্যার উপরে মিথ্যা, তদুপরি মিথ্যা এইরূপে ক্রমাগত মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে গুটিপোকার ন্যায়, মিথ্যার জালে জড়াইয়া মারা পড়ে; সাধু ব্যক্তি সত্যপথ ধরিয়া চলিয়া অনায়াসে আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া লন।

এইরূপে চিন্তা করিলে এই উক্তির আরও অনেক প্রকার ভাব বহির করা যায়। আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে বিদ্বেষ, হিংসা, চতুরতা, কপটতা এ সকলের অতীত হইয়া বাস করিতে হইবে। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে স্থির থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিব, তাহার

জন্য নিন্দা প্রশংসা, সম্পদ, বিপদ সকলই অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশের নিকটে অপর সকলই উপেক্ষা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগকে এই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। যখন কেহ একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করে, তখন সে ব্যক্তি কি করে? সে ব্যক্তি হয় ত আট মাস কি দশ মাস ধরিয়া দিবানিশি চিন্তা করিয়া একটী পরামর্শ স্থির করিল এবং তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিল। যখন তাঁহার বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, তখন কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"এ ঘরটা এখানে না হইলে ভাল হইত। কেহ বলিল, "প্রাঙ্গণটা এখানে না করিয়া একটু দূরে করিলে ভাল হইত।" আবার কেহ বা বলিল,—"না, না, ঠিক হইতেছে।" এইরূপে কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল; কিন্তু ছয় মাস পরে যখন সম্পূর্ণ বাড়ীটী প্রস্তুত হইল, তখন লোকে বলিতে লাগিল,—ওঃ আপনার মনে এই পরামর্শটা ছিল, এত বেশ হইয়াছে।" তখন লোকে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমাদিগকেও এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে। এখন আমাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময়। এক্ষণে লোকের নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই উপেক্ষাবুদ্ধির সহিত দেখিতে হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। তোমরা লোকের মুখের প্রতি তাকাইও না। প্রভু পরমেশ্বরের মহান্ আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।

তাহাতে যে প্রশংসা করে করুক, যে নিন্দা করে করুক। "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক, শুনে চলি তোমারি ডাক" এইটী ব্রাহ্মদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এইটী ব্রাহ্মদের কবচ। হে ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই ধর্ম্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পার, তবেই তোমরা জীবনের স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা এই ভাবে তাঁহার মহান্ ধর্ম্ম পালন করিতে পারি।

আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মজীবন

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাস-নারদ-সংবাদে নারদের মুখে নিম্নলিখিত উক্তিগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদ ব্যাসকে বলিতেছেন :—

তস্মিন্ নির্ম্মনুজেরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মস্থমাত্মানং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥
ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাব-নির্জ্জিত-চেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥
প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোতিনির্বৃতঃ।
আনন্দ-সংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥
রূপং ভগবতো যত্তৎ মনঃকান্তং শুচাপহং।
অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনা ইব ॥
দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনো হৃদি।
বীক্ষমাণোপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥
এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো গিরাং ॥
গম্ভীরশ্লক্ষ্ণয়া বাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥
হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোহহং কুযোগিনাং ॥
সকৃৎ যদ্দর্শিতং রূপং মে তৎ কামায় তেহনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥

মৎ সেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।

হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥

অর্থ—সেই জনমানব-শূন্য অরণ্যে এক পিপ্পল বৃক্ষের তলে আসীন হইয়া গুরূপদেশ অনুসারে আত্মার দ্বারা আত্মস্থ পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হইলাম। অনুরক্তচিত্তে তাঁহার পদারবিন্দ ধ্যান করিতে করিতে ব্যাকুলতাতিরেকবশতঃ আমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল; অমনি হরি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। প্রেমাতিশয্যবশতঃ আমার শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল; এবং এক মহা আনন্দ-প্লাবনে নিমগ্ন হইয়া আমি যেন আত্মজ্ঞান ও পরজ্ঞান হারা হইলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে ভগবানের সেই মনোমোহন ও শোকনাশন রূপ আর দেখিতে পাইলাম না। তখন উদ্বিগ্ন ও বিকলচিত্ত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আবার তাঁহার দর্শন মানসে নির্জ্জনে চিত্ত সমাধান করিয়া দেখি আর তাঁহার দর্শন পাই না। তখন অস্থির ও কাতর হইয়া পড়িলাম। এইরূপ নির্জ্জনে যখন সাধনা-পরায়ণ আছি তখন সেই বচনাতীত পুরুষ গভীর ও সুমিষ্ট বচনে আমার চিত্তের তাপ দূর করিয়া বলিলেন—"ওহে নারদ, তুমি এ জন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। যাহাদের কামদ্বেষাদিজনিত কলুষ ক্ষয় হয় নাই, তাহারা ভাল করিয়া আমার দর্শন পায় না। তবে যে আমি তোমাকে একবার আমার রূপ দেখাইয়াছি তাহা কেবল তোমার আকাঙ্ক্ষাকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত। আমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইলে সাধু ব্যক্তি

ক্রমে হৃদয়স্থিত সমুদয় বাসনা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল আমার সেবা দ্বারা আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া, কামদ্বেষ-কলুষিত লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক, তুমি আমার অনুগত ব্যক্তি-গণের মধ্যে গণ্য হইবে ”

ভাগবতকার এখানে দেবর্ষি নারদের মুখ দিয়া ভক্ত জীবনের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মজগতে বিরল নহে। আরও অনেক ভক্তের জীবনে এইরূপ ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকাল দর্শন ও তৎপরে বিচ্ছেদের যাতনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ভক্তশিরোমণি চৈতন্যের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, গয়াধামে যখন তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকটে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁহার চিত্তের এক অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়াছিল। কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইতে লাগিল; তিনি যেন এক অপূর্ব্ব সুধাসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন; দিন রাত্রি কোথা দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল তাহা যেন অনুভব করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই মন-আনন্দের অবস্থা অধিক দিন থাকিল না। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার ইষ্ট দেবতা হঠাৎ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন; সেই আনন্দের প্লাবন হঠাৎ হ্রাস হইয়া গেল; জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল। এরূপ কথিত আছে, এই অবস্থাতে তিনি ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া “কৃষ্ণরে! বাপ্‌রে” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দা-বনাভিমুখে বাহির হইয়াছিলেন। আরও অনেক ভক্তের

জীবনে এইরূপ দর্শন ও বিচ্ছেদের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভক্ত-চিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে, "কেন ভগবান এইরূপে দর্শন দিয়া আবার অন্তর্হিত হন?" ইহার উত্তর পূর্ব্বোক্ত নারদোক্তির মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই এইরূপে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। কারণ এই আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলেই সাধক আপনার হৃদয়স্থিত সমুদয় বাসনা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইটুকু সার কথা। আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মজীবন যে হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহাতে ধর্ম্মজীবনও নাই। ধর্ম্ম সাধনের যত কিছু প্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছে সমুদায় এই আকাঙ্ক্ষাকে সতেজ রাখিবার জন্য; ধর্ম্ম শিক্ষার যত কিছু বিধি ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, সমুদয় এই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য। যে সাধন-প্রণালী আকাঙ্ক্ষাকে সজাগ রাখিতে পারে না, তাহা মৃত; যে শিক্ষা-প্রণালী আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না তাহাও মৃত।

আমরা এইরূপ মৃত সাধন-প্রণালী● মৃত শিক্ষা-প্রণালীর নিদর্শন দিন দিন চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ সহস্র সহস্র পুরুষ ও রমণী রহিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মসাধনের প্রণালীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়ম সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা

নাই ; তাঁহারা ধর্ম্মকে চাহিতেছেন না ; কেবল গতানুগতিকের অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন। কিসে ভগবানে রতি মতি হয়, কিসে প্রবৃত্তিকুল বশীভূত হয়, কিসে অন্তরাত্মা অভয়ধামে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য তাঁহারা ব্যাকুল নহেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাহীন সাধন প্রাণ-বিহীন ক্রিয়া মাত্র।

আবার বলি, আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মজীবন। যেমন ক্ষুধা দেহের গঠন ও পোষণের উপযোগী সামগ্রী সকল খাদ্য বস্তু হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া দেহস্থ ধাতু সকলকে গঠন করে, তেমনি আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মজীবন ও চরিত্র গঠনের উপযোগী উপাদান সকল এই জন-সমাজ ও এই মানব-জীবন হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। মানুষকে এ জগতে বাস করিতে ও বর্দ্ধিত হইতে হইবে। এই জীবনের পথে অগ্রসর হইতে গেলেই তাহাকে সৎ ও অসৎ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে ; নিতান্ত সদভি-সন্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইলেও তাহাকে অনেক সময়ে ভ্রান্তি-বশতঃ বিপথে পদার্পণ করিতে হইবে ; গুরুতর প্রলোভনে পড়িয়া সময়ে সময়ে তাহার পদস্খলন হইবে। কে তাহাকে এই সকল ভ্রমপ্রমাদ বিঘ্ন বাধা ও পাপ-প্রলোভন-সঙ্কুল পথে রক্ষা করিতে পারে ? উত্তর—আকাঙ্ক্ষা। যদি সুসময়ে তাহার অন্তরে সৎ হইবার আকঙ্ক্ষা উদিত করিয়া দিতে পার, তবে সেই আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে বাস করিয়া তাহাকে অসৎকে খর্জ্জন ও সৎকে গ্রহণ করিতে সমর্থ করিবে। হৃদয়ের মধ্যে এই রূপ একটী শক্তিকে স্থাপন করাই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

যে দিন হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, সেই দিন মানুষের জীবনের একটী বিশেষ দিন, সেই দিন তাহার নবজীবনের সূত্রপাত। সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি ইহার পরে। যে হৃদয়ে এই ধর্ম্মাগ্নি নাই, তাহাতে আর যাহাই থাকুক ধর্ম্মজীবন নাই। এতদ্দেশে লোকে ধর্ম্ম বলিতে অনেক সময়ে কতকগুলি সদ্গুণ বুঝিয়া থাকে। যাঁহার আচার শুদ্ধ, ব্যবহার নম্র, যিনি মিষ্টভাষী, দয়ালু, ও পরোপকারী তিনি ধার্ম্মিক। আমি বলি ঈশ্বরকে লাভ করিবার ইচ্ছা আগুনের মত যাহার প্রাণে জ্বলিতেছে, যে বিষয়াসক্তির দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ও ঈশ্বরের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে। আমি এই আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা বা হৃদয় পরিবর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের বিচার করিয়া থাকি। মানুষকে কতকগুলি ধর্ম্মের মত শুনাইলেই ধর্ম্মপ্রচার হয় না। হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি জ্বালিয়া দিতে না পারিলে ধর্ম্মপ্রচার হইল না। আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে কিছুই হইল না! কারণ এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে থাকিলেই মানুষ বিষয়াসক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে ও সর্ব্ববিধ বাসনাকে দমনে রাখিতে পারে।

আবার আকাঙ্ক্ষার স্বভাব এই যে ইহা উপভোগের সামগ্রী যতই প্রাপ্ত হয়, ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন:—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থ—"কামনা কখনও কামনার বিষয় লাভে পরিতৃপ্ত হয় না ; বরং ঘৃত সংযোগে অগ্নি যেমন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে।"

এই উক্তির দেদীপ্যমান প্রমাণ আমরা প্রতিদিন প্রাপ্ত হইতেছি। বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে জগৎবাসীর আচরণ প্রতি নিয়ত এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেখিলে বোধ হয় মানবের ভোগাকাঙ্ক্ষার যেন অবধি নাই। ভোগ সামগ্রী যতই সংগৃহীত হইতেছে, ততই যেন ভোগলালসারও বৃদ্ধি হইতেছে। এ দ্রব্যটীর পরে ও দ্রব্যটী চাই, সেটীর পরে আর একটী চাই, এইরূপ করিয়া লোকের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় মানুষের বাহিরের জীবনের সুখ সৌকর্য্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারার নামই সভ্যতা। এই জন্যই প্রাচীন কালের অনেক সাধু নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, ভোগ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যখন ভোগ লালসার বিরাম নাই, তখন ভোগের পথ দিয়াই যাওয়া কর্ত্তব্য নহে ; ভোগ-বাসনাকে সংযত করিয়াই সাধন-পথে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য। সে যাহা-হউক আমার বক্তব্য এই, কামনার বিষয় লাভে ভোগ বাসনা বর্দ্ধিত হয় একথা যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে সত্য, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্বন্ধেও সত্য। ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘনী ভূত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হইয়া প্রেমরূপ

ধাবণ করে ও সেই প্রেম হৃদয়ে বাস করিয়া অভদ্র সকলকে বিদূরিত করিতে থাকে।

এই কারণে হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্নিকে সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করিবার প্রধান উপায় তদনুসারে কার্য্য করা। যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ না যোগাইলে সে অগ্নি থাকে না, তেমনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে দিকে যাইতে বলে সেদিকে না গেলে, তাহাও রক্ষা পায় না। হৃদয়ে যখন প্রণয়ের সঞ্চার হয় তখন যেমন প্রণয়াস্পদকে লাভ করিবার সুবিধা থাকিলেই সে প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইয়া থাকে, এবং তাহা আর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া গাঢ়তাই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেই তাহা সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আবার অপর দিকে যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করা যায় তাহা হইলে হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গিয়া থাকে। যেমন অনেক মানুষের প্রথম প্রণয় জুড়াইয়া যায় তেমনি অনেক মানুষের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাও ম্লান হইয়া গিয়া থাকে। অনেক মানুষের জীবনে এরূপ দেখা গিয়াছে যে এক সময়ে তাঁহাদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল ছিল; তৎপরে লোকভয়েই হউক, অথবা লোভ বশতঃই হউক, বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচরণ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়স্থ অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন আংশিকরূপে বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হইবে তাহাতে কি, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনাকে আশ্রয়

করিয়া থাকিবেন এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ে প্রেম ভক্তি সুরক্ষিত হইবে। কিন্তু ফলে দেখা গেল যে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন নিবিয়া গেল, এবং উপাসনাতে সে অনুরাগও রহিল না। ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকা আকাঙ্ক্ষাকে রক্ষা করিবার একটী প্রধান উপায়। তদভাবে আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

আরও অনেক কারণে হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে। তন্মধ্যে বিষয়ীর সঙ্গ একটী প্রধান। ভক্তি শাস্ত্রে বিষয়ীর সঙ্গকে বিষের ন্যায় গণনা করিয়াছে। অর্থাৎ মনে কর কোনও ব্যক্তির হৃদয়ে শুভক্ষণে ঈশ্বর-লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে; তখন যদি তাঁহাকে এরূপ লোকের সঙ্গেই রাখ যাহাদের অন্তরে বিষয়াসক্তি প্রবল, যাহারা দিবারাত্রি বিষয় চিন্তাতেই নিমগ্ন আছে, এবং বিষয় যাহাদের ধ্যান জ্ঞান কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তবে তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও হয়ত ম্লান হইয়া যাইবে। এইজন্য নবজাত আত্মাদিগের পক্ষে বিশ্বাসী ও ব্যাকুলাত্মা ব্যক্তিদিগের সহবাস প্রয়োজনীয়। এই জন্যই ধর্ম্মজীবনের সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনের জন্য ধর্ম্ম-সমাজের প্রয়োজনীয়তা। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহারা আসে, তাহাদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহাদিগকে পোষণ ও পালন করা ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান কার্য্য। এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সমাজের প্রকৃত আদর্শেরও কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে ধর্ম্ম-সমাজ শিশু আত্মাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারে

না, লোকের বিষয়াসক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ব্যাকুলতাকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাহা আপনার মহৎ কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সে যাহা হউক, অনেক সময়ে দেখা যায়, যে শুভ মুহূর্ত্তে আকাঙ্ক্ষার অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াও সঙ্গ-দোষে আবার নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, কর্ম্মবন্ধন অনেকের হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সকল সম্প্রদায় মধ্যেই ধর্ম্মসাধনের কতকগুলি প্রণালী ও ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। সাধকদিগের ধর্ম্মজীবনকে পোষণ করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মানব-প্রকৃতির একটা নিয়ম এই যে, যে কার্য্য অভ্যাস প্রাপ্ত হয় তাহা একদিকে যেমন অল্পায়াসসাধ্য হইতে থাকে, অপর দিকে তেমনি তদন্তরস্থ হৃদয়ের ভাবের তীব্রতা হ্রাস হইতে থাকে। তুমি যদি আজ নিয়ম কর যে প্রতিদিন প্রাতে অন্ন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দীনজনদিগকে কিছু দান করিবে, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবে যে দান কার্য্যটী তোমার অল্পায়াস-সাধ্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু হৃদয়ে দয়ার আবেগ মন্দীভূত হইতেছে। তৎপরে কার্য্যটী প্রতিদিন চলিবে কিন্তু হৃদয়ে দয়ার সেরূপ সতেজ ও তীব্র ভাব থাকিবে না। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও এইরূপ। যখন কতকগুলি সাধনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, এখং মানুষ প্রতিদিন তাহা পালন করিতে থাকে,

তখন নিয়ম-পালন অভ্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতা ও আকাঙ্ক্ষার সতেজ ভাব আর পূর্ব্ববৎ থাকে না। তখন মানুষ কলের পুতুলের ন্যায় ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিতে থাকে। এমন সকল কথা বলে ও কাজ করে যাহা তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সুতরাং হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্নি ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যায়। এইরূপে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই এরূপ লোক অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা বাহিরে দেখিতে ধর্ম্ম-সমাজের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল মনোযোগ সহকারে পালন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষার অগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন। আত্ম-পরীক্ষা ব্যতীত আত্মার দুরবস্থা অনুভব করিতে পারা যায় না; এবং হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিও প্রজ্বলিত থাকে না। তখন তাঁহারা বাহ্যতঃ ধর্ম্ম সমাজের অঙ্গীভূত থাকিলেও বস্তুতঃ ধর্ম্ম-জগতের বাহিরে বাস করিতে থাকেন। তখন অপরাপর বিষয়ী লোকের ন্যায় বিষয় তাঁহাদের আরাধ্য হয়; বৈষয়িক উন্নতিই তাঁহাদের লক্ষ্য স্থানে থাকে; এবং প্রেম ও ভক্তি অন্তরে মৃতপ্রায় হইয়া যায়। এই সকল বিপদ আমাদের সকলের পথেই আছে; জগদীশ্বর এই সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

———

ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

একখানি সুন্দর ছবি দেখিলে যেমন দর্শকের মনে আনন্দ-সম্বলিত একপ্রকার ভাবের উদয় হয়, কোনও আধ্যাত্মিক মহা সত্তা বা ধর্ম্মজীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ মানস-চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইলেও মনে সেই প্রকার আনন্দ-জড়িত এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। সেই আদর্শ আমাদের কল্পনাকে অধিকার করে, মনকে দৃশ্য বিষয় সকলের সীমা হইতে যেন দূরে লইয়া যায়, এবং সেই অন্তঃস্থিত আদর্শের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন করে। এই অবস্থাতে আমাদের চিত্ত সেই সৌন্দর্য্যের বোধজনিত এক প্রকার আনন্দের দ্বারা প্লাবিত হইতে থাকে। আমরা অনেকেই সময়ে সময়ে এই প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। সেইরূপ ভগবানের গুণাবলী শ্রবণ কীর্ত্তনেও মনে এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও প্রকৃতিতে এই ব্রহ্মাস্বাদজনিত আনন্দ ভাব উচ্ছ্বাসের আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

বিধাতার এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেহ মনের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সঙ্গে আনন্দের যোগ আছে। ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারি পাইলে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণজনিত এক প্রকার আনন্দ লাভ করা যায়। সুখাদ্য ও সুপেয় সেবন করিলে এক প্রকার সুখ

হয়। এইরূপে যখন আমরা জ্ঞানলাভ করি, যখন কোনও নূতন বিষয় অবগত হই, যখন সংশয়ান্ধকার বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হয়, তখন হৃদয়ে এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। মনের সুখের ন্যায় হৃদয়ের সুখ, বিবেকের সুখ, আত্মার সুখও আছে। প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে প্রীতি দিয়া, স্নেহভাজনকে স্নেহ দিয়া, দয়ার পাত্রকে দয়া করিয়া এক প্রকার সুখোদয় হয়। সেইরূপ নিজ জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াও এক প্রকার সুখ অনুভব করা যায়। এই সকল কার্য্যের সহিত সুখের অচ্ছেদ্য যোগ দেখিয়া এক শ্রেণীর দার্শনিক এরূপ মনে করেন, যে তৎ তৎ কার্য্যে সুখই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমরা সুখাদ্য, সুপেয় গ্রহণের সুখের জন্যই আহার পান করি, জ্ঞানলাভের সুখের লালসাতেই জ্ঞানান্বেষণ করি, পরোপকারের সুখের জন্য দয়া করি এবং নিজ সুখের লোভেই কর্ত্তব্য সাধন করি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমরা ক্ষুধার তাড়নাতে আহার করি, কৌতূহলবৃত্তির উত্তেজনাতে জ্ঞানান্বেষণ করি, দয়ার প্রেরণাতে দান করি, ও বিবেকের প্রেরণাতে কর্ত্তব্য সাধন করি। সুখ আনুষঙ্গিক, তাহা লক্ষ্যস্থলে থাকে না। কিন্তু সুখ বা আনন্দ আনুষঙ্গিক হইলেও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা লক্ষ্যস্থলে থাকিতে পারে। এমন ঔদরিক থাকিতে পারে যে কেবল সুখাদ্য ও সুপেয়ের আস্বাদনের সুখকেই চায়, এমন গ্রন্থকীট থাকিতে পারে যে জ্ঞানার্জ্জনের আনন্দেই ডুবিয়া থাকিতে চায়,

এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকও থাকিতে পারে যাহার মনে ঈশ্বরের আদেশ পালনের ভাবের অপেক্ষা কর্ত্তব্যপালন জনিত তৃপ্তির ইচ্ছা অধিক প্রবল হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে যেমন, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেও তেমনি। ধর্ম্মজগতে এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁহারা ভগবানের শ্রবণ মনন ও কীর্ত্তন জনিত আনন্দটুকু সম্ভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু চাহেন না; এবং এতদ্দ্বারাই সর্ব্বদা নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিচার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই আনন্দ বা ভাবোচ্ছ্বাসের মাত্রা যত অধিক হইতে থাকে, ততই তাঁহারা আত্মতৃপ্ত হইয়া মনে করিতে থাকেন যে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব স্পৃহণীয়, এবং যদি এই আনন্দ বা ভাবোচ্ছ্বাসের মাত্রা কিঞ্চিৎ কম হয় তবেই তাঁহারা শোক করিতে থাকেন যে তাঁহাদের দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ফল কথা এই—আনন্দটুকুর জন্যই তাঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। নিমগ্ন হইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, ইঁহারা যে ঈশ্বরকে চান, তাহা কেবল এই আনন্দটুকুর জন্য; ঈশ্বর আনন্দের উপায়ভূত এই কারণে এই বিষয়ে অতিরিক্ত সুরাপায়ী ব্যক্তিদিগের সহিত ইঁহাদের তুলনা হইতে পারে। অতিরিক্ত সুরাসেবী সুরার জন্য সুরাসেবন করে না, কিন্তু সুরাজনিত মত্ততার জন্য করিয়া থাকে। সুরা দ্বারা যে প্রকৃতির মত্ততা জন্মিয়া থাকে, যদি সুরার পরিবর্ত্তে অপর কোনও পদার্থের দ্বারা সেইরূপ মত্ততা

উৎপন্ন করিতে পার, তবে সে সুরার পরিবর্ত্তে সে পদার্থ সেবন করিতে প্রস্তুত। মত্ততা লইয়াই তাহার প্রয়োজন, কোন পদার্থ বিশেষের দ্বারা সেই মত্ততা জন্মে তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় নহে। সেইরূপ ভাবুকের ভাব লইয়াই প্রয়োজন, কি ভজনা করিয়া ভাব জন্মে তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। ঈশ্বরের শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা যেরূপ আনন্দ হইতেছে যদি তাহা অপর কোনও পদার্থের ভজনার দ্বারা হয় তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।

কিন্তু আমরা বলি, প্রকৃত ধর্ম্ম কেবল ভাবে বাস করে না, তাহা কার্য্যকে অধিকার করে। ধর্ম্মসাধনের প্রাচীন ভাব এই যে, ধর্ম্ম জীবনের দশটী বিষয়ের মধ্যে একটী বিষয়। আমরা যেমন আহার করি, বিশ্রাম করি, কর্ম্মাস্থানে গিয়া কর্ম্ম করি, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি করি, তেমনি ধর্ম্মসাধন করি; ধর্ম্মসাধন দশটী কাজের মধ্যে একটী কাজ। ধর্ম্মসাধনের নূতন ভাব এই যে ধর্ম্ম সমুদয় জীবনব্যাপী, ইহা জীবনের একটী কাজ নহে, কিন্তু ইহাই জীবন। সুতরাং ধর্ম্মসাধন কোনও প্রকার আংশিক ব্যাপার নহে। এতদ্দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক বিভিন্ন ভাবে ধর্ম্মসাধনকে দেখিয়াছেন। দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি জ্ঞানপথাবলম্বিগণ মনে করিয়াছেন যে ধর্ম্ম জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। ভক্তিপথাবলম্বিগণ মনে করিয়াছেন যে ধর্ম্ম ভাবের মধ্যেই নিহিত। ভাব বিশেষের উত্তেজনা দ্বারাই

পরমার্থ সাধিত হয়। কর্ম্মবাদিগণ মনে করিয়াছেন যে বেদোক্ত ও শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। ইহাঁরা জ্ঞান ভক্তির উপরে ততটা নির্ভর করেন নাই। আমরা ধর্ম্ম-সাধন বলিলে এক বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকি। যে সাধন দ্বারা জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্য জ্ঞানে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রেম, সাধুজনে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করা যায় তাহাকে আমরা ধর্ম্মসাধন মনে করি।

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে ধর্ম্মসাধনের এই মহৎ ভাব মানব মনে প্রবিষ্ট হইতেছে। অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভাব এইরূপ যেন মানবের প্রকৃতিনিহিত গুণের সহিত ধর্ম্মের স্বাভাবিক বিরোধ আছে। প্রকৃতিকে বাধা দেওয়া, প্রকৃতিকে দলন করা, প্রকৃতি যাহা চায় তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করাই ধর্ম্ম। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, মানব-প্রকৃতি ভ্রষ্ট ও পাপদূষিত, ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা পাপে পঙ্কিল ও ধর্ম্মজীবনের বিরোধী। মানুষ যখন ধর্ম্মজীবন লাভ করে তখন তাহার মধ্যে আর এক প্রকৃতি জন্মগ্রহণ করে, তখন সে পূর্ব্বকার প্রকৃতির-বিরুদ্ধ পথেই গমন করিতে থাকে। হিন্দু ধর্ম্মে দুইটী প্রকৃতির এমন পরিষ্কার নির্দ্দেশ না থাকিলেও মানবজীবনকে বিষয়-বাসনার অধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য সকলও বিষয়-বাসনা বলিয়া প্রতীয়-মান হয়, এবং তদ্বিপরীত আচরণ করা ধর্ম্মসাধন বলিয়া পরি-

গণিত হয়। ধর্ম্মসাধনের বর্ত্তমান ভাব এরূপ নহে, ইহাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধন মানবপ্রকৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তবে প্রকৃতিকে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নিয়মিত করা আবশ্যক।

ধর্ম্ম শব্দ ধৃ=ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ধর্ম্ম কি? না যাহা ধারণ করে অর্থাৎ উদ্গামনোন্মুখ বস্তুকে অবরোধ করে। এই অর্থের বিষয় অনুধাবন করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, যাঁহারা প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে যাহাতে মানবের উৎপথ-প্রবৃত্ত প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত ও সংযত করে তাহাই ধর্ম্ম। সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারের কার্য্য আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা প্রধানতঃ মানব-সমাজের এই এক মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন যে, মানুষকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি রোধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মনু আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রকার, তাঁহার প্রধান চেষ্টা কি ছিল? সংক্ষেপে এই, মানুষ যে অনিয়মিত, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে, তাহা নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে নানা-প্রকার বিধি ও নিষেধের অনুগত করা। য়িহুদী ধর্ম্মের প্রধান পুরুষ মূষা কি করিলেন? উচ্ছৃঙ্খল ইস্রায়েল বংশীয়দিগকে অন্ততঃ দশটী প্রধান বিধির অধীন করিলেন। মহাত্মা যীশু কি করিলেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট য়িহুদীজাতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করিবার চেষ্টা করিলেন। মহম্মদ কি করিলেন?

উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী আরবীয় জাতিকে ধর্ম্মের কঠোর শাসনের অধীন করিলেন। মহম্মদের জীবনে ধর্ম্মের এই মহৎকার্য্য সাধনের যেরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিবৃত্তে বিরল। মহম্মদের সমকালে আরবের যে অবস্থা ছিল তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। এই সমরপ্রিয় জাতি নিরন্তর অন্তর্বিদ্রোহে ও নররক্ত-পাতে কাল কাটাইত ও বিবিধ যথেচ্ছাচারে লিপ্ত থাকিত; আর কিছু না হউক সেই জাতিকে যে মহম্মদ পাঁচবার নমাজ করিতে হইবে এই নিয়মের মধ্যে বাঁধিলেন ইহাই সে দেশের পক্ষে কি মহৎ পরিবর্ত্তন! তাঁহার ন্যায় আরবের উপকারী বন্ধু কে?

এক্ষণে আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি যে, আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছাধীন করাই যদি ধর্ম্মের একটা প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সংযম ও শাসনকে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

আমরা স্বেচ্ছাচার বলিতে সচরাচর অসাধু ভাবকেই বুঝিয়া থাকি। যে প্রবৃত্তির দাস, যে যথেচ্ছ আহার পান করে, যে অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবা করে সেই স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু ধর্ম্মের নামে, ও সাধু ভাবের নামেও যে এক প্রকার স্বেচ্ছাচার হইতে পারে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত জীবনই স্বেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত স্থল। আপনার প্রকৃতি ও আপনার প্রবৃত্তি কুল যাহা চায়, যাহাতে তৃপ্তি ও মিষ্টতা পায়, তাহা করিতে দেওয়া স্বেচ্ছাচার। নির্ব্বোধ মাতা যেমন

আপনার ক্রোড়স্থিত শিশুকে অনেক সময়ে আদর দিয়া থাকেন, তেমনি আমরাও অনেক সময়ে আমাদের প্রকৃতিকে আদর দিয়া থাকি। শিশু যাহা চায় তাহাকে তাহা দেওয়াই যেমন আদর দেওয়া, তেমনি আমাদের প্রকৃতি যাহা চায় তাহা দেওয়া প্রকৃতিকে আদর দেওয়া। অনেক ধার্ম্মিক লোকও এইরূপে স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিকে আদর দিয়া থাকেন। আমি এই শ্রেণীর একজন ধার্ম্মিকের চরিত্র অঙ্কিত করিতেছি, দেখিলেই সকলে অনুভব করিবেন যে ইহার অনুরূপ চরিত্র বিরল নহে। মনে করুন, একজন পুরুষ বা রমণী আছেন, সমাজে ভক্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে; ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জলধারা পড়ে; ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি ডুবিয়া যান; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ম্মের প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে পারেন; জীবনে বৈরাগ্যের চিহ্নও আছে; আহার বিহারের প্রতি দৃষ্টি নাই; মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র সর্ব্বদা তাঁহার দেহে দেখিতে পাওয়া যায়; ধনে লালসা নাই; ধনাগমের চেষ্টাও নাই; কিন্তু এদিকে তাঁহার কোন কার্য্যে শৃঙ্খলা নাই; আহার বিশ্রাম ও কার্য্য কিছুর নিয়ম নাই; গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে; আহারের সময়ে আলাপ, আলাপের সময়ে নিদ্রা, নিদ্রার সময়ে গল্প, কোন কাজে কথা রাখিতে পারেন না; কোন বাঁধা কাজে মন দিতে পারেন না। আমি বলি, ইহা বিশৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিক ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহেন কিন্তু নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করিতে ভালবাসেন।

কিন্তু বাহিরের জীবনে যে সুনিয়ম ও সংযমের উল্লেখ করা গেল, তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। ইহার মূল অন্তরে। সমুদায় ধর্ম্মের ভিত্তি এক সুগভীর বিশ্বাসের উপরে নিহিত। সে বিশ্বাসটী এই যে, যেমন এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় জগতে কতকগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম কার্য্য করিতেছে, তেমনি মানবের কার্য্য-কলাপের উপরেও দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম বিদ্যমান; এই নিয়ম ধর্ম্ম-নিয়ম নামে উক্ত হইতে পারে। এই নিয়মও অনিবার্য্য ও অনতিক্রমণীয়। এই নিয়ম অনুসারে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার অনিবার্য্য। সমুদায় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজন এই অনতিক্রমণীয় নিয়মকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা যখন ধর্ম্ম-নিয়ম, মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সহিত যখন ইহার সম্বন্ধ আছে, এবং ইহার পালন ও ভঙ্গের সহিত যখন পুরস্কার ও শাস্তির যোগ আছে, তখন ইহাকে জ্ঞান-প্রীতিহীন অন্ধ শক্তি মাত্র বলা যায় না। সত্য বটে, মহাত্মা শাক্যসিংহ ইহার অন্তরালে অধিক দূর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই, এবং ইহাকে কোনও জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পন্ন পুরুষের সহিত সংযুক্ত করেন নাই, কিন্তু তিনি ইহার দুরতিক্রম-ণীয়তা ও অবশ্য-পালনীয়তা ব্যক্ত করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয় তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া যে মধ্য-পথে দণ্ডায়মান ছিলেন সেখানে থাকা সম্ভব নহে। এই কারণেই দেখা যায় যে এই ধর্ম্মনিয়মের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিবার সময়ে যে জ্ঞানক্রিয়া-সম্পন্নতা নিরাকরণ করিলেন,

তাহাই আবার আদি বুদ্ধের গুণক্রিয়া রূপে চিত্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অপরাপর মহাজনগণের অবলম্বিত মার্গ আমাদের নিকট সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা বিশ্বাস করি এই ধর্ম্ম-নিয়ম এক জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পন্ন পুরুষের ইচ্ছা-সমুদ্ভূত ; এবং এই ধর্ম্মনিয়মের অধীন হওয়াই তাঁহার ইচ্ছার অধীন হওয়া।

মানবকে যে এই মহতী ইচ্ছার অধীন হইতে হইবে সে বিষয়ে কোনও মহাজনের মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন সেই মহতী ইচ্ছার অধীন হওয়াই ধর্ম্ম। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন মানব সে ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইতে পারে না ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মহাজনগণ আর একটী তত্ত্বে প্রবিস্ট হইয়াছেন। তাঁহারা গভীর আলোচনার দ্বারা দেখিয়াছেন যে মানবের অন্তরে যেন দুইটী শক্তি বিদ্যমান, যাহা তাহাকে দুই দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রথম, মানবের সুখপ্রিয়তা, সে নিজে কিছু চায়, নিজের রুচি ও প্রবৃত্তির অনুসারে চলিতে চায় ; দ্বিতীয়, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-নিয়মের সাক্ষীস্বরূপ কি একটা শক্তি তাহার হৃদয় মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাকে আর এক দিকে আকর্ষণ করে। এই উভয় শক্তির বিরোধের মধ্যে কি করিতে হইবে ? মহাজনগণ এক বাক্যে বলিতেছেন, নিজে স্বতন্ত্র ভাবে যাহা চাহিতেছ তাহাকে পরিহার করিতে হইবে। ইহাকেই বুদ্ধ বাসনার বিলয় বলিয়াছেন, যীশু আত্ম-বিলোপ বলিয়াছেন, মহম্মদ পূর্ণ

বাধ্যতা বলিয়াছেন। কথাটা একই, ঈশ্বরেচ্ছার সন্নিধানে আপনার বলিয়া একটা কিছু রাখিব না। ইহাকেই মুক্তি বলা যাইতে পারে, এবং জীবদ্দশায় এই অবস্থা যাঁহারা প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে।

তৎপরেই প্রশ্ন আসিতেছে, এতটা আত্ম-সমর্পণ বা আত্ম-বিলোপের ভাব পাইবার উপায় কি? এখানে আবার মতভেদ দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন জ্ঞান দ্বারা; কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রেম দ্বারা। একদল বলিয়াছেন অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া জান, তাহাতে আর আসক্তি থাকিবে না; সুতরাং নিজের কার্য্য কিছু থাকিবে না, এবং ধর্ম্ম-নিয়মের আনুগত্য সুসাধ্য হইবে। অপর দল বলিয়াছেন, ধর্ম্ম-নিয়ম যে জ্ঞান-ক্রিয়াসম্পন্ন পুরুষের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি কর, আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিলোপ সুসাধ্য হইবে। আমরা এই দ্বিতীয়শ্রেণী ভুক্ত লোক। আমরা প্রতিদিন প্রেমের এই মহিমা দেখিতেছি যে ইহা প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-বিলোপকে উৎপন্ন করে; ইহা স্বাধীনতাকে পরাধীনতাতে ও পরাধীনতাকে স্বাধীনতাতে পরিণত করে; ইহা সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বস্ব পায়, এবং মরিয়া জীবন লাভ করে; যে প্রেমের এই মহিমা সেই প্রেমই যে প্রকৃত পথ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং ধর্ম্মের লক্ষণ কি তাহা যদি সংক্ষেপে বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে প্রেমে ঈশ্বর-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা আপনার ইচ্ছাকে নিয়মিত করা।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটী বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা অনুভব ও নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে আপনাদের বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করার ন্যায় কঠিন কাজ আর নাই। সকল প্রকার দাসত্বের মধ্যে বাসনার দাসত্ব অতি সূক্ষ্ম ও প্রতারণাশীল। ইহা অজ্ঞাতসারে হৃদয়কে অধিকার করে। যে দাসত্বপাশে কঠিনরূপে বদ্ধ সে হয়ত আপনাকে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় স্বাধীন বলিয়া মনে করে। এই দাসত্বপাশ অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে এরূপ জড়াইয়া থাকে যে আমরা তাহা বহন করিয়া সুখী হই। অতএব বাসনার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য নিরন্তর আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। সর্ব্বদাই এরূপ চিন্তা মনে রাখিতে হয়, ধর্ম্মের লক্ষণানুসারে বিচার করিতে গেলে আমি কি আপনাকে ধার্ম্মিক শ্রেণী গণ্য করিতে পারি? আমার প্রকৃতি কি স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া চলিতেছে অথবা তাঁহার ইচ্ছার অধীন থাকিতেছে? আত্ম-পরীক্ষাশীল ব্যক্তিরাই এ পথের বিপদ সকল অতিক্রম করিতে পারেন।

ঈশ্বর হৃদয়ে

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন ঃ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশের্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥

গীতা ১৮ অধ্যায়।

অর্থ—"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তিনি নিজ শক্তির দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন। তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে তুমি পরমা শান্তি ও অভয়পদ প্রাপ্ত হইবে।"

ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ অব্যবহিত, ও নিকটস্থ পুরুষ রূপে জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে না পারিলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। কারণ প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা সান্নিধ্য ও বিনিময়কে অপেক্ষা করে। যাহাতে জ্ঞান বা প্রীতির আরোপ করিতে পারা যায় না, এরূপ পদার্থকে ধারণা করিয়া জ্ঞান চরিতার্থ হইতে পারে ; কারণ জ্ঞেয় বিষয়ের লাভেই জ্ঞানের চরিতার্থতা ; কিন্তু প্রেম ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক চায় ; প্রেম প্রেমকে

অন্বেষণ করে। এরূপ কখনও শ্রুত হওয়া যায় নাই যে, কোনও পুরুষ বা নারী কোনও চিত্রপটে অঙ্কিত নারী বা পুরুষ মূর্ত্তির সহিত প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে; সেই মূর্ত্তি তাহার ধ্যান জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়াছে, বা তাহার চিত্তকে উন্মাদ-প্রাপ্ত করিয়াছে। একটা জীবন্ত কুকুরকেও ভালবাসা সম্ভব, কিন্তু একটী চিত্রিত পরীকেও ভালবাসা সম্ভব নহে। কারণ কুকুরটীকে ডাকিলে সে মুখের দিকে চায়, লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে, লাফাইয়া কোলে উঠিতে চায়, ও অপরাপর প্রকারে আপনার প্রেম প্রকাশ করিতে থাকে। প্রেম পাইয়া হৃদয়ের প্রেম জাগিয়া উঠে। এই কারণে চিরদিন ভক্তি ভগবানকে অর্থাৎ করুণাময় ও লীলাময় বিধাতাকেই আশ্রয় করিয়াছে। জ্ঞান-সাধ্য ধৰ্ম্ম, যাহার ভিত্তি সংসারের অনিত্যতা জ্ঞানের উপরে, তাহা জ্ঞান-ক্রিয়া-হীন সত্তা মাত্রকে অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছে; ভক্তি তাহা পারে নাই। ভক্তি সতত সান্নিধ্য ও বিনিময় চাহিয়াছে।

কিন্তু ধৰ্ম্মরাজ্যের যাত্রিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে নানা প্রকার মত উদ্ভাবিত হইয়া ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে। এই সকল মত ভক্তবৎসল ভগবানকে ব্যাকুল ও পিপাসু হৃদয়ের সন্নিধানে উপস্থিত না করিয়া, যেন তাঁহাকে দূরে রাখিতেছে। এইরূপ কয়েকটী মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, প্রায় সমুদায় প্রাচীন ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর একসময়ে ঋষিদিগের নিকটে আপনাকে

প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের মুখ দ্বারা মানবকে মুক্তি-প্রদ বাণী শুনাইয়াছিলেন। সেই সকল উক্তি প্রাচীন বেদে, বা বাইবেলে বা কোরাণে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এখন ঈশ্বরেচ্ছা যদি জানিতে চাও তবে ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর; ঐ সকল গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রাচীন মৃতভাষা অধ্যয়ন কর; টীকাকারদিগের শরণাপন্ন হও; তদ্ভিন্ন আর জীবনের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। এই মতের প্রধান দোষ এই যে, ইহা ঈশ্বরকে অতীতের মধ্যে রাখিয়া দেয়। মানুষের সহিত তাঁহার যে কিছু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহা যেন চুকিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বলিবার তাহা যেন বেদের ঋষিদিগকে বা মূষাকে বা মহম্মদকে বলিয়াছেন; তোমাকে আমাকে আর কিছু বলিতেছেন না, বা বলিবেন না। ঠিক দেখিতে গেলে এই মতাবলম্বিগণ মানিতে পারেন না যে, ঈশ্বর এখনও মানবকে সাক্ষাৎ ও অব্যবহিত ভাবে কিছু বলিতেছেন বা বলিতে পারেন। কারণ ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি ঋষিদিগের অন্তরে যেমন তাঁহার বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি এখনও প্রত্যেক মানব-অন্তরে নিজ বাণী প্রকাশ করিতেছেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা জানিবার জন্য অতীতকে একমাত্র আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিতে হয় না। কিন্তু অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদিগণ ঈশ্বরেচ্ছা জানিবার জন্য অতীতকেই একমাত্র আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা বলি এরূপ মতে ঈশ্বরকে দূরে ফেলিয়া দেয়। মানবাত্মা তাঁহার জন্য ব্যাকুল ও পিপাসু হইলে যদি তাহাকে বলা যায়,

তুমি তাঁহার বাণী জানিবার জন্য ঐ পুরাতন পুস্তক উদ্ঘাটন কর, অমুক ভাষা অধ্যয়ন কর, বা অমুক টীকাকারের শরণাপন্ন হও, তবে সে কথা তাহার হৃদয়ের পক্ষে কেমন নিদারুণ বোধ হয়! এরূপ না বলিয়া গীতার পূর্ব্বোক্ত উক্তির অনুসারে যদি বলা যায় "ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি লাভ করিবে," তাহা হইলে তাহার অন্তরে কিরূপ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়?

অভ্রান্তশাস্ত্রবাদ যুক্তিযুক্ত কিনা এখানে তাহার আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়, তাহা না হইলে বলা যাইতে পারিত যে, কোনও গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী বলিয়াও নিষ্কৃতি নাই। অনেক স্থলে একই উক্তির বিবিধ অর্থ ঘটিতে পারে, সেই সকল অর্থের মধ্যে কোন্‌টী ঈশ্বরের অভীষ্ট ও অভ্রান্ত-রূপে গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? অতএব অভ্রান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে অভ্রান্ত টীকাকর্ত্তা না দিলে, নিশ্চিতরূপে কোনও উক্তির উপরে নির্ভর করিবার উপায় নাই। যদি প্রত্যেকের ভ্রান্তিশীল বিচার ও ভ্রান্তিশীল বিবেকের দ্বারা শাস্ত্রোক্তির বিচার করিতে হয় তবে অভ্রান্ত শাস্ত্র মানার ফল কি হইল? সে যাহা হউক এরূপ বিচার ও তর্ক প্রণালী অবলম্বন করা এ উপদেশের উদ্দেশ্য নহে, ব্যাকুল ও পিপাসু আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্য-জ্ঞানের প্রয়োজন—ইহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অবতারবাদ। এই মত বলে, ঈশ্বর বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে মানবকুলে অবতীর্ণ হইয়া আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর ভূভার হরণের নিমিত্ত, দৈত্যকুলের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত, অবতারত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন ; গীতাতে আছে ঃ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থ—"সাধুদিগের পরিত্রাণও দুষ্কার্য্যকারীদিগের বিনাশের নিনিত্ত, ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত, আমি যুগে যুগে জন্মিয়া থাকি।" অবতারত্ব গ্রহণের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তৎসম্বন্ধে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ভাব প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের ভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। খ্রীস্টধর্ম্ম বলেন, পাপীদিগের উদ্ধারের জন্যই ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ। পাপভারাক্রান্ত মানবকুল তাঁহার অভিমুখে উঠিতে অক্ষম, এই কারণে তিনি স্বয়ং অবনত হইয়া, আপনার মহিমাকে আংশিকরূপে গোপন করিয়া, মনুষ্যরূপ ধারণ করি-লেন, ও মানবকে উঠিবার পথ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু অবতার কল্পনার মুখ্য ও মুল ভাব যাহাই হউক, ইহাতেও ঈশ্বরকে পিপাসু মানব-হৃদয় হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে। ব্যাকুল ও পিপাসু আত্মা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র, তুমি তাহাকে বলিলে, ঈশ্বর তিন সহস্র বৎসর পুর্ব্বে বৃন্দাবনে, বা দুই সহস্র বৎসর পুর্ব্বে যুডিয়া দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহা কি তাহার পক্ষে ঈশ্বর-

দর্শনের সমান হয় ? যদি কোনও পল্লীগ্রামনিবাসী লোক শুনে যে, আলিপুরের পশুশালাতে সিংহ আনা হইয়াছে, তাহা হইলে কি তাহার সিংহ দেখা হইল ? অথবা আমরা যেমন শুনি যে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভূকৈলাসের রাজাদের বাড়ীতে বন হইতে একজন যোগী ধরিয়া আনা হইয়াছিল, যাঁহার কাণে সীসা গালাইয়া ঢালিয়া তবে তাঁহার চেতনা করিতে হইয়াছিল, এরূপ জনশ্রুতি শোনা ও এরূপ যোগী দেখা কি একই কথা ? কে জানে এরূপ জনশ্রুতির কতটা সত্য ? সেইরূপ কে জানে অবতার বিশেষের লীলা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির কতটা সত্য ? এ প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ঈশ্বরকে এরূপ দূরে রাখিয়া কি চলে ? তিনি যদি পাপীর উদ্ধারের জন্য এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেরূপ প্রয়োজন কি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে ? পৃথিবীর পাপভার কি লঘু হইয়াছে? মানব-হৃদয়ের প্রলোভন ও পরীক্ষা কি কিছু কম হইয়াছে ? বরং এই কথাই কি সত্য নয়, যে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নব নব পাপ মানব-সমাজে দর্শন দিতেছে। পূর্ব্বে পাপাচারিগণ রাজ-শাসনকে অতিক্রম করিতে পারিত না ; এবং আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়ও পাইত না ; এক্ষণে বিজ্ঞান বলে বলী হইয়া দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে রাজ-শাসনকেও অতিক্রম করিতেছে, এবং আপনাদের পাপপ্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিবার বিবিধ সুযোগও পাইতেছে। অপর দিকে মানব-হৃদয়ে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন শিথিল হওয়াতে

মানব-মন উদ্দাম বলীবর্দ্দের ন্যায় স্বৈরাচারে প্রবৃত্ত হইতেছে। তৎপরে বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক মানবের মনেও পাপ-প্রলোভনের সংখ্যা অধিকতর দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে অধিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে; অধর্ম্মাচরণ করিয়া সহস্র সহস্র লোক দিন দিন বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতেছে; তাহাদের দৃষ্টান্তে সত্য ও ন্যায়ের ভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে; নানাদিক হইতে নানা প্রকার পাপের প্ররোচনা প্রত্যেকের হৃদয়ে আসিতেছে; সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্ম্মসংগ্রাম পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর হইতেছে। অতএব জগতের ইতিবৃত্তে কোনও সময়ে যদি ভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কারণ ঘটিয়া থাকে, সে সময় এখন উপস্থিত। তাঁহাকে দেশে বা কালে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত প্রত্যেক আত্মাই তাঁহাকে চায়. অতএব প্রত্যেক হৃদয়েই তাঁহার অবতীর্ণ থাকা প্রয়োজন। যদি বল তিনি প্রত্যেক আত্মাতেই অবতীর্ণ আছেন, একথা সত্য, একথা মানি। আর যদি বল তিনি বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে অবতীর্ণ, তাহা হইলেই বলিব ইহা অসত্য; একথা যে বলে সে মানব-হৃদয় হইতে ঈশ্বরকে দূরে লইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরকে দূরে ফেলিবার আর একটী উপায় পৌত্তলিকতা। পৌত্তলিকতা বলে, ঈশ্বর বাহিরে, মূর্ত্তি বিশেষের মধ্যে; তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে বাহিরের পত্র পুষ্পে পূজা করিতে হইবে। ঈশ্বর বাহিরে!—একথা পাপ-

ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পক্ষে ঘোর নৈরাশ্যজনক। ঈশ্বর বাহিরে!—বল কি? তবে কি আমাদের প্রাণের ধর্ম্ম-সংগ্রামের সাক্ষী কেহ নাই? ঈশ্বর বাহিরে!—তবে কি আমাদের আত্মার ঘোর নির্জ্জনতার সঙ্গী কেহ নাই? কে না সময়ে সময়ে আত্মার এই নির্জ্জনতা অনুভব করিয়াছেন? যখন আমাদের আত্মা জীবনের ভার বহিয়া শ্রান্ত ও গলদ্ঘর্ম্ম হয় এবং অন্ধকার জীবন-পথে একাকী দাঁড়াইয়া নিরাশায় ডুবিতে থাকে, তখন আমাদিগকে উৎসাহ-বাণী শুনাইবার কেহ নাই? একি ভয়ঙ্কর কথা! ঈশ্বর বাহিরে।—তবে কি আমাদের প্রাণের গভীর সুখ ও গভীর দুঃখ জানিবার কেহ নাই? আমরা স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিকে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইব যে, আমরা বাহিরে যে সুখ বা যে দুঃখ প্রকাশ করি, তাহা সামান্য, তাহা অগভীর, ও অনেক সময় ক্ষণিক উত্তেজনা-সম্ভূত; গভীর সুখ ও গভীর দুঃখ সর্ব্বদা অব্যক্তই থাকিয়া যায়। এ বিষয়ে নদী-স্রোতের সহিত মানব-হৃদয়ের তুলনা হইতে পারে। নদীর স্রোতে যেমন দেখিতে পাই, জলরাশির উপর দিয়া এক প্রকার স্রোত চলে, সে স্রোত বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত, সেখানে তরঙ্গ উঠে, তাহা নৌবাহী জনের অরিত্রাঘাতে কম্পিত, কিন্তু গভীর অন্তস্তলে আর এক প্রকার স্রোত নিঃশব্দ-সঞ্চারে প্রবাহিত থাকে, তাহা বায়ুর আঘাতে আন্দোলিত হয় না, তাহাতে তরঙ্গ উঠে না, বা বাহিরের কোনও উপদ্রবে চঞ্চল হয় না। মানব-হৃদয়ে যেন তেমনি দুইটী স্রোত আছে।

প্রকৃতির বহির্ভাগে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার বায়ু প্রবাহিত সুতরাং সেখানে তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাবরাশি আন্দোলিত হইতেছে, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ দেখা দিতেছে, আবার দুই দিন পরে অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে অপরবিধ চিন্তা, অপরবিধ সুখ বা দুঃখ বাস করিতেছে যাহা মানবদৃষ্টির অগোচর। ঈশ্বর যদি বাহিরে তবে এই সুখ দুঃখের সাক্ষী কে? তাঁহাকে এই সুখ দুঃখের সাক্ষী ও এই নির্জ্জন জীবন-সংগ্রামের আশ্রয়-দাতারূপে না দেখিলে, হৃদয় কখনই তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন করিতে পারে না। অতএব পৌত্তলিকতা প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বিরোধী।

চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটী ভাব আছে যাহাতে ঈশ্বরকে দূরে ফেলে। সে ভাবটী এই, ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে জগৎ রচনা করিয়া কতকগুলি শক্তি ও কতকগুলি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, এখন তদনুসারেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য চলিতেছে। এখন আর ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-কলাপের উপরে তাঁহার কোনও হাত নাই। এখন কতকগুলি নিয়মাধীন থাকিয়া কতকগুলি অন্ধ শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চালাইতেছে। এই মতে বলে, ঈশ্বর বলিয়া যদি একজন কেহ থাকেন, তাঁহার সহিত জগতের কার্য্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; তিনি এক দুর্লঙ্ঘ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে জগতকে বাঁধিয়া নিজে সেই শৃঙ্খলের অপর পার্শ্বে রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি নূতন সৃষ্টি দেখা যাইতেছে না; সর্ব্বত্রই এক বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া; সুতরাং বোধ

হইতেছে, তিনি যেন সৃষ্টির কয়েক দিনের শ্রমের পর অনন্ত বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন।

জগতের সহিত ঈশ্বরের এই পরোক্ষ সম্বন্ধের ভাব বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্রবল হইয়াছিল। এক্ষণে এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। ঈশ্বর জড়ে ও চেতনে ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন, এই ভাব প্রতীচ্যদেশীয় দার্শনিকদিগেরও মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। গীতা পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানলব্ধ ভাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

অর্থাৎ ঈশ্বর নিজ শক্তির দ্বারা সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়বৎ চালাইতেছেন। জড়রাজ্যে বা প্রাণিরাজ্যে যে কিছু শক্তির ক্রীড়া দেখা যাইতেছে, যে সকল শক্তি কোথাও বা ভাঙ্গিতেছে কোথাও বা গড়িতেছে, সে সমুদায় শক্তি তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই ইচ্ছার প্রকাশ ; ও সকল ক্রীড়া তাঁহারই ক্রীড়া। তিনি সকলের মধ্যেই, তিনি নিরন্তর আমাদের নিকটে, তিনি আমাদের হৃদয়ে, এই ভাব ধারণ করিলেই প্রেম চরিতার্থ হয় এবং ধর্ম্মজীবন জন্মগ্রহণ করে।

তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন এবং আমাদের সুখ দুঃখ অবগত হইতেছেন, ইহা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, অনিবার্য্যরূপে আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ, এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে

আশার অভ্যুদয় হয়। ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্মসংগ্রামের সাক্ষী, তবে আমাদের মৃত্যু নাই। আমরা যখন অসৎকে বর্জ্জন করিয়া সৎকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি তখন আমরা তাঁহারই ইচ্ছার অনুগত হই ; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথেই গমন করিতে প্রয়াসী হই ; আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে প্রয়াসী হইব অথচ তাঁহার সাহায্য পাইব না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ? তিনি আমাদের অন্তরে সংগ্রাম তুলিয়া দিবেন অথচ সাহায্য করিবেন না ইহা কি যুক্তিযুক্ত ? অতএব এই বিশ্বাস বলে, যে আমাদের প্রার্থনা বিফলে যাইবে না। আমরা তাঁহার চরণাশ্রয় পাইবই পাইব। আশার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয় ও মানুষ পাপের উপরে জয়লাভ করে। এই জন্যই সাধু মহাজনদিগের সংস্রবে আসিয়া মানুষ ধর্ম্ম-জীবন পাইয়াছে। তাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া মানুষের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। জগত যাহাদের আশা ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং যাহারা নিজেও আপনাদের উপরে আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়াছিল, যাহারা ভাবিয়াছিল যে পাপই তাহাদের স্বভাব হইয়াছে এবং তাহাদের ন্যায় ঘৃণিত ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভাল কিছুই নাই, তাঁহারাও সাধু মহাজনদিগের নিকটে যখন আসিল তখন দেখিল যে তাঁহারা তাহাদের মধ্যে এমন কিছু দেখিলেন, যাহা দেখিয়া ভালবাসা জন্মিল। অমনি সেই হতভাগ্য হতভাগিনীগণ ভাবিতে লাগিল, তবেত আমাদের দশা একেবারে নিরাশাজনক নহে ; তবেত

আমাদেরও বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে; আমাদিগকে লইয়াও ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে কাজ আছে;—এই চিন্তাতেই তাহাদের হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। প্রায় সকল মহাজনেরই জীবনে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী পতিতা রমণী মহাত্মা যীশুর নিকট আসিত। একদিন সভামধ্যে সেই নারী যীশুর নিকট আসাতে তাঁহার শিষ্যগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে যীশু শিষ্যদিগকে ঐ নারীকে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন ও তাহার প্রেমের প্রশংসা করিলেন। ঐ কথাগুলি সেই রমণীর হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল তবে এই পাপীয়সীর আশা আছে, তবে কি সত্য সত্যই পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিব? এই চিন্তাতে তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল, তাহাকে নবজীবন আনিয়া দিল। এ জগতে যত পাপী নবজীবন পাইয়াছে, সমুদায় এইরূপে। প্রাণে নব আশার জন্ম না হইলে, বাহিরে নব জীবনের সূত্রপাত হয় না।

সাধুদের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে যদি পাপী নবজীবন পাইতে পারে, তবে অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কি হৃদয়ে আশা জন্মে না? তদ্দ্বারা কি পাপী নবজীবন লাভ করিতে পারে না? অবশ্যই পারে। তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিবার জন্য সকলে প্রয়াসী হন না। তাহা হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে হইলে বিশেষ সাধন চাই।

ঈশ্বরে আশা স্থাপন কর

Why art thou cast down O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God.

বাইবেল গ্রন্থে দায়ুদের সংগীতাবলী বলিয়া একটী অধ্যায় আছে তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অর্থ এই ঃ—হে আত্মন্! তুমি কেন বিষাদে অভিভূত হইতেছ? কেন তুমি অন্তরে অস্থিরতা অনুভব করিতেছ? তুমি ঈশ্বরে আশা স্থাপন কর।

জগতের যে সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বরূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মানবের জন্য আশার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। যদিও অধিকাংশ ধর্ম্ম মানবের বর্ত্তমান অবস্থাকে পতনের অবস্থা বলিয়া মনে করেন, তথাপি তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে এরূপ পতনের অবস্থা চিরদিন থাকিবে না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল চিরস্থায়ী হইবে না। ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম বলেন, সত্য যুগ পশ্চাতে; সত্য যুগে ধর্ম্ম চারি পদের উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন; তৎপরে ত্রেতা, দ্বাপরে এক এক পদ হ্রাস হইয়া এখন ঘোর কলি উপস্থিত। এখন ধর্ম্ম

পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। এই বিষাক্ত ও তিক্ত ভাব প্রাচীন ধর্ম্মের সমুদায় চিন্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার মতে এ জগতে জন্মগ্রহণ করাই এক বিড়ম্বনা, কর্ম্মফল ভোগ করা মাত্র। আর জগতে যাহাতে না আসিতে হয় তাহার উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মে ইহাও বলে যে, জগতের এ দুর্দ্দশা চিরদিন থাকিবে না, ভগবান পুনরায় ভুভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইবেন, এবং পুনর্ব্বার সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। খ্রীষ্টধর্ম্মেরও এই কথা। খ্রীষ্টধর্ম্ম বলেন আদিতে মানবের অবস্থা নিষ্পাপ ছিল; মানব নিজকৃত পাপের দোষে সেই পূর্ণ সুখের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এখন মানুষ যাহা করিতেছে সমুদয়ই পাপ-দূষিত; পাপ মানব প্রকৃতির অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এখন মানব দিন দিন পূর্ণ অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে; ঈশ্বরের সংসারে শয়তান রাজা হইয়া বসিয়াছে। কিন্তু শয়তানের রাজ্য চিরদিন থাকিবে না। যীশু আবার আসি-বেন; তখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এইরূপে দেখা যাইবে, পৃথিবীর সমুদয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মই মানবের জন্য আশার দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। বর্ত্তমানকে মলিন বর্ণে চিত্রিত করিলেও ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। তাহার বাণী আশার বাণী। বর্ত্তমান বিজ্ঞানলব্ধ ভাব বলিতেছে, সত্য যুগ সম্মুখে। জগত উন্নতির অভিমুখেই গমন করিতেছে। কি জড় রাজ্যে, কি

উদ্ভিদ রাজ্যে, কি প্রাণিরাজ্যে, সর্ব্বত্রই বিকাশ ও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। যে বিবর্ত্তনবাদ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একটী প্রিয় সত্য, তাহাতে বলে এ জগতের ইতিবৃত্তে কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলার ভিতর হইতে শৃঙ্খলা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখনও নিরন্তর অজ্ঞাতসারে এই বিকাশ ও উন্নতির প্রক্রিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান আশারই কথা প্রচার করিতেছে।

যে আশা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের উপরে স্থাপিত তাহাই প্রকৃত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি বলে ঈশ্বরের এই মঙ্গলময় রাজ্যে, অসত্য, অন্যায়, বা অসাধুতার জয় হইতে পারে, এবং সেই বিশ্বাসে যে অসত্য, অন্যায়, বা অসাধুতার আচরণে অগ্রসর হয়, সে প্রকারান্তরে নাস্তিকতাই প্রচার করে ; কারণ তাহার ব্যবহারের দ্বারা সে বলে যে এ জগতের উপরে কেহ নিয়ন্তা নাই। মঙ্গলময় ঈশ্বর যখন্ আছেন তখন পাপীর আশা আছে। সে চিরদিন পাপের গ্রাসে পড়িয়া থাকিবে না ; কারণ যদি সে চিরদিন পাপের গ্রাসে থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর-কৃপার জয় না হইয়া পাপেরই জয় হইল।

কিন্তু ঈশ্বরে আশা স্থাপন করা বড় কঠিন। এ জগতে মানুষ নিরন্তরই নিজের বলের উপরে আশা স্থাপন করিতেছে। নেপোলিয়ান যখন ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মেদিনীকে নররুধিরে প্লাবিত ও সহস্র সহস্র নারীকে বিধবা এবং সহস্র সহস্র শিশুকে পিতৃহীন করিয়াছিলেন, তখন কি

জানিতেন, যে তাঁহার রচিত সাম্রাজ্য তাঁহারই জীবদ্দশায়, তাঁহারই চক্ষের সমক্ষে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে? মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন দেশের পর দেশ জয় করিয়া, অবশেষে আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, তখন কি জানিতেন অল্পকাল মধ্যে তাঁহার সঞ্চিত শ্রীসম্পদ বিনষ্ট হইবে ও তাঁহার রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে? এই সকল প্রতাপশালী সম্রাট তাহা চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বল দর্পের উপরে আশার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মনে ভাবিয়াছিলেন যাহা বলের দ্বারা উপার্জ্জন করিতেছি তাহা বলের দ্বারাই রক্ষা করিব। কেবল যে মহতেরাই এ জগতে এরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা নহে, ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই এই মহামোহে নিমগ্ন। এ জগতে মানুষ যেন সময়-সিন্ধুর কূলে বসিয়া ধূলাখেলা করিতেছে। একদিন সায়ংকালে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বেড়াইতে গিয়া দেখি কয়েকটী শিশু বালুকারাশির উপরে বসিয়া খেলার ঘর বাঁধিতেছে; দুই হস্ত জমি ঘিরিয়া লইয়া বালুকারাশি তুলিয়া, প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই ভূমি-খণ্ডকে আবদ্ধ করিয়াছে; সেই ভূমি-খণ্ডের মধ্যে তাহাদের অন্তঃপুর, বহিঃপুর, শয়ন গৃহ, বৈঠকখানা, পাকশালা প্রভৃতি সমুদায় করিয়াছে। তাহারা এমনি মনো-যোগের সহিত সেই কার্য্যে রত আছে, যেন তাহাদের আর অন্য কাজ নাই, এবং তাহারা চির দিনই ঐ কার্য্য করিবে। যাহা হউক, ক্রমে রজনীর অন্ধকার সমাগত হইলে, শিশুগণ

খেলা-ঘর ফেলিয়া রাখিয়া ঘরে গেল। প্রাতে গিয়া দেখি সে বালুকারাশির উপরে তাহাদের খেলা-ঘরের চিহ্নমাত্রও নাই। নিশাকালে সাগরের জলরাশি স্ফীত হইয়া বেলাভূমিকে প্লাবিত করিয়াছে এবং শিশুদিগের সমুদায় কীর্ত্তি ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। এ জগতে মানুষের দশা কি অনেকটা এই প্রকার নয়? আমরা যেন সময়-সিন্ধুর কূলে বসিয়া ধুলাখেলা করিতেছি! প্রত্যেকে দুই এক হাত ভূমি ঘিরিয়া লইয়াছি; সেটুকুকে কিছুক্ষণের জন্য আপনার বলিতেছি; সেই ভূমিটুকুর মধ্যে নিজ সুখ ও সুবিধার মত সামগ্রী সঞ্চয় করিতেছি; কিন্তু কালতরঙ্গে সমুদায় ধৌত হইয়া যাইবে, ইহার কোন চিহ্নও থাকিবে না। অতএব কোনও প্রকার পার্থিব বলের উপরে আশার ভিত্তি স্থাপন করা আর বালুকারাশির উপরে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা।

যতদিন বুদ্ধি রাজসিক ভাবাপন্ন থাকে ততদিন মানুষ পার্থিব বলের উপরেই নির্ভর করে; ধনবল, জনবল, বা বুদ্ধি বিদ্যার বলের উপরেই আশা স্থাপন করে; মানুষ মনে করে আমার এত ধন আছে, আমি ধনের বলেই সকল বিপদ কাটিয়া উঠিব। আমাকে কে পারিবে? অথবা আমাদের সহায় সম্পদ এত, আমাদিগকে কে আঁটিয়া উঠিবে, অথবা আমি বুদ্ধির জোরে সমুদায় জাল কাটিয়া বাহির হইব, আমাকে কে পরাস্ত করিবে? যেখানে আপনার উপরে প্রবল আশা, আপনার উপরেই প্রধান দৃষ্টি, সেখানেই রাজসিক ভাব। সাত্ত্বিক ভক্তি

ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রকৃত সাত্বিক ভক্তি ঈশ্বরের কৃপার উপরেই আশার ভিত্তি স্থাপন করিয়া থাকে। ভক্ত আপনাকে ভুলিয়া যান বলিয়াই এত সাহসী। তিনি কেবল সত্যকে দেখেন ও সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখেন। সত্যের জয় অনিবার্য্য, কারণ সত্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার পক্ষে। তিনি বলেন ইহা যদি আমার কাজ হইত, এবং ইহার জয় পরাজয় যদি আমার ক্ষুদ্র শক্তির উপরে নির্ভর করিত, তাহা হইলে আমি চিন্তিত হইতাম, চিন্তিত কেন নিরাশ হইতাম, কারণ আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা কি হইতে পারে? কিন্তু সত্য ত আমার নহে, সত্য সত্যস্বরূপের, তাঁহারই শক্তি দ্বারা রক্ষিত। সুতরাং ইহা তাঁহার জগতে জয়যুক্ত হইবেই। এই বিশ্বাসের উপরে তিনি সুদৃঢ় আশা স্থাপন করিয়া থাকেন, এবং সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও তাঁহার সে আশা বিচলিত হয় না। স্থূলমতি মানবের ভাব অন্য প্রকার। সে স্থূল স্থূল বিষয়কেই অবলম্বন করে, সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম পথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবলম্বন করিতে পারে না।

মহাভারতের একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এই সত্যটীকে বিশদ করিতে পারা যায়। সে আখ্যায়িকাটী এই—কৃষ্ণ কুরু ও পাণ্ডব উভয় দলেরই বন্ধু ছিলেন; উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার কুটুম্বিতা। যখন উভয় দলে বিবাদ বাঁধিল, তখন তিনি বিপদে পড়িলেন, কোন্ দল ছাড়িয়া কোন্ দলকে আশ্রয় করেন। অতএব প্রথমে তিনি সন্ধিস্থাপন মানসে

কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের শিবিরে গতায়াত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস যখন বিফল হইল, যখন কোনও ক্রমেই সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। নিজে একদিকে ও নিজের নারায়ণী সেনা আর একদিকে রাখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, হয় আমাকে লও, না হয় আমার সেনা লও। স্থূলমতি দুর্য্যোধন ভাবিলেন, একা কৃষ্ণকে লইয়া কি হইবে, এক বাণের আঘাতেই নিহত হইতে পারেন, কৃষ্ণ-সেনাই লওয়া ভাল, এতগুলি যোদ্ধা পাওয়া যাইবে। অতএব দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ-সেনাই লইতে চাহিলেন। ইহাতে পাণ্ডবগণ দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদেরই থাক। কৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে গমন করিলেন। প্রজাগণ চতুর্দ্দিকে বলিতে লাগিল ঃ—

"জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

অর্থ—পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয়, স্বয়ং জনার্দ্দন যে পক্ষে আছেন।

মহাভারতকার হস্তিনাবাসী প্রজাগণের মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসী মাত্রেরই হৃদয়ের কথা। স্বয়ং ভগবান যে পক্ষে সে পক্ষের জয় অনিবার্য্য।

জনসমাজে, এমন কি ধর্ম্মসমাজেও, দুর্য্যোধনের অপ্রতুল নাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের আশা পার্থিব বলের উপরে স্থাপিত। বাহিরের স্থূল স্থূল বিষয় সকলের উপর তাহাদের যেরূপ দৃষ্টি, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক

বিষয় সকলের উপর তত দৃষ্টি নাই। এই সকল ব্যক্তি প্রেম অপেক্ষা অপ্রেমের প্ররোচনাতে অধিক উৎসাহিত হয়। যে সকল কার্য্যে প্রীতি, স্বার্থত্যাগ, একতা প্রভৃতির প্রয়োজন সে সকল কার্য্যে ইহাদের তত অনুরাগ বা মনের অভিনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কার্য্যে বিবাদ আছে, জিগীষা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবার স্থান আছে, আত্ম-প্রভাব বিস্তারের অবসর আছে, সে সকল কার্য্যে এই সকল ব্যক্তির মহা উৎসাহ। ধর্ম্ম-রাজ্যে পাণ্ডবে ও কুরুতে কি প্রভেদ তাহা বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতের স্থূলমতি মানবগণ যখন সাধু মহাজনদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, তখনি এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। তাহারা ধনবল ও জনবলে দৃপ্ত হইয়া মনে করিয়াছে যে তাহারাই জয়শালী হইবে। একবারও ভাবিতে পারে নাই যে সেই সূক্ষ্ম সত্যধারা এক সময়ে মহা নদীর আকার ধারণ করিয়া জগতে প্রবাহিত হইবে, এবং তাহাদের ন্যায় শত সহস্র ব্যক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস থাকিলে তাহারা কখনই বলের দ্বারা সত্যকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত না। যে সকল ধর্ম্ম-যাজক ও যে সকল ক্ষিপ্তপ্রায় লোক মহাত্মা যীশুকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল তাহারা কি একবার ভাবিয়াছিল যে তাহারাই কালে পরাজিত হইবে? বরং তাহারা এই ভাবিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল যে ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব, লোকবল সকলই তাহাদের দিকে। একটা সামান্য সূত্রধর তনয় কতক-

গুলি ধীবর লইয়া তাহাদিগের কি করিতে পারে? বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য প্রভৃতির শক্তি কত তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান সময়েও আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন এই কলিকাতা সহরে তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মসভা নামে একটী প্রকাশ্য সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সহরের ধনী, মানী, গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সকলেই এই সভার সভ্যপদবীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং সভার কার্য্য চালাইবার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সভার উদ্যোগকারিগণ সভার দিনে যখন সহরের বড় বড় লোকদিগকে সভাস্থলে দেখিতেন, এবং রাজপথে দণ্ডায়মান শকটশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন বলিতেন "কোথায় লাগে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা, রমণীরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ দিয়া যেমন পুঁটী মাছের পিত্ত গালিয়া বাহির করে, তেমনি রামমোহন রায়ের সভার পিত্ত গালিয়া বাহির করিব।" ওদিকে রামমোহন রায় কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। ধনবল জনবল তাঁহার কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার অবলম্বিত পথ দিন দিন অধিকে প্রশস্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীন সমাজের সম্মিলিত শক্তি ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারিল না। এই সময় রামমোহন রায়ের ভাব পূর্ব্বোক্ত ভাবের কিরূপ বিপরীত ছিল। তিনি কি আপনার

দলের দুর্ব্বলতা পরিজ্ঞাত ছিলেন না? তিনি জানিতেন সমগ্র দেশের লোক বিরোধী, তিনি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী দণ্ডায়মান। যে কতিপয় ধনিসন্তান তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারাও অনেকে ঘোর নির্য্যাতনের দিনে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তথাপি তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি লিখিলেন—"সেই দিন আসিবে যে দিন আজ যাহারা আমাকে নির্য্যাতন করিতেছে তাহাদেরই বংশধরগণ আমাকে দেশের মিত্র জ্ঞানে ধন্যবাদ করিবে।" তাঁহার এ আশার ভিত্তি কোথায় ছিল? ইহার ভিত্তি সত্যের উপর ছিল; ঈশ্বরের উপরে স্থাপিত ছিল। যেমন সমস্তদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও বুদ্ধিমান লোকে জানে যে মেঘ স্থায়ী হইবে না, প্রদীপ্ত সূর্য্য তাহারই অন্তরালে লুক্কায়িত আছে; সেইরূপ ঘোর নির্য্যাতন ও পরীক্ষার মধ্যেও বিশ্বাসী ব্যক্তি স্মরণ করেন যে সে বিপদের অন্তরালে মঙ্গলময় বিধাতা চির বিদ্যমান। বিপদ বিরোধ নির্য্যাতন প্রভাতের কুজ্ঝটিকা রাশির ন্যায় কিছুকাল পরেই অন্তর্হিত হইবে। ইহা জানিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ কুরু ও পাণ্ডবদিগের সমক্ষে যেরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন সেরূপ প্রশ্ন তোমার আমার সমক্ষেও প্রতিদিন উপস্থিত হইতেছে। আমাদেরও জীবনে এরূপ অনেক সময় আসিতেছে যখন আমরা একদিকে সত্য ও অপরদিকে সুখ সম্পদ, একদিকে ঈশ্বর অপরদিকে পার্থিব বিভব এই উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান

হইতেছি। তখন যেন আমরা এই বাণী শুনিতে থাকি—স্থির কর কি করিবে, আমাকে লইবে কি পার্থিব বিভব লইবে? সেই সময়ে বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনই বলিতে পারেন, আমি পার্থিব সম্পদ চাই না আমি তোমাকেই চাই। একথা যিনি বলিতে পারেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বাণী বার বার ব্রাহ্মদিগের কর্ণে আসিতেছে। আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি আমরা যদি সত্যকে গোপন করিতে পারি, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারি, অথবা অন্তরে তাঁহাকে জানিয়াও বাহিরে বিশ্বাসবিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারি, তাহা হইলে লোকের প্রিয় হইয়া, সুখ সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতে পারি; এরূপ সময়ে দুর্য্যোধনের ন্যায় স্থূলপ্রকৃতি-সম্পন্ন যাহারা, তাহারা বলিবে "যাক ঈশ্বর, থাক লোকানুরাগ, থাক সুখ সৌভাগ্য।" কিন্তু বিশ্বাসী ও প্রেমিকগণ বলিবেন—"কে চায় লোকানুরাগ, কে চায় সুখ সৌভাগ্য, কে চায় আরামে বাস,—হে ঈশ্বর! আমি তোমাকেই ও সত্যকেই সর্ব্বাগ্রে চাই। যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্।" এরূপ যাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহারাই প্রেমের অধিকারী। যে আপনাকে চায় প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যে কৃষ্ণের সেনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সে কুরু, সে পাণ্ডব নহে। জগদীশ্বর করুন আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে চাহিতে পারি।

ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন দেশীয় পণ্ডিত এমারসনের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। দেশভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে দেশ ভ্রমণে যে যত লইয়া যায়, সে তত পায়। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন, তিনি যে পরিমাণে বিদ্বান জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোক হন, সেই পরিমাণে উপকার লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়স্থিত জ্ঞান আলোকস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে এরূপ অনেক বিষয় দেখিতে সমর্থ করে, যাহা জ্ঞানালোক-বিহীন লোকে দেখিতে পায় না। কোনও নূতন স্থানে পদার্পণ করিবামাত্র নানাবিধ প্রশ্ন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় এবং তিনি তদনুসারে সমুদয় পদার্থ পরিদর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি কেবল বাহিরের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয় সকলে আবদ্ধ থাকেনা, কিন্তু তিনি নিমগ্ন হইয়া এমন সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, যাহা সাধারণ মানবের চক্ষের অতীত। তিনি তৎ তৎস্থানের প্রজাপুঞ্জের রীতি, নীতি, মানসিক ভাব, সাহিত্যাদি লক্ষ্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞ ভৃত্য যদি তাঁহার সঙ্গে যায় তাহার ভাব অন্য প্রকার। সে জাতীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় প্রশ্ন সকলের কোনও ধার ধারে না। তাহার প্রভুর চক্ষে যে আলোক

আছে, তাহার চক্ষে সে আলোক নাই। সুতরাং তাহার দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বাহিরের স্থূল স্থূল বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। সে দেশের লোক কিরূপ পাগড়ী পরে, বাজারে কোন জিনিস বেশী আসে, এইরূপ দুই চারিটী বিষয় দেখিয়াই সে নিরস্ত হয়। সুতরাং এমারসনের পূর্ব্বোক্ত কথা অতীব সত্য;—দেশভ্রমণে যে যত লইয়া যায়, সেই তত পায়।

কেবল যে দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে এই কথা সত্য তাহা নহে। জগতের শাস্ত্র ও মহাজনদিগের চরিত সম্বন্ধেও ইহা সত্য। শাস্ত্র ও সাধুর নিকটে যে যত লইয়া যায় সেই তত পায়; অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রালোচনাতে বা সাধুচরিত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহার নিজের ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা যত অধিক, তাঁহার নিজের অন্তরে যতটা আলোক আছে, তিনি সেই পরিমাণে উপকৃত হইয়া থাকেন। যে আলোকের সাহায্যে শাস্ত্র বা সাধুকে পাঠ করিতে হইবে, সে আলোক মানুষের নিজের হাতে। যাহার হাতে আলোক নাই সে কিছুই দেখিতে পায় না! নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই সেই চাবি যাহার দ্বারা শাস্ত্র ও সাধুকে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখা যায়। সংস্কৃত কবি ভবভূতি বলিয়াছেন,—

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

অর্থ—আমার সম-প্রকৃতি-সম্পন্ন কেহ হয়ত কোথাও

আছেন, বা পরে জন্মিতে পারেন, কারণ কালের অবধি নাই; এবং পৃথিবীও বিশাল।

ভবভূতি অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে তাহার রসাস্বাদন করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়। তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে তাঁহার সম-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক কেহও কোথাও জন্মিতে পারে। ভবভূতিকে বুঝিতে হইলে যেমন তাঁহার সম-প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়া চাই, তেমনি সাধুদিগকেও বুঝিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের সম-প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়া চাই। চৈতন্যকে বুঝিতে হইলে চৈতন্যের অনুরূপ প্রেম কিঞ্চিৎ হৃদয়ে আসা আবশ্যক। যীশুকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সেই বিশ্বাস ও নির্ভর কিয়ৎ পরিমাণে প্রাণে পাওয়া প্রয়োজন। মানুষের নিজের মধ্যে যাহা নাই, মানুষ কি প্রকারে তাহা দেখিতে পারে? যাহার অন্তরে দয়া নাই সে কি দয়ালু লোককে চিনিতে পারে? যাহার অন্তরে পবিত্রতা নাই সে কি পবিত্রাত্মা পুরুষ বা রমণীদিগকে ঠিক চিনিতে পারে? এই জন্যই দেখা যায় যাহারা বহু দিন কলুষিত জীবন যাপন করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টি এরূপ কলুষিত হইয়া যায় যে, তাহারা অপর সকলকে সর্ব্বদাই কলুষিত চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই জন্যই বলি সাধুকে জানিতে ও চিনিতে হইলে সাধু হওয়া চাই।

শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ। যাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা নাই তাঁহার নিকট শাস্ত্রের উক্তি সকল কেবল কতকগুলি

বাক্যের সমষ্টি ; কবির অত্যুক্তি মাত্র। অভিজ্ঞতাহীন মানুষ সে গুলিকে পাঠ করিয়া মনে করে, যে ভাবের উচ্ছ্বাসের সময়ে মানুষ অনেক কথা বলিয়া থাকে, যাহার মধ্যে সত্যতা থাকে না, ঐ সকল উক্তিও তদ্রূপ ; শুনিতে বেশ, বলিতে বেশ, কাজে করিবার জন্য নহে। কিন্তু যাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা আছে, তিনি ঐ সকল বাক্যের সত্যতা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া চমকিত হইয়া যান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বদেশ বিদেশের শাস্ত্র হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উপনিষদের একস্থানে উক্ত হইয়াছে :—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।”

অর্থ—পণ্ডিতেরা এই ধর্ম্ম-পথকে শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন। যে ব্যক্তির এই দুর্গমতার কিছুই অভিজ্ঞতা নাই, যে কখনও পাপ প্রলোভনের মধ্যে আত্মসংযমের প্রয়াস পায় নাই, আপনার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে শাসিত ও শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করে নাই, নানা প্রকার বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয় নাই, কাম ক্রোধের উত্তেজনার সহস্র কারণের ভিতরে কাম ক্রোধকে স্ববশে রাখিবার জন্য সংগ্রাম করে নাই, সে বলিবে ইহা কবির অত্যুক্তি ; ধর্ম্মপথের দুর্গমতাকে বাড়াইয়া বলিবার জন্য ক্ষুর-ধারার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপথের দুর্গমতার অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে তিনি শ্রবণ মাত্র বলিয়া উঠিবেন “ঠিক ! ঠিক ! শাণিত ক্ষুরধারাই ত বটে”। অথবা আর একটী

দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর; যীশু একদিন স্বীয় শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—Blessed are the pure in heart for they shall see God" অর্থ—"পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করিবেন।" পবিত্র-চিত্ত হইলে যে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করা যায়, এ কথার যাথার্থ্য কে বুঝিবে? যে ব্যক্তি নিরন্তর ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তাতে নিমগ্ন, কাম ক্রোধের বিকারে সর্ব্বদাই কলুষিত, মলিন চিন্তা ও ভাব হইতে দূষিত কামনা রূপ বাষ্পরাশি উঠিয়া যাহার দৃষ্টিকে সর্ব্বদাই অবরোধ করিতেছে. সে কি এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে? যাঁহাদের চিত্ত পবিত্র এবং যাঁহারা সেই পবিত্র চিত্তে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উক্তি শুনিবামাত্র বলিবেন 'ঠিক ঠিক, পবিত্র-চিত্ত না হইলে কি তাঁহার দেখা পাওরা যায়?" ফল কথা এই, জীবনে যাহা পাওয়া যায়, বা দেখা যায়, তাহা আর তর্কের বিষয় থাকে না। মানুষ যাহা ভোগ করে, তাহা সহজে বুঝিতে পারে, যাহা ভোগ করে না, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সহস্র তর্ক যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইলেও মনের সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না। সকল বিষয়েই এইরূপ। রাজনীতি বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দি। প্রাচ্য দেশীয় রাজতন্ত্র প্রদেশ সকলের শাসন-কর্ত্তারা বুঝিতে পারেন না যে প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিলে কিরূপে রাজ্য চলিতে পারে। এটা তাঁহাদের পক্ষে একটা মহা তর্ক বিতর্কের

বিষয়। কিন্তু আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য বা ফরাসি রাজ্যের ন্যায় প্রজাতন্ত্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের মনে এমন কোনও প্রশ্নই উঠে না; কারণ, তাঁহারা প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই বর্দ্ধিত; প্রজাগণকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিলে রাজ্য কিরূপে চলে তাহা দেখিয়াছেন, ভুগিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন ও প্রতিদিন করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের তর্কের বিষয় নয়। অপরের মনে যে কোনও বিভীষিকা আছে, তাহা তাঁহাদের মনে নাই। কারণ তাঁহারা নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা জানিয়াছেন যে কোনও বিভীষিকার কারণ নাই। সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ। যে সকল দেশে নারীর অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, সে দেশের লোকের মনে সর্ব্বদাই এই সংশয় থাকে বুঝিবা নারীর অবরোধ ভাঙ্গিলে নারীর পবিত্রতা থাকিবে না। যতই বল, যতই তর্ক বিতর্ক কর, এই সংশয় তাঁহাদের মন হইতে অপনীত হয় না। কিন্তু যে সকল দেশে নারীর অবরোধ নাই, সে সকল দেশের লোকের মনে এরূপ কোনও সংশয় আসে না। সে দেশের লোকে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের সংশয়ের কথা শুনিয়া বলে "সে কি? অবরোধ না থাকিলে পবিত্রতা থাকিবে না কেন? বরং যেখানে যত অবরোধের বাড়াবাড়ি সেখানে অপবিত্রতা তত অধিক।" দুই শ্রেণীর লোকের কেমন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। ইহার কারণ এই, যাঁহাদের দেশে অবরোধ নাই, তাঁহারা অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছেন যে তাহাতে ভয় বা বিপদের কারণ কিছুই নাই। জাতিভেদ সম্বন্ধেও

এইরূপ। জাতিভেদ-প্রপীড়িত দেশের লোকে চিরদিন মনে করিয়া আসিতেছেন যে, জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া গেলে সমাজ আর থাকিবে না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

উৎসীদেয়ু রিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

অর্থ—"আমি যদি কর্ম্ম না করি তাহা হইলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে ; আমি বর্ণ-সঙ্করের কারণ হইব, এবং এই সকল প্রজাকে বিনষ্ট করিব।" বর্ণ-সঙ্কর হইলে সমাজ বিনষ্ট হইবে ইহা এদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের একটী প্রবল ধারণা। কিন্তু যে সকল দেশে জাতিভেদ নাই তাহাদের সমাজ যে কেবল বিনষ্ট হইতেছে না তাহা নহে, বরং তাহারা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জাতিভেদ নাই বলিয়া তাহাদেন মনে কোনও ভয় বা সংশয় দেখা যায় না। জাতি-ভেদ-বিহীন রাখিয়া সমাজকে চালাইতে তাহারা অভ্যস্ত। সে বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় কোনও সংশয় তাহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ; এদেশের ন্যায় যে সকল দেশে সাকারোপা-সনা প্রচলিত, সে সকল দেশের প্রজাগণ স্বভাবতঃই মনে করিয়া থাকে যে সাকারোপাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না। নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা কেবল শূন্যে বাক্য-প্রয়োগ মাত্র। ইঁহাদের এই সংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত

যতই তর্ক উপস্থিত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়স্থিত সংশয় নিরাকৃত হয় না। কিন্তু তাঁহারা একবার ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করুন, ব্রহ্মোপাসকদিগের সহিত বসিতে থাকুন, অল্প দিনের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা রাশির ন্যায় তাঁহাদের সমুদয় সংশয় আপনাপনি কাটিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ যে পরিমাণে তাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের সংশয় ছিন্ন হয়।

এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেনঃ—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" অর্থাৎ সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে দেখিলে সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়। আমরা অনেকেই এই কথার সাক্ষ্য আপনাদের জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। প্রথমতঃ পরকাল সম্বন্ধীয় সংশয়ঃ— আমরা দেখিয়াছি অনেকের মন আত্মার অমরত্ব বিষয়ক সংশয়ের দ্বারা বহুদিন আন্দোলিত হইয়াছে। তাঁহারা এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন, অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, অনেক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহাদের সন্দেহ অপনীত হয় নাই। অবশেষে যখন ঈশ্বরারাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সহিত আপনাদের আত্মার সম্বন্ধ প্রতীতি করিয়াছেন, তখন ঐ সন্দেহ তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আর বাস্তবিক আত্মার অমরত্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণও এই। আমরা যখন ঈশ্বর-চরণে সমাসীন হই, যখন তাঁহাকে

আমাদের রক্ষক, প্রতিপালক ও জীবনের আশ্রয় বলিয়া অনুভব করি, তখন ইহাও অনুভব করিয়া থাকি যে এই সম্বন্ধ দুদিনের জন্য নহে। তিনি যে এই জীবনের কএকটী দিনের জন্য আমাদের আশ্রয় ও প্রতিপালক তাহা নহে, তিনি যে আমাদিগকে জ্ঞান ও প্রীতি-সম্পন্ন জীব করিয়াছেন, তাহা এজন্য নহে যে আমরা দুই দিনের জন্য তাঁহাকে জানিব ও সম্ভোগ করিব তৎপরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব। আমাদের প্রেমের স্বভাব এইরূপ দেখি যে ইহা গড়িতে চায় ভাঙ্গিতে চায় না; রাখিতে চায় বিনাশ করিতে চায় না। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, তিনি আমাদিগকে জ্ঞান ও প্রীতি দিলেন, 'আয় আয়' করিরা ডাকিলেন, কিন্তু যেই আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া চিনিলাম, নিকটে যাইবার জন্য উপক্রম করিলাম, 'ধর ধর' বলিয়া হাত বাড়াইলাম, অমনি আমাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। জীবনের দিক একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন! ইহা কি সম্ভব? এই জন্যই বলি, আত্মার অমরত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ঈশ্বর চরণে। তাঁহার সহিত যোগ উপলব্ধি করিলেই আত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় সংশয় প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে। এ বিষয়ে অনেকের চিত্তকে বহুদিন আন্দোলিত দেখা গিয়াছে। ঈশ্বর কি বস্তুতঃ মানবের প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন? যিনি সর্ব্বজ্ঞ, কোন অভাব তাঁহার অবিদিত আছে যে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? যিনি পূর্ণ তাঁহার কার্য্যে কি

ত্রুটি থাকা সম্ভব যে আমরা তাহা সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিব? ঈশ্বরের সকল কার্য্যই নিয়মাধীন; তিনি কি আমাদের অনুরোধে তাঁহার কোনও নিয়মের ব্যাঘাত করিবেন? তবে প্রার্থনা করাতে ফল কি? এইরূপ কত প্রশ্ন তাঁহাদের হৃদয়কে আকুল করিয়াছে। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য যত তর্ক যুক্তি উপস্থিত করা গিয়াছে, কিছুতেই তাহাদের সংশয় ভঞ্জন হয় নাই, মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে নাই। কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরের শ্রবণ মননে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সত্যতা উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করিয়াছেন, তখন দেখা গিয়াছে যে প্রার্থনার ভাব স্বতঃই তাঁহাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন প্রার্থনাকে আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

তৃতীয় সংশয় ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব বিষয়ে। ঈশ্বর বিধাতা ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি, তিনি যে কেবল কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অপর পার্শ্বে থাকিয়া জগতকে শাসন করিতেছেন তাহা নহে; কিন্তু সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতি জীবনে সন্নিহিত রহিয়াছেন, এবং প্রতি জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়মিত করিতেছেন। তর্কের দ্বারা কি কাহারও নিকটে এ কথা প্রতিপন্ন করা যায়? মানুষ দেখিতেছে যে সে নিজে এই জগতে কার্য্য করিতেছে, সে নিজ কার্য্যের ফলাফল ভোগ করিতেছে, সে শ্রম করিতেছে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, স্ত্রী পুত্র পালন

করিতেছে, অর্থসঞ্চয় করিতেছে, নিজের শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে ; ইহা ত প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহার মধ্যে ঈশ্বর কোথায় ? আমরা কি তর্কের দ্বারা কাহাকেও জীবনের এই সকল কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতে পারি ? আমরা যদি বলি, "ভাই, তুমি একা কাজ করিতেছ না, তোমার সঙ্গে আর একজন আছেন" তবে কি সে তাঁহাকে দেখিতে পায় ? তাহা পায় না। অথচ এই সকলের মধ্যেই যে আর একজন আছেন, তাহাতে সন্দেহও নাই। এই তাঁহার মহিমা যে তিনি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াও আপনার অধীন রাখিয়াছেন। ধানুকীর ধনুঃ-নিক্ষিপ্ত শর যতই দ্রুতগতিতে ও সরল রেখাতে যাউক না কেন, পরিণামে যেমন বক্রাকার গতিতেই ধরাতলে পতিত হয়, সেইরূপ আমরা এ জগতে যতই স্বাধীনভাবে নড়ি চড়ি, কাজ করি না কেন, পরিণামে আমাদের দ্বারা তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, আমরা এ জীবনের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ নহি ! এই জীবনস্রোত সন্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, আমরা যেন নদীর কূলে বসিয়া তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতেছি। নদীর স্রোতে যেমন নানাবিধ পদার্থ ভাসিয়া আসে, দৃষ্টিপথের অতীত প্রদেশ হইতে ভাসিয়া আসিয়া দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই আবার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া যায়, সেইরূপ যেন এই জীবনের ঘটনাবলী কোনও অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে ভাসিয়া আসিয়া ক্ষণকাল দৃষ্টিপথের অন্তর্ভূত থাকিতেছে, আবার

তিরোহিত হইতেছে। এই সকল ঘটনাবলীর নিয়ামক কে? এই জীবনের প্রকৃত কর্ত্তা ও প্রভু কে? এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই অনুভব করিতে পারা যায় যে একমাত্র আমরা এই জীবনের কার্য্য করিতেছি না; এ জীবনের কর্ত্তা ও প্রভু যিনি তিনিও আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। কিন্তু কোনও যুক্তির দ্বারা অবিশ্বাসী ও সন্দেহাকুল চিত্তে এ বিশ্বাস উদয় করা যায় না। ইহা দেখিবার বিষয়, তর্কের দ্বারা বুঝিবার বিষয় নয়। তুমি না দেখিলে কে তোমাকে দেখাইতে পারে? এই সংশয় নিবারণের একমাত্র উপায় আছে; তাহা ব্রহ্মোপাসনা। তর্ক-যুক্তির দ্বারা যাহা না হয়—তাহা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হইতে পারে। তুমি ঈশ্বরচরণে বস, তাঁহাতে প্রীতি স্থাপন কর, আপনার জীবনে তাঁহার প্রেম অনুভব করিবার অভ্যাস কর. দেখিতে পাইবে এই বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে। তুমি আপনার জীবনে তাঁহার হস্ত দেখিতে পাইবে। অতএব ঋষিরা যে বলিয়াছেন,—"তাঁহাকে দেখিলে সকল সংশয় ছেদন হয়"—তাহা অতীব সত্য।

মা মা ব্রহ্ম নিরাকারোৎ।

উপনিষদের একটী বচনে আছে ঃ—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্।
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ॥

অর্থ—ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।

এ জগতে যুগে যুগে যে সকল সাধু ভক্ত মহাজন ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং নিজ নিজ জীবনে জ্বলন্ত বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা সকলে এই বিশ্বাসেই আপন আপন হৃদয় মনকে দৃঢ় রাখিয়াছেন যে, "ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।" এই বিশ্বাস হইতেই মানবচরিত্রে বল আসে; নিরাশাকর ঘটনাবলীর মধ্যে আশা আসে; এবং জীবনের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে শক্তি ও সাহস আসে। যে ঘোর পাপে নিমগ্ন সে যদি ক্ষণকালের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া বাস্তবিক ভাবিতে পারে—"ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই", তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে নব শক্তি আবির্ভূত হয় এবং তাহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। কিন্তু "ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই" এ বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা অতীব কঠিন। আমাদের প্রতিজনের জীবনে প্রতিদিন এমন

সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহাতে এই বিশ্বাসের ভিত্তিকে বার বার আন্দোলিত করিয়া থাকে। সেই সকল প্রতিকূল ঘটনা ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে মানব সন্দিগ্ধ-চিত্তে বলিতে থাকে "ঈশ্বর কি বাস্তবিক আমাকে রক্ষা করিতেছেন? তিনি বোধ হয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

এরূপ কতিপয় অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমরা জনসমাজে প্রতিনিয়ত দেখিতেছি যে, পাপাচারিগণ জগতে সুখ সচ্ছন্দ লাভ করিতেছে; অন্যায়কারিগণ পাশব বলের দ্বারা দুর্ব্বলদিগকে অভিভূত করিয়া পীড়ন করিতেছে; মিথ্যাচারিগণ ছল ও প্রবঞ্চনার দ্বারা স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছে ও নিরাপরাধ সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে বিপন্ন করিতেছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিলে দুর্ব্বল-চিত্ত ও অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারে যে, ঈশ্বর বুঝি মানব-কূলের রক্ষক নহেন, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেবল তাহা নহে; অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ মানবের হস্তে ঘোর নিগ্রহ সহ্য করিতে-ছেন; বিপদের উপরে বিপদ আসিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে পিষিয়া ফেলিতেছে; তাঁহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়া বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল ঘটনা দেখিলেও অনেক সময়ে মন বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করে—সত্যই কি ঈশ্বর আমাদিগকে দেখিতেছেন? কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসিগণের মনের ভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা পাপের আপাত-মনোরম

রূপ দেখিয়া কখনই প্রতারিত হন না। তাঁহারা জানেন যে মঙ্গলময়ের এই রাজ্যে পাপ কখনই জয়লাভ করিতে পারে না। “সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃত মভিবদতি”—অর্থাৎ যে মিথ্যাকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। মূলবিহীন তরু যেমন বাঁচে না, তেমনি ঈশ্বরের সত্যময় রাজ্যে মিথ্যা স্থান পায় না; শীঘ্রই আর বিলম্বেই হউক, তাহা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। অতএব পাপের যে বাহিরের শ্রীবৃদ্ধি তাহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত বা চিন্তিত হন না,—কিন্তু বলেন ”হে মন! তুমি ঈশ্বরে আশা স্থাপন কর, ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।”

তৎপরে ইহাও স্মরণ রখা কর্ত্তব্য যে সাধু ও ধার্ম্মিক মহাজনদিগের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও তাৎপর্য্য আছে। বিপদের অন্ধকার ঘিরিয়া না আসিলে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত আলোক উজ্জ্বল দেখায় না। অপর দিকে জগতের জন্য যদি দুঃখ সহিতে হয় তাহা হইলে ভক্ত সাধু ভিন্ন কে সহিবে? নিজেদের জন্য যদি কাহাকেও খাটাইতে বা ক্লেশ দিতে হয় তবে আমরা কাহাকে দিয়া থাকি? যে পর, যে অপরিচিত, যাহার সহিত প্রেমের যোগ নাই, তাহাকে কি কষ্ট দি? না, যাহার সঙ্গে প্রেমের যোগ আছে, যে আমার জন্য শ্রমকে শ্রম, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবে না, এরূপ ব্যক্তিকেই দিয়া থাকি? তুমি আমি প্রতিদিন প্রেমিক ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি যাহা করিতেছি, ঈশ্বর সাধু ভক্তদিগের প্রতি সেই বিধান প্রতিদিন করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলেন—

"তোমরা ভিন্ন আমার হইয়া জগতের জন্য খাটিবে কে? ধর্ম্মের নিমিত্ত নিপীড়িত হইবে কে'? তোমরাই আমার মুখ চাহিয়া কষ্ট সহ্য কর। ধর্ম্মানুরাগের সাক্ষ্য দেও।" সাধুরাও এই ভাবেই সমুদায় কষ্ট দুঃখকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য যতই নিপীড়িত হন, সত্য ও সাধুতাকে আশ্রয় করিতে গিয়া যতই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে থাকেন, ততই বলেন—"আমার জীবন ধন্য যে তুমি আমাকে কষ্ট পাইবার উপযুক্ত মনে করিলে।" ইহা প্রেমের কথা। সাধুরা যে ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত হন, তাহাতে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম তদ্দারা ধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হয়, দ্বিতীয় সাধুগণ অন্তরে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সাধু-জীবনে ক্লেশ দুঃখ দেখিয়া প্রকৃত বিশ্বাসী লোকে মনে করেন না যে "ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়ছেন।"

দ্বিতীয়, আর এক প্রকার প্রতিকুল অবস্থা আছে, যাহাতে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারে, ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে আমাদের হৃদয়ের সাধু সংকল্প সকল কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। যেন অলক্ষিত স্থান হইতে কোনও প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের সমুদায় চেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয়। আমাদের শক্তি ক্ষয় হয় কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি না। এইরূপে আমাদের সাধু চেষ্টা সকল যখন বিফল

হইতে থাকে, তখন আমাদের মন নিরাশ হইয়া পড়ে, এবং আমরা মনে মনে ভাবিতে থাকি—"তবে কি ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? শুনিয়াছি তিনি শুভ সঙ্কল্পের চির সহায়, কৈ তিনি ত শুভ সংকল্প সাধনে আমার সহায় হইলেন না।" এইরূপ অবস্থাতে প্রকৃত অনুরাগী ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ মনে করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বোক্ত অকৃতকার্য্যতাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়। হয়ত তাঁহাদের নিজের দুর্ব্বলতা যথেষ্টরূপ না জানিয়া তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই বিফল-মনোরথ হইতে হইল। ঈশ্বর সাধু সংকল্পের চিরসহায়, কিন্তু মানুষ যে পরিমাণে আপনাকে তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত করে সেই পরিমাণে তাঁহার সাহায্য পায়। যে বিবিধ দুর্ব্বলতা-বশতঃ আপনাকে তাঁহার সাহায্যের অনুপযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। এই সকল চিন্তা করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা বলিতে থাকেন, অকৃতকার্য্যতাই আমাদের কল্যাণের কারণ হইয়াছে। প্রভু আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমরা তাঁহার প্রসাদ পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়াই সে প্রসাদ পাইতেছি না.. আজ অকৃতকার্য্য হইলাম, লাগিয়া থাকিলে দশদিন পরে কৃতকার্য্য হইব। তাঁহার করুণা আমা-দিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

তৃতীয়তঃ, বাহিরের সংগ্রাম হইতে দৃষ্টিকে তুলিয়া যখন অন্তরের সংগ্রামের প্রতি নিক্ষেপ করি, তখন নিরাশার আরও

কত কারণ উপস্থিত হয়। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। পার্থিব বিষয় সকলের জন্য প্রার্থনার কথা বলিতেছি না, আধ্যাত্মিক বিষয় সকলের জন্য আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহাও সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি পাপসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ঈশ্বর ও পরকাল বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, সে যে দিন উদ্বুদ্ধ হয়, যে দিন আপনার পাপ আপনি দেখিতে পায়, সেদিন তাহার অন্তরে কিরূপ ব্যাকুলতারই উদয় হয়! সে তখন কি আর এক-দিনও পাপে পড়িয়া থাকিতে চায়? সে তখন মনে করে যে এই দণ্ডেই আমার পাপ চলিয়া যাউক এবং আমি সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার অতীত হইয়া অচ্যুত পদ লাভ করি; এবং তখন সে এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে থাকে। সে ব্যাকুলবশতঃ বলে "ঈশ্বর তুমি আমাকে গভীর নরকের গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া সপ্তম স্বর্গে লইয়া যাও।" কিন্তু প্রার্থনা করিবামাত্র কি ঈশ্বর সেই পাপীকে গভীর নরকের গর্ভ হইতে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া থাকেন? তাহা সকল সময়ে দেখিতে পাই না। বরং ইহাই দেখিতে পাই যে সেই পাপীকে নিজ প্রাচীন পাপ ও দুর্ব্বলতা হইতে উঠিবার জন্য অনেক দিন সংগ্রাম করিতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যখন ঈশ্বরের কৃপা-পবনের সংস্পর্শে তাহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, যখন সে স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস আপনার অন্তরে দেখিতে পাইতেছে, এবং আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছে, তখন

তাহার পুরাতন শত্রু যেন হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল; তাহার উদ্দাম প্রবৃত্তিকূল তাহাকে আবার বন্দী করিয়া ফেলিল। এরূপ অবস্থাতে নিরাশ হইয়া মানুষ মনে মনে প্রশ্ন করিতে থাকে তবে কি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন না; তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে এমন প্রশ্ন আসে না। তাঁহারা বলেন,—"ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই; আমি সহিষ্ণু হইয়া অপেক্ষা করিলে তাঁহার সাহায্য আসিবেই আসিবে।"

বিধাতার বিধিই যেন এরূপ দেখি যে কেহ পাপে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এক উদ্যমে সেই পাপ হইতে উঠিতে চাহিলে পারিবে না; তাহাকে সংগ্রম করিয়া, ভুগিয়া, কষ্ট পাইয়া উঠিতে হইবে। এরূপ বিধি না থাকিলে মানব পাপের ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। যদি তুমি এক উদ্যমে দশ বৎসরের অভ্যাস-শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিতে, যদি এক-বিন্দু চক্ষের জলে বহু দিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করিতে পারিতে, যদি এক প্রার্থনাতে নরকের কীট ঘুচিয়া স্বর্গের দেবতা হইতে পারিতে, তাহা হইলে পাপের ভয়ানকত্ব থাকিত না। তাহা না করিয়া ঈশ্বর তোমার জন্য এই শাস্তির বিধান করিয়াছেন যে, পাপের দাসত্ব করিয়া তুমি এমনি শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধিয়াছ যে তুমি উঠিতে চাহিলেও সহজে উঠিতে পারিবে না; বার বার পতিত হইবে। যতই পতিত হইবে ততই পাপের

প্রতি ঘৃণা বাড়িবে; ততই ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের মধ্যেই তাঁহার কৃপা। এই ব্যাকুলতাই প্রমাণ যে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই। একজন যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে তাহাতেই বার বার পতিত হয়, ইহাতে তাহার অন্তরে যে কিছু আত্ম-নির্ভরের ভাব থাকে একেবারে চূর্ণ হইয়া যায় এবং সে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের করুণার উপরে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে। ইহা মানবাত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকর অবস্থা তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব আমাদের প্রার্থনা যে অনেক সময়ে পূর্ণ হয় না তাহা আমাদেরই কল্যাণের জন্য।

দ্বিতীয়তঃ, আর এক কারণে আমাদের প্রার্থনা অনেক সময়ে পূর্ণ হয় না। অনেক সময়ে আমাদের প্রার্থনার মধ্যে প্রকৃত নির্ভরের ভাব থাকে না. গুরু নানক যেমন বলিয়াছেন—"যেঁও জানো তেঁও তারো স্বামী"। "হে স্বামিন্! তুমি যেরূপে চাহ সেইরূপেই আমাকে উদ্ধার কর।" আমরা সেরূপ বলি না। আমাদের প্রার্থনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা যে কেবল ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতেছি তাহা নহে, কিন্তু কোন্ সময়ে ও কোন্ প্রণালীতে আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরকে আদেশ বা উপদেশ করিবার ভাবে যে প্রার্থনা করা হয় তাহা পূর্ণ হয় না। প্রার্থনার প্রাণ অকপটচিত্ততা ও পূর্ণ নির্ভর। তোমার যেরূপে ইচ্ছা হয় সেইরূপে আমাকে রাখ, এই ভাব যে প্রার্থনার মধ্যে থাকে তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা;

এবং তাহাই পূর্ণ হইয়া থাকে। নতুবা মানুষ ভাবের উত্তেজনায় ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া যাহা কিছু বলে, তাহাই প্রার্থনা নহে। অতএব আমাদের প্রার্থনা যে অনেক সময়ে পূর্ণ হয় না তন্মধ্যেও কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেই যে মনে করিব, "ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন," তাহা নহে। বরং তাহাতে অধিকতর প্রমাণ পাই যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ কোথায় পাই? উত্তর,—আত্মাতে তাঁহার বাণী শুনিয়া। নির্ম্মল পবিত্র মনে যখন আমরা সত্যের অনুসরণ করি, তখন আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে "ভয় পাইও না, আমি তোমার সঙ্গেই আছি" তাঁহার এই বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। যিনি ঐ বাণী শ্রবণ করেন নাই তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন না,—"ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।" যাঁহার চিত্ত বাস্তবিক নির্ম্মল, যিনি সত্য ও সাধুতা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না বা বা জানেন না, তিনি ত ঈশ্বরের সন্নিধানেই সতত বাস করিতেছেন এবং তাঁহার আলোকেই বিহার করিতেছেন; তিনি আর কিরূপে প্রশ্ন করিবেন ঈশ্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না?

তৃতীয়তঃ, প্রেমের প্রকৃতিই এই যে ইহা প্রেমাস্পদের প্রতি অসীম বিশ্বাস স্থাপন করে। যে রমণী আজ পরিণয়-সুত্রে বদ্ধ হইয়া নিজ প্রণয়ীর সঙ্গে বহুদূরে সাগর পারে গমন

করিতেছেন, তাহাকে যদি বল "তুমি কর কি ? অল্প দিনের পরিচিত ব্যক্তির সহিত কোথায় চলিলে ? তুমি একাকিনী অসহায় স্ত্রীলোক, তোমাকে বিদেশে লইয়া ত বিপদে ফেলিতে পারে ; তোমাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া ত পলাইতে পারে ; তোমার গলে ছুরি দিয়া ত মারিতে পারে। এ সকল প্রশ্ন তাহার মনে উদিত করিবার চেষ্টা করাই বৃথা। হৃদয়স্থিত প্রেম তদ্দণ্ডেই ঐ সকল প্রশ্নকে সংমার্জ্জনী দ্বারা ঝাঁটাইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। প্রেম সন্দেহ করিতে জানে না। আমরা যদি ঈশ্বরে অকপট প্রীতি স্থাপন করি, আমাদের দশা ঐ প্রকার হয় ! আমরা ঘোর দুঃখে পড়িলেও বলিতে পারি না "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" মন সততই বলে "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই"।

যেমন বর্ত্তমান দেখিয়া প্রেমিক হৃদয় বলিতে থাকে "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই" তেমনি ভূতকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও বলিতে থাকে "ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।" কারণ প্রেমই চক্ষের সেই জ্যোতি যাহাতে প্রেমের নিদর্শন দেখাইয়া দেয়। তুমি তোমার বন্ধুর প্রতি সদ্ভাববশতঃ যে কাজ করিতেছ, যদি তাহার প্রেম না থাকে, তবে সে কাজ তাহার নিকট কিছুই বোধ হইবে না, বরং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বোধ হইতে পারে। অতএব ভূতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন দেখিব তাহাতেও প্রেমিক হৃদয়ের প্রয়োজন। তাঁহাতে অকপট প্রীতি স্থাপন

করিলে সেই চক্ষু পাই, যদ্দ্বারা ভূত জীবনে তাঁহার অগণ্য করুণার নিদর্শন দেখা যায়। এইরূপ কৃপার নিদর্শন দেখিলেই মন বলিতে পারে 'ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।"

ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল ক্রোড়ের মধ্যে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছি, সর্ব্বদা তাঁহার করুণার ছায়াতে বাস করিতেছি, এইরূপ অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের মন অনেক পাপ তাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে; এবং এইটীই একটী প্রধান সাধনের বিষয়। ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার প্রেমও আছে, ইহা কেনা জানে। তাহা জানিলেই কি যথেষ্ট? যদি তাহা আত্মার স্বাভাবিক বিশ্বাসে পরিণত না হয়, যদি সংসারের পাপ তাপ প্রলোভনের মধ্যে ঐ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কার্য্য না করে, তাহা হইলে কি হইল? ঈশ্বর করুণাময় ইহা মুখে স্বীকার করিলে কাহারও ধর্ম্ম হয় না; আপনাকে তাঁহার করুণার আশ্রিত বলিয়া অনুভব করিতে পারিলে ধর্ম্মজীবন হইয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই ধর্ম্মজীবন দান করুন!

ধর্ম্মের শক্তির প্রমাণ কোথায় ?

মহাত্মা যীশু একদিন তাঁহার ধর্ম্মকে দম্বলের সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন—"আমার ধর্ম্ম দম্বলের ন্যায়"। একজন স্ত্রীলোক এক কলস দুগ্ধে দম্বল দিয়া রাখিল, প্রাতে দেখে সমুদয় দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে, আমার ধর্ম্মও সেইরূপ।

ইতিহাস তাঁহার এই বাক্যের সাক্ষ্য দিয়াছে। জগতের যে সকল প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রধান রূপে প্রচারিত হইয়াছে, সেখানে ইহা বাস্তবিক দম্বলের কার্য্য করিয়াছে। খ্রীস্টধর্ম্ম ইহার জীবনের প্রথম চারি পাঁচ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া প্রধানতঃ রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ও রোমের শাসনান্তর্গত প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এই কয়েক শতাব্দীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুটী প্রধান বিষয়ে খ্রীস্টধর্ম্ম সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। প্রথম, রোমে, গ্রীসে, ও মিসরে সর্ব্বত্রই পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত রোমকগণ এই পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু ইহা রাজনীতির একটা অঙ্গ স্বরূপ হওয়াতে ও অজ্ঞ প্রজাকুলকে শাসনাধীন রাখিবার প্রয়োজন থাকাতে, তাঁহারা বাহিরে ইহার প্রতি এক প্রকার আস্থা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও রীতি নীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন; কখন কখনও প্রকাশ্যভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন; অথচ কার্য্য-

কালে প্রচলিত ধর্ম্মের নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহারা বিশ্বাসে উন্নত একেশ্বরবাদ হৃদয়ে ধারণ করিতেন, অথচ কার্য্যে পৌত্তলিকতার আচরণ করিতেন। এইরূপে অনেকের জীবনে অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম ও বহিরঙ্গ ধর্ম্ম দুই প্রকার ধর্ম্ম থাকিত। তৎপরে রোমীয় প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ ও রমণীগণ কর্ম্মোপলক্ষে যখন তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতেন ও সে দেশপ্রচলিত অনেক দেবদেবীর পূজার প্রথা রোমে আনয়ন করিতেন। এইরূপে রোমে দেবদেবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। কোন কোনও স্থানে এই পৌত্তলিক উপাসনার সহিত অনেক প্রকার অমানুষিক রোমহর্ষণ কাণ্ড সংযুক্ত ছিল। আফ্রিকার উত্তর বিভাগবাসী কার্থেজ নগরের সন্নিধানে মোলক দেবতার এক মূর্ত্তি ছিল। সে মূর্ত্তি এত বৃহৎ ছিল যে তাহার উদর মধ্যে এককালে দুই দুইটী কুমারীকে ফেলিয়া দিয়া দগ্ধ করা হইত। অনেক দেবমন্দির বিবিধ প্রকার পাপাচারের একটী প্রধান স্থান ছিল। খ্রীস্টধর্ম্ম এই পৌত্তলিকতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কিরূপে পরিবর্ত্তিত করিলেন? নিরন্তর পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া? মহম্মদীয় ধর্ম্মের ন্যায় তরবারির সাহায্যে পৌত্তলিক উপাসনার বিনাশ করিয়া? না; আদিম খ্রীষ্টীয়গণ পৌত্তলিকার প্রতিবাদ করিতেন বটে, অসহ্য নির্যাতন সহ্য করিয়াও পৌত্তলিকতাতে লিপ্ত হইতেন না বটে, মস্তক দিতেন তথাপি সে মস্তক কোনও ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার চরণে নত

করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা বলের দ্বারা নহে। তাঁহারা যে দিন ঘোষণা করিলেন যে ঈশ্বর পরমাত্মা ও তাঁহাকে আত্মার দ্বারা ও প্রীতির দ্বারা পূজা করিতে হয়, সেই দিনই এই মহৎ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। এই আদর্শ যে পরিমাণে মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল, সেই পরিমাণে পৌত্তলিকতার পুরাতন ভাব হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরকে আত্মাতে রাখিয়া প্রেমে পূজা করিতে হইবে, এই কথার সঙ্গে পৌত্তলিকতা মিলে না, এই কারণেই পৌত্তলিকতা স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। মানুষ যখন একটা নূতন আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে, তখন আপনার সমুদয় চিন্তা, সমুদয় কার্য্য সমুদয় রীতি নীতি ও সমুদয় সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখে এবং যে চিন্তা, যে ভাব, যে রীতি ও যে সামাজিক ব্যবস্থা তাহার সঙ্গে মিলে না, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। এই কারণেই তখনকার লোকে ঈশ্বরের যে নূতন ভাব হৃদয়ে পাইল তাহার সঙ্গে মিলাইয়া পৌত্তলিকতাকে বর্জ্জন করিল।

আর একটী বিষয়ে সুমহৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে মানবাত্মার মহত্ত্ব জ্ঞান অতি-অপরিস্ফুট ছিল। জগতের বাল্যাবস্থাতে বর্ব্বর জাতি-সকলের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত, তখন্ আপনাদের দলকে রক্ষা করাই প্রত্যেকের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তাহারা জানিত, যে দলের

শক্তি পরাভূত হইলে তাহাদের প্রত্যেকের বাঁচিবার উপায় নাই; শত্রু হস্তে মৃত্যু ভিন্ন বা দাসরূপে ক্রীত বিক্রীত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই; অতএব যেরূপে হয় স্বদলকে রক্ষা কর—এই তাহাদের মূলমন্ত্র ছিল। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলনায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার কিছুই বলিয়া বোধ হইত না; সুতরাং মানবাত্মার মহত্ব জ্ঞান ফুটিত না। এই কারণেই বিকলাঙ্গ শিশুদিগকে হত্যা করা, যুদ্ধে জয় করিয়া পুরুষ ও রমণীদিগকে দাস দাসীরূপে ক্রয় বিক্রয় করা, দাসদিগকে হিংস্র জন্তুদিগের মুখে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা প্রভৃতি অনেক নৃশংস প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয়গণ বিশেষ ভাবে এই সকল নৃশংস রীতির প্রতিবাদ করিতেন বটে, কিন্তু এ বিষয়েও তাঁহারা যে মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা আর এক প্রকারে। তাঁহারা মানবাত্মার একটী নূতন আদর্শ লোকের নিকটে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন "মানবাত্মা ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে সৃষ্ট, তাঁহার অক্ষয় সম্পদের অধিকারী ও স্বর্গবাসী দেবগণের সমাধিকারী।" যে সকল প্রদেশের লোকে চিরদিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে মানবাত্মার অধিকার বলিয়া কিছু নাই, শিশুদিগকে হত্যা করাতে পাপ নাই, দাসত্ব প্রথাতে নিষিদ্ধ কিছুই নাই, সেই সকল প্রদেশে এরূপ কথা প্রচার হওয়া কি ঘোর বিপ্লবের ব্যাপার! বাস্তবিক এই বিপ্লবই ঘটিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে শিশুহত্যা ও দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেল। খ্রীষ্টীয়গণ এক একটী মানবাত্মার উদ্ধার সাধনের জন্য প্রাণ

সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই প্রযত্নে নিষ্ঠুর গ্ল্যাডিয়েটরের খেলা রহিত হইয়া গেল।

এ বিষয়ে মহাত্মা যীশুর একটী উপদেশ তাঁহাদের অন্তরে অতিশয় কার্য্য করে। সে উপদেশটী এই, একটী পাপীর আত্মাকে ঈশ্বর মূল্যবান জ্ঞান করেন। তিনি দুইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সত্যটীকে শিষ্যগণের মনে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রথম দৃষ্টান্ত মেষপালকের। যদি একজন মেষপালক সমস্ত দিন মেষ চরাইয়া দিবাশেষে গৃহে ফিরিবার সময়ে গণনা করিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার একশতটী মেষের মধ্যে একটী আসে নাই। তাহা হইলে কি সেই পথভ্রান্ত মেষটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলে, যাক্ একটা মেষ গেলইবা, নিরেনব্বইটা ত আছে, আমি তদ্দ্বারাই আপনার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিব ; না সে নিরানব্বইটী মেষকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া সেই পথভ্রান্ত মেষটীকে অন্বেষণ করিতে যায়, এবং যতক্ষণ তাহাকে না পায় ততক্ষণ তাহার আরাম থাকে না ; পাহাড়, পর্ব্বত, বনে জঙ্গলে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়ায়, আয় আয় করিয়া ডাকে ; নিজে গলার সাড়া দেয়, যদি পালকের গলা শুনিয়া সে ফিরিয়া আসে এবং অবশেষে যখন তাহাকে পায় তখন তাহাকে স্কন্ধে করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ফিরিয়া আসে। এই দৃষ্টান্ত দিয়া যীশু বলিলেন—ভক্তবৎসল ভগবান এইরূপ একটা পাপী আত্মাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আগ্রহ করিয়া থাকেন।

অথবা মনে কর, অন্ধকার ঘরে কোনও বৃদ্ধার একটী টাকা হারাইয়া গেল। তখন কি সে বৃদ্ধা মনে করে যাক্ একটা টাকা, আর নয়টাত আছে, তাহার দ্বারা আমার কাজ চালাইব; না, সে তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া সিন্দুকের নীচে, চৌকির তলে, এ কোণে ও কোণে, তাড়ি বিতাড়ী করিয়া খুঁজিতে থাকে এবং যতক্ষণ টাকাটী না পায় সুস্থির হইতে পারে না। একটী পাপী আত্মার জন্য ঈশ্বরের আগ্রহ এইরূপ। একটা পাপী আত্মার জন্য ঈশ্বরের আগ্রহ যদি এত অধিক হয়, তবে একটী আত্মার মূল্য কত? এ চিন্তা স্বভাবতঃই মানব মনে উদিত হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের এই নব আদর্শ যতই মানব-মনে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ততই শিশু-হত্যা, দাসত্ব প্রথা প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। মানুষ এই আদর্শের সহিত আপনাদের রীতি নীতিকে মিলাইয়া লইবার চেস্টা করিতে লাগিল।

সর্ব্ববিষয়েই এইরূপ। সুবিখ্যাত ফরাসি বিদ্রোহের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই শতাব্দী কালের মধ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি তখন পূর্ব্বোক্ত সত্যের আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হই। ফরাসি বিদ্রোহের সময় হইতে প্রজাকুলের অধিকার সম্বন্ধে যে নূতন আদর্শ মানব-মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রভাবে ইউরোপীয় জাতি সকলের রাজনীতি ও শাসনপ্রণালী দিন দিন পরিবর্ত্তিত

হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই প্রজাগণের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। যেখানে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা সকল এই সব আকাঙ্ক্ষার পথ রোধ করিতেছে, সেই খানেই তুমুল বিপ্লব ঘটিতেছে। রাজনীতির নূতন আদর্শ আসাতে শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে যে নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়াছেন সে বিষয়ে একবার চিন্তা করি। আমরা কি পরীক্ষাতে সকলে জানিয়াছি যে ইহা যীশুর উক্ত দম্বলের ন্যায় ? যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলকে যদি এই মূহূর্ত্তে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করি, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে কি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনে দম্বলের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে ? অর্থাৎ তাহারা ইহাকে চিন্তাতে রাখিয়া দেখিয়াছেন, ইহা চিন্তাকে পরিবর্ত্তিত করে, কামনাতে রাখিয়া দেখিয়াছেন কামনাকে পরিবর্ত্তিত করে, আলাপে রাখিয়া দেখিয়াছেন আলাপকে বদলাইয়া দেয়, পরিবারে রাখিয়া দেখিয়াছেন পারিবারিক জীবনকে নবভাবাপন্ন করে, সামাজিক নীতি ও আচার ব্যাবহারে রাখিয়া দেখিয়াছেন, ইহা নীতিকে ও সামাজিক জীবনকে নূতন করিয়া ফেলে। আজ যদি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বর্গ-ধাম হইতে অবতীর্ণ হন, তিনি কি বলিবেন ? এই যে দেখি আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, আমি দম্বলের ন্যায় যাহাকে দুগ্ধ

কলসে রাখিয়াছিলাম তাহা দুগ্ধকে দধিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে।

ইহা আমাদের সকলেরই চিন্তার চিষয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পরিবর্ত্তন আনয়ন না করে, তবে ইহার কাজ হইল না। মানুষের হৃদয় যদি না বদলায় তবে ধর্ম্মের শক্তি কি? তুমি আমি যাহা ছিলাম তাহাই যদি রহিলাম তবে এই স্বর্গীয় অগ্নি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কি করিল? তণ্ডুল যদি বলে আমি জলের সঙ্গে মিশিয়া আগুনের উপরে ছিলাম, আমি আগুনের উপরে বহুক্ষণ ছিলাম, অথচ যদি সে তণ্ডুলই থাকে, তবে সে কথাতে কে বিশ্বাস করিবে? লোকে বলিবে ও মিথ্যা কথা, যদি আগুনের উপর থাকিতে তাহা হইলে আর তণ্ডুল থাকিতে পারিতে না, তুমি ভাত হইয়া যাইতে। তেমনি মানুষ যদি বলে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলাম, আমি তাঁহাকে প্রাণে পাইয়াছি, অথচ তাঁহার হৃদয়ে ও জীবনে পরিবর্ত্তন না দেখা যায় তাহা হইলে কে বিশ্বাস করিবে? সকলেই বলিবে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, ঈশ্বরকে প্রাণে ধারণ করিলে তোমার এই দশা!

হৃদয় পরিবর্ত্তনের দিকে আমাদের প্রধান দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর আমরা ধর্ম্মের মত ও ধর্ম্মের বাহ্য আচরণ দেখিয়া প্রবঞ্চিত হই। মনে কর, একজন যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে বিশ্বাস করে ও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন করে, তবেই সে ব্রাহ্ম, তবেই ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে। কিন্তু ইহার মত ভ্রম হইতে পারে না। ব্রহ্মশক্তির

প্রভাবে যাহার হৃদয় পরিবর্ত্তন হয় নাই, যাহার পাপে অরুচি ও পুণ্যে রুচি জন্মে নাই, বাসনা নিবৃত্ত হয় নাই, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে নাই, তাহার ধর্ম্মজীবনই জন্মে নাই। এরূপ লোক একটী সমাজবদ্ধ থাকিলেও তাহা ধর্ম্মসমাজ নহে। দশজন লোক যদি এরূপ থাকে, যাহাদের অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মের আগুণ জ্বলিয়াছে, সেই দশজনকে লইয়া প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ হয়। যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি নাই তাহারা বাহিরে দেখিতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করে নাই। প্রত্যেকে আপন আপন হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন—ঈশ্বরের শক্তি কি অগ্নির ন্যায় কার্য্য করিতেছে ? সে উৎস কি হৃদয়ে খুলিয়াছে, যাহা হইতে তাজা তাজা ধর্ম্ম ভাব নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইতে পারে, যাহা হইতে বিশ্বাস প্রেম ও বৈরাগ্য উৎসারিত হয় ? যদি সে উৎস না খুলিয়া থাকে, তবে আমরা ধর্ম্মজীবন হইতে দূরে রহিয়াছি।

এ ত পুরাতন কথা বলিতেছি। প্রাচীন কালের পূজ্যপাদ ভারতীয় ঋষিগণ যে ঈশ্বরের নামকে "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" বলিয়াছিলেন তাহার কারণ কি ? অগ্নির সহিত ইহার তুলনা কোথায় ? অগ্নির চারিটী শক্তি। অগ্নি আলোক দেয়, অগ্নি তাপ দেয়, অগ্নি কঠিন ধাতুকে দ্রব করে, অগ্নি পদার্থ সকলকে পরি-বর্ত্তিত করে। ঈশ্বরের নাম অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতি যখন হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন এই চারি প্রকার কার্য্যই করিয়া থাকে। ইহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে, অবসন্ন ও মৃতপ্রায় আত্মাকে

জীবিত করে, কঠিন স্বার্থপর হৃদয়কে কোমল করে, ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্ত্তিত করে। যদি দেখ তোমার হৃদয়ে ইহা এই চারি প্রকার কার্য্য করিতেছে না, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত থাকিও না। যদি দেখ ঈশ্বরের নাম পদ্মপত্রের জলের ন্যায় হৃদয়ের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে, হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিতেছে না, তাহা হইলে তুমি আর সুস্থির থাকিও না। তাহাকে দুরন্ত ব্যাধি বলিয়া মনে কর। সমাজের দিকে চাহিয়া যদি দেখিতে পাও, নরনারী সাজিয়া গুজিয়া আসিতেছে, বাহিরে নীতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে না; পরন্তু নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানেও লাগিয়া আছে, কিন্তু হৃদয়ে আগুনের মত জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা নাই; জীবনের উত্তাপ নাই; যাহা হইতে নব নব ধর্ম্মজীবন উৎসারিত হইতে পারে সে জিনিষ নাই; তবে বুঝিও সেখানে ঈশ্বর রাজা না করিয়া সংসারই রাজ্য করিতেছে।

ভক্তির দৃষ্টি

জগতে তিন শ্রেণীর মানুষ তিন ভাবে মানব-জীবনকে দর্শন করে। তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব এবং তদনুসারে জীবনের গতি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তিন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তটী এই :—মনে কর, কোনও স্থানে কয়েক ব্যক্তি সমবেত হইয়া খোল করতাল সহকারে কীর্ত্তন করিতেছে। তাহারা সকলেই ভাবরসে মগ্ন হইয়া কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উঠিতেছে; এমন সময়ে একজন পথিক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হইল। সে ব্যক্তি কীর্ত্তন বিদ্যাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে একটা সুর ও লয় আছে ও উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনের যে একটা হৃদয়-উন্মাদিনী শক্তি আছে, তাহা সে ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাত। উহার মধ্য হইতে কোনও প্রকার ভাব গ্রহণে সে ব্যক্তি অসমর্থ। একে ত তাহার সঙ্গীতের মিষ্টতা আস্বাদনোপযোগী কোনও স্বাভাবিক শক্তি নাই, তাহাতে আবার জীবনে কোনও দিন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন শোনে নাই; সুতরাং সে আপনাকে অতিশয় অসুখী বোধ করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতে লাগিল,—"এ লোকগুলি কি ক্ষিপ্ত? ইহারা কি করিতেছে?" অবশেষে স্থির করিল;—"ইহারা বৃথা গোলমাল করিতেছে। কেহ

বা নাচিতেছে কেহ বা বাজাইতেছে, কেহ বা চীৎকার করি-
তেছে ; এইরূপে নিরর্থক গোলযোগ করিয়া সময় কাটাইবার
একটা উপায় বাহির করিয়াছে। এ লোকগুলি অতিশয়
নির্ব্বোধ, বোধ হয় সংসারে ইহাদের করিবার কিছু নাই।”
এই স্থির করিয়া সে ব্যক্তি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।
রাজপথে বহির্গত হইলে অপর একজন পথিক তাহাকে প্রশ্ন
করিল,—‘মহাশয় ! ও বাড়ীতে কি হইতেছে ?” সে নিতান্ত
উপেক্ষার সহিত উত্তর করিল,—“কতকগুলি অলস ও অকর্ম্মণ্য
লোক একত্রিত হইয়া কেবল চীৎকার করিয়া বৃথা সময় কাটাই-
তেছে।” তৎপরে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল।
সে ব্যক্তি কীর্ত্তনের রসাস্বাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নহে ; উৎকৃষ্ট
কীর্ত্তন সে অনেক বার শুনিয়াছে ; ইহার সুর, তাল, লয়
প্রভৃতির জ্ঞানও তাহার কিছু কিছু আছে। সুতরাং সে
পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে নিতান্ত অসুখী মনে করিয়া
প্রস্থান করিল না। কিন্তু সেখানে সে কাহাকেও চিনিল না ;
গায়কদলের প্রত্যেকেই তাহার অপরিচিত। সে ব্যক্তি
কাহারও কণ্ঠের স্বর ধরিতে পারিল না এবং কি যে গাহিতেছে
তাহাও তাহার সুস্পষ্ট বোধগম্য হইল না। কেবল এই মাত্র
অনুভব করিতে লাগিল ;—একটী সুন্দর জানা সুর গাহিতেছে,
এবং কীর্ত্তনে, খোলে, ও করতালে অপূর্ব্ব লয় হইতেছে ! সে
মনে মনে বলিতে লাগিল, “বাঃ কি সুন্দর গাহিতেছে !” ইহার
অধিক আর কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কীর্ত্তনের ভাবার্থ

গ্রহণ করিতে পারিল না। তথাপি তাহার মনটা প্রফুল্ল হইল; প্রাণে একপ্রকার আনন্দের সঞ্চার হইল; কিন্তু কিছু পরে সেও চলিয়া গেল। অবশেষে তৃতীয় একব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি যে কেবল মাত্র কীর্ত্তনের রসাস্বাদনে পারদর্শী এমন নহে, কিন্তু উক্ত দলের মধ্যে যে গায়ক সর্ব্ব-প্রধান, যে ব্যক্তি উক্ত কীর্ত্তনের রচয়িতা এবং গায়কদলের নেতা, তাহার সহিত সে ব্যক্তি গূঢ় বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ। প্রথমে সে কাণ পাতিয়া কীর্ত্তনের কথাগুলি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল একটা সুন্দর সুর কাণে লাগে। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ কীর্ত্তনের দুইটা শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল; শুনিতে পাইল বলিতেছে "সদা বিরাজিত রে" অমনি বুঝিতে পারিল "এই ত হৃদয়ে রে" এই কীর্ত্তনটী হইতেছে। অমনি সমস্ত কীর্ত্তনটী বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। এই দুইটী শব্দ চাবি স্বরূপ হইয়া সমস্ত কীর্ত্তনটীকে ও তাহার অন্তর্হিত ভাবার্থকে খুলিয়া ফেলিল। তখন বর্ণে বর্ণে তাহার হৃদয় তন্ত্রী বাজিতে লাগিল। আবার সে কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল যে, তাহার সেই চিরপরিচিত প্রেমাস্পদ বন্ধু গাইতেছেন। অমনি কি পরিবর্ত্তন! তাহার অন্তরে ভাবসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে আর দূরে থাকিতে পারিল না। কোনও অদৃশ্য আকর্ষণে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। সেই কীর্ত্তনিয়া দলের মধ্যে গিয়া তাহাদের সঙ্গে কীর্ত্তনস্রোতে মগ্ন হইল।

ঠিক এইরূপ তিন শ্রেণীর লোকে তিন ভাবে মানব-জীবনকে দর্শন করিয়া থাকেন। প্রথম শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ মানব-জীবনের পশ্চাতে কোনও সৌন্দর্য্য বা শৃঙ্খলা দর্শন করেন না। তাঁহাদের চক্ষে এ জগৎ অন্ধশক্তির ক্রীড়াভূমি এবং জীবনের এই মহা-গীতির অন্তরালে কোনও স্থুর নাই, তাল নাই, লয় নাই, মিষ্টতা নাই। জীবন কেবল স্বস্থুখান্বেষী প্রবৃত্তি সকলের ক্রীড়াভূমি মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে আপনাকে বাঁচাইতে পারে সেই বাঁচে। যাঁহারা এইরূপ নাস্তিক-চক্ষে জীবনকে দর্শন করিয়া থাকেন তাঁহারা জীবনের স্থুখভাগ অপেক্ষা দুঃখ-ভাগের দ্বারাই সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন এ জীবনে দুঃখ যন্ত্রণাই অধিক। কিন্তু দুঃখ দেয় কে? কেহ দেয় না; শক্তি চক্রের আবর্ত্তনে দুঃখ অনিবার্য্য-রূপে আসে। কি ভয়ানক মানসিক অবস্থা! দুঃখ পাইব, অথচ দুঃখ-দাতাকে ঘৃণা করিয়া যে একটু স্থুখী হইব তাহার উপায় নাই; কাহারও উপরে আক্রোশটা প্রকাশ করিয়া যে হৃদয়ের ভারটা লঘু করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বলেন—"যে যেমনে পার আপনাকে বাঁচাও; যাতনা পাও ও আক্রোশে আপনার হস্ত দংশন কর; আক্রোশ মিটাইবার স্থান নাই; যাতনা দেখিবার কেহ নাই।" এই ভাব মানব-হৃদয়ে প্রবল হইলে মানুষ আর এ জগতে থাকিতে চাহে না; জীবন এমনি ভার স্বরূপ মনে হয়। এই ভাব এক প্রকার বিষাক্ত চশমার ন্যায় হইয়া মানুষের চক্ষে লাগে সেই

চশমার মধ্য দিয়া যাহা দেখে তাহাই তিক্ত ও বিষাক্ত মনে হয়। তখন রাজা ও রাজনীতি, সমাজ ও সমাজনীতি, বিবাহ ও দাম্পত্যনীতি সমুদায়কেই যেন মানবকে দুঃখ দিবার যন্ত্র স্বরূপ বোধ হইতে থাকে। ক্রমে ইহারা নরদ্রোহী ও সমাজ-দ্রোহী হইয়া উঠে। বর্ত্তমান শতাব্দীর এই শেষ ভাগে আমরা এই সকল উক্তির কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। নাস্তিকতার বিষময় ফল এই ফলিতেছে যে, যে সকল শ্রেণীর মধ্যে ইহা বহুল প্রচার হইতেছে, সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে এবং সমাজদ্রোহিতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী আর এক ভাবে মানব-জীবনকে দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের পশ্চাতে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার পশ্চাতে আর গমন করেন না, সৃষ্টি কৌশলের পশ্চাতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখেন না; নিয়মের অন্তরালে নিয়ন্তাকে লক্ষ্য করেন না। তাঁহাদের ঈশ্বর কেবল এক মহাশক্তি-পারাবার মাত্র, এই জগৎ শৃঙ্খলাময় নির্ব্বাক্ ও অচেতন ক্রিয়ামাত্র। তাঁহারা যে একেবারে আনন্দে বঞ্চিত তাহা নহে; কারণ এ অত্যদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের বিষয়ে ধ্যান করিলে, কাহার না চিত্তে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। যখন ধ্যানযোগে আপনার জীবনকে এই মহাশক্তি-পারাবারে বুদ্‌বুদ্ সমান দেখিতে পাওয়া যায়, যখন

অনুভব করা যায় যে, অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনন্ত শৃঙ্খলা চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং এই জীবন তাহার কেন্দ্রস্থলে ফুটিয়া উঠিতেছে, তখন মন এক নিস্তরঙ্গ ঘনানন্দের রাজ্যে প্রবেশ করে। যোগিগণ ও ভাবুকগণ অনেকে এই নিস্তরঙ্গ ঘনানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃস্ফূর্ত্তি আনন্দ প্রেমকে আশ্রয় করে না, কিন্তু আত্ম-তৃপ্ত হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে। দ্বিতীয় শ্রেণী এই আনন্দেই সন্তুষ্ট।

কিন্তু ইহাই কি ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের চরমাবস্থা? কখনই নহে। এইটুকু পাইয়া যাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হন, তাঁহারাও জীবনের সুধা ভাল করিয়া পান করেন না। ইহার উপরে আর এক ভাব আছে, জীবনের চাবি সেইখানে। তাহা ভক্ত ও প্রেমিকদিগের ভাব। ভক্ত যে কেবল এই জগতের ও মানব-জীবনের পশ্চাতে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করেন তাহা নহে; জীবনের মহাগীতির ভিতরে যে কেবল সুর, তাল ও লয় অনুভব করিয়া থাকেন তাহা নহে; ঐ মহাগীতির প্রণেতা যিনি, যিনি অধিকারী হইয়া নটদিগকে সাজাইয়া আসরে আনিতেছেন, এবং নিজে পশ্চাতে থাকিয়া সুর দিয়া গাওয়াই-তেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর অনুভব করিয়া থাকেন। যেই তাঁহাকে চিনিতে পারা, অমনি যেন সমুদায় মহাকাব্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। সুখ, দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ্, সকলেরই মধ্যে সেই স্বর কাণে বাজিতে থাকে। ভক্তি চাবি স্বরূপ হইয়া জগৎ, জীবন, সাধু ও শাস্ত্র সমুদায় খুলিয়া সমুদায়ের মধ্যে পরমার্থ

তত্ত্ব দেখাইয়া দেয় এবং ধর্ম্মকে জীবন্ত করে। ধর্ম্ম বলিলে মানুষ অনেক প্রকার পদার্থ বুঝিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করাই ধর্ম্ম। সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানে হউক ইষ্টদেবতার নাম লইলেই ধর্ম্ম। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এদেশে ও অপরাপর দেশে কোটি কোটি নরনারী প্রতিদিন স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছে। এ বিষয়ে মানুষ এতদূর গিয়াছে যে, বৌদ্ধ যতি-দিগের মধ্যে নাম জপ করিবার জন্য এক প্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। কল ঘুরাইয়া দিলেই চক্ষের নিমেষে শত শত নাম হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকে কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পালন বিষয়ে অতীব মনোযোগী। তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। তদ্দ্বারাই তাঁহারা মানুষকে বিচার করিয়া থাকেন এবং সে বিষয়ে কেহ অমনোযোগী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি-বিধানে অগ্রসর হন। অপর দিকে ইঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম-জীবনের বিষয় পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইলে, এই বাহিরের ক্রিয়া কলাপের দ্বারাই বিচার করিয়া থাকেন। যদি দেখেন যে তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল প্রতিপালিত হইতেছে, তবে তাঁহারা আত্ম-তৃপ্ত হইয়া মনে করেন যে, তাঁহারা উন্নতি লাভ করিতেছেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ কেহ কেহ প্রধানতঃ মতের বিশুদ্ধতার

দ্বারা ধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল মতকে বিশুদ্ধ ও যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া জানিয়াছেন, সে গুলিকে যদি কেহ মানে তবেই সে ধর্ম্মে আছে, আর সে গুলি যে না মানে সে ধর্ম্মের বহির্ভূত। এই সংস্কার হৃদয়ে থাকাতে সকল দেশে এবং সকল সম্প্রদায় মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। সামান্য মতভেদের জন্য এক শ্রেণীর সদাশয় লোক অপর শ্রেণীর সদাশয় সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যাক্তিদিগকে এত নিগ্রহ করিতেছে যে, লোকে দস্যুতস্করদিগকে সেরূপ নিগ্রহ করে না। কিন্তু ধর্ম্ম এ তিনটীর কোনটীতেই নাই। ধর্ম্ম সাধনের জন্য যে এ গুলির প্রয়োজনীয়তা নাই তাহা নহে। বীজের পক্ষে যেরূপ কোষ, ধর্ম্মের পক্ষে এ গুলিও সেইরূপ। কিন্তু ধর্ম্ম ইহার বাহিরেও ইহার উপরে। ধর্ম্ম কেবল দৃষ্টিতে; অধ্যাত্ম ও প্রেমদৃষ্টিতে এই জগৎকে দেখার নামই ধর্ম্ম। গীতাকার বলিয়াছেন :—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ"

অর্থাৎ—"এই সমুদায় পরিমিত বস্তু সেই নিত্য অবিনাশী আত্মার দেহস্বরূপ অর্থাৎ আচ্ছাদন স্বরূপ।"

যাঁহারা এই ভাবে জগৎকে দর্শন করেন তাঁহারাই ধার্ম্মিক। দেখা আর না দেখার উপরে সকলই নির্ভর করে। তুমি যদি বলিলে এ জগৎটা কেবল মাটী আর পাথর, তবে ইহা তোমার নিকট মাটী ও পাথরের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। তুমি যদি বলিলে জীবনটা কিছুই নহে কেবল প্রত্যেকের আত্ম-রক্ষার

প্রয়াসের ফল মাত্র, প্রত্যেকে আপনাকে বাঁচানই এখানকার প্রধান কর্ত্তব্য ; তবে এ জীবন তোমার নিকটে অতি হীন ও মলিন হইয়া গেল ; তুমি আর স্বার্থ-চিন্তার উপরে উঠিতে পারিলে না ; এই জীবন-মহাগীতির অন্তরালে এমন কাহারও গলা চিনিতে পারিলে না, যাহার কণ্ঠস্বর শ্রমের ভারকে লঘু করে, ও দুঃখকে সুখে পরিণত করে। এই জন্যই বলি যে চক্ষু পাইয়াছে সে সকলি পাইয়াছে। এ জগতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যেখানে জগতের লোক শূন্য দেখিয়াছে সেখানে তাঁহারা বলিয়াছেন "ঐ যে প্রেমময়ের প্রেম মুখ !" যখন স্থূলমতি মানব মনে করিয়াছে "এইবার আলোক নিবিয়া গেল" তখন তাঁহারা বলিয়াছেন "অপেক্ষা কর দশ দিক্ উজ্জ্বল হইবে।" জগতের ভাষা ও তাঁহাদের ভাষা সকলই বিভিন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের জীবন করুণাময়ের করুণার স্রোতে সুরক্ষিত ইহা জানিয়া তাঁহারা নিরুদ্বেগে এই জগতে বাস করিয়াছেন ও সত্যের অনুসরণ করিয়াছেন। জীবনের চাবি হাতে পাইয়া তাঁহারা জড় ও চেতনকে খুলিয়া দেখিয়াছেন এবং সকলের মধ্যেই প্রেমরসের আস্বাদন পাইয়াছেন।

যাঁহারা ভক্তির দৃষ্টিতে জগৎকে ও জীবনকে দেখিতে পারেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্। নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিরাই এই চক্ষু পাইয়া থাকেন। যেখানে প্রেম সেইখানেই চিত্তের নির্ম্মলতা, আবার যেখানে চিত্তের নির্ম্মলতা সেই খানেই

প্রেম জন্মিতে পারে। আগে ভাবিতাম প্রেম আবার কি, ভক্তি আবার কি, একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেই ত ভক্তি জন্মিবে। এখন বুঝিতেছি বৈষ্ণব সাধুগণ যে বলিয়াছেন, অনেক জন্মের তপস্যা না হইলে ভক্তি জন্মে না, তাহার ভিতরে অর্থ আছে। অর্থাৎ ভক্তি এতই দুষ্প্রাপ্য বস্তু যে অনেক জন্মের তপস্যাতেও কুলায় না। বৈষ্ণবগণ যে বলিয়াছেন "জগতের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" ইহারও অর্থ আছে। আগে মুক্তি পরে ভক্তি, ভক্তি মুক্ত আত্মাদিগের পক্ষেই সম্ভব। ঈশ্বর-প্রেম ত পরের কথা; মানুষ যখন অকপটচিত্তে ও নির্ম্মল মনে মানুষকে ভালবাসে তাহা দেখিলে বা স্মরণ করিলেও চিত্ত উন্নত হয়। প্রেম মানুষকে নির্ভয় করে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে আত্মা নিরুদ্বেগে বাস করে। সেই আত্মার বিশ্রামের স্থান, সেই আত্মার আরামের ভূমি, শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে, পক্ষি-শাবক যেমন মাতৃ-পক্ষের মধ্যে, তেমনি ভক্তের আত্মা ভক্তবৎসলের চরণছায়ায় বাস করে; এ জগতে থাকিয়া সে উদ্বিগ্ন থাকে না; কিন্তু সুখ দুঃখের ভার তাঁহার হাতে দিয়া প্রসন্নচিত্তে বাস করে।

———

ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থঃ—সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তিকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

এটী ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সুপরিচিত গায়ত্রী মন্ত্র। এদেশে এই গায়ত্রী মন্ত্রের এত গৌরব যে, গায়ত্রীকে বেদমাতা বলে। বেদমন্ত্রে গায়ত্রীচ্ছন্দের বড় আদর এবং ব্রাহ্মণ কোনও অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণে নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাবন্দনা করিতে অসমর্থ হইলে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিবেন এরূপ বিধি আছে।

গায়ত্রীর এত আদর কেন? ইহার সমুচিত কারণ আছে। এই সামান্য মন্ত্রটী ভারতের ধর্ম্মচিন্তার একটী মহা বিপ্লবকে প্রকাশ করিতেছে। আদিমকালে মানুষ ভাবিত, ইষ্টদেবতা বাহিরে; ইন্দ্র. অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বাহিরে; তাঁহাদের কার্য্য প্রকৃতি-রাজ্যে আবদ্ধ; অগ্নি আহুতি বহন করেন; ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন; ঊষা দিবালোককে আনয়ন করেন; ইত্যাদি। যতদিন ইষ্টদেবতা বাহিরে,—প্রকৃতি-রাজ্যে,—তত দিন প্রার্থনা ও প্রাকৃতিক ও লৌকিক বিষয় সকলকে অবলম্বন করিয়া

থাকে। হে ইন্দ্র ! বারি বর্ষণ কর ; হে অগ্নি! আহুতি বহন কর ; হে ইন্দ্র ! উৎকৃষ্ট ধন দেও, দুগ্ধবতী গাভী দেও. ইত্যাদি। ধর্ম্মের এই স্থূলভাবের মধ্যে যে দিন এই ভাব জন্মগ্রহণ করে যে, দেবশক্তি যে কেবল বাহিরে ও প্রকৃতিরাজ্যে কার্য্য করিতেছে তাহা নহে, সে শক্তি অন্তরে আত্মরাজ্যেও কার্য্য করিতেছে ; সেই শক্তিই আত্মাতে নিহিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছে, সে দিন কি মানবের ধর্ম্ম-চিন্তাতে একটা বিশেষ দিন নয় ? সে দিন অধ্যাত্মিক ধর্ম্মের জন্মগ্রহণ হয়। ঋষিগণ এই গায়ত্রী মন্ত্রে সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় দেখিয়াই ইহার এত আদর করিয়াছেন।

কিন্তু কথা এই, ঈশ্বর কি বাস্তবিক আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করেন ? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যে নিরন্তর নানাদিকে নানা বিষয়ে ও নানা কার্য্যে ধাবিত হইতেছে, সমুদায় কি তাঁহারই প্রেরণা ? অথবা তাঁহার প্রেরণার কোনও বিশেষ অর্থ আছে ? এক অর্থে তাঁহার প্রেরণা সর্ব্বত্র। কি জড়ে কি চেতনে সর্ব্বত্রই তিনি শক্তিরূপে উথলিত হইতেছেন। নবোদিত অরুণের কিরণমালার প্রত্যেক স্পন্দনে, প্রবাহিত বায়ুসাগরের প্রত্যেক হিল্লোলে, উদ্ভিদ ও জীবের জীবনের প্রত্যেক স্ফুরণে তিনিই উত্তলিত হইতেছেন ; আবার মানবাত্মার প্রত্যেক চিন্তাতে, প্রত্যেক ভাবে ও প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাতে তিনিই উথলিত হইতেছেন। এ অর্থে, এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার প্রেরণার অধীন নহে। অপর দিকে বিশেষ অবস্থাতে

বিশেষ ভাবে যে তিনি মানবাত্মাকে প্রেরণ করেন, মানবের ভিতর দিয়া তাঁহার বাণী প্রকাশ পায়, ইহাও সত্য। এরূপ বিশ্বাস আমরা জগতের আদিম কাল হইতেই দেখিতে পাই। জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এরূপ ঈশ্বরবাণীতে বিশ্বাস করিতেছে। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান এই তিন প্রধান সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া দিলেও এরূপ অগণ্য মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় আছে, যাহারা উক্ত প্রকার বিশ্বাসের উপরেই আপনাদের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, তাহারা বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের উক্তিকে ভগবদ্বাক্য বলিয়া জানিয়া তদনুসারে আপনাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করিতেছে।

এরূপ বিশ্বাস মানব-সমাজে কেন প্রবল হইল? মানুষ সচরাচর এবিষয়ে একটা মহা ভ্রমে পতিত হয়। মানুষ মনে করে অগ্রে অপৌরুষেয়তাতে বিশ্বাস, তৎপরে ঐ সকল উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি। কিন্তু তাহা নহে; প্রকৃত প্রণালী এই, অগ্রে ঐ সকল উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, তৎপরে তাহাদের অপৌরুষেয়তা-জ্ঞান।

প্রাচীনেরা মানবের জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, লৌকিক ও পারমার্থিক। যাহা দেশকালের সীমাধীন, তাহা লৌকিক; আর যাহা এই পাঞ্চভৌতিক জগতের অতীত ও দেশকালের সীমার বাহিরে তাহা পারমার্থিক। আমাদের এই মানবপ্রকৃতিরও দুইটা দিক আছে, লৌকিক ও পারমার্থিক। লৌকিক দিকে আমরা

দেশকালের অধীন, জগতের সহিত সম্বন্ধ ও জাগতিক বিষয়ের অন্বেষণে তৎপর; কিন্তু আমাদের একটা পারমার্থিক দিকও আছে; সে দিকে আমরা ইন্দ্রিয়াতীত ধর্ম্ম-নিয়মের বশবর্ত্তী। আমাদের প্রকৃতিতে এই পরমার্থিকতা আছে বলিয়াই আমাদের চিত্তে পরমার্থ-তত্ত্বের স্ফুরণ হয় এবং পরমার্থ তত্ত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রাতঃ সূর্য্যের অভ্যুদয় মানবেও দেখে গোমেষও দেখে, গোমেষ কখনই সেই চমৎকারসম্বলিত অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করে না, যাহা মানব করিয়া থাকে; কারণ এই যে, মানবের অন্তরেই সেই বাহিরের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ কিছু আছে। আমি পারমার্থিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলে তোমার মন যে বলে ঠিক্ ঠিক্, এই ঠিক্ ঠিকের দ্বারাই তোমাতে আমাতে যোগ! ঐ ঠিক্ ঠিকের দ্বারাই আমার আত্মা তোমার আত্মার সহিত কথা কয়! যে বলিল ঠিক্ ঠিক্, তাহার ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে, যাহা আমার উক্তিকে লুফিয়া লইল। ভাবিয়া দেখ, আমাতে ঈশ্বর আছেন, তোমাতেও ঈশ্বর আছেন, আমাতে ঈশ্বর কথা কহিলেন, তোমাতে ঈশ্বর লুফিয়া লইলেন। অর্থাৎ তোমার পারমার্থিকতা আমার পরমার্থিকতাকে চিনিয়া ফেলিল। জগতে মহাজনের উক্তি সকলকে যে মানুষ ঈশ্বরবাণী বলিয়াছে, তাহা চিনিয়া ফেলা মাত্র। জহুরীরা যেমন প্রস্তর রাশির মধ্যে দুই চারি খণ্ড হীরক থাকিলে চিনিয়া লয়, তেমনি মানবের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সাধুদের আধ্যাত্মিকতাকে

চিনিয়া ফেলিয়াছে। কোনও কেনও কথা শুনিয়া মানুষ অনুভব করিয়াছে এত সামান্য কথা নয়, ইহা সেই অপৌরুষেয় বাণী।

তিনি আমাদের আত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে নিহিত না থাকিলে ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। ধর্ম্ম তাঁহার স্বরূপ, ধর্ম্ম তাঁহার সত্তার প্রকাশ মাত্র। যেমন ঊর্দ্ধগামী ধুম কাষ্ঠস্থিত অগ্নিকেই প্রকাশ করে, তেমনি মানবের ঊর্দ্ধগামী আকাঙ্ক্ষা সেই হৃদয়-নিহিত পরাৎপর পুরুষকেই প্রকাশ করে। আকাঙ্ক্ষা আত্মার দীর্ঘ নিশ্বাস—"হায় আমি ভাল হইতে চাই।" যে বলিতেছে—"আমি ভাল হইতে চাই" সে বর্ত্তমানটাকে মন্দ বলিয়া দেখিয়াছে, তাহার বাহিরে গিয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়াছে, সে ব্যক্তির হৃদয়ে একটা আদর্শ জাগিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, এই আদর্শ সীমা-রহিত। মানুষ যখন ধর্ম্মকে চায়, তখন সেই অনন্তকেই চায়। কে কবে সত্যের বা প্রেমের বা সাধুতার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে ? এই জন্যই বলি এই সীমাবদ্ধ জীবের সঙ্গে অনন্ত আছেন বলিয়াই ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছে।

তিনি যখন মানবাত্মাতে ওতপ্রোতভাবে, এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে নিহিত রহিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে মানবাত্মাকে প্রেরণ করা ও মানবাত্মার পক্ষে তাঁহার প্রেরণা লাভ করাইত স্বাভাবিক। এই প্রেরণা দুই ভাবে প্রকাশ পায়—প্রথম ইহার প্রভাবে ভক্তের দিব্য চক্ষুর নিকটে পারমার্থিক সত্য উদ্ভাসিত

হয়, দ্বিতীয় ইহার প্রভাবে ভক্ত হৃদয়ে পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত উভয় লক্ষণই আমরা সাধু ও মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখিয়াছি। একটা কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জ্ঞান-সম্পত্তি বা ধন-সম্পত্তি কোনও সম্পত্তিই আমাদের সৃষ্ট নহে, সকলি প্রদত্ত। প্রথম ধন সম্পত্তির কথা বলি; আমরা জগতের বিষয় বাণিজ্যের অদ্ভুত বিস্তার দেখিতেছি। লণ্ডন সহরের ন্যায় একটী সহরের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হইতে হয়। শুনিয়াছি, লণ্ডনে প্রায় ৪।৫ লক্ষ ভবন আছে, একবার কল্পনাতে ধারণ কর, এ চারি পাঁচ লক্ষ ভবনে কত ধন সম্পত্তি আছে, কত প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে, ও কত কল কারখানা ও শ্রমজাত শিল্পাদি আছে। সভ্য জগতে এরূপ কত সহর রহিয়াছে, কত বাণিজ্য-পোত শ্রমজাত পদার্থ সকল বহন করিতেছে, জগতের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতেছে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে জগতের সভ্যতার ও সুখ সমৃদ্ধির কি একটা মহান্ চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়? কিন্তু ইহার এক অণুও কি মানব সৃষ্টি করিয়াছে? মানুষ পর্ব্বতের পাষাণ সহরে আনিয়াছে, খনির ধাতু উপরে তুলিয়াছে, বনের কাষ্ঠ বহন করিয়া ঘরে আনিয়াছে, পার্থিব পদার্থে নিজের শ্রম লাগাইয়া স্থানান্তরিত ও প্রকারান্তরিত করিয়াছে এইমাত্র, মূলে সকলিত ঈশ্বরের দেওয়া। জ্ঞান সম্পত্তির বিষয়েও ঐরূপ। জ্ঞানিদিগের মধ্যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যিনি তাঁহার ও জ্ঞানের একটী সূত্রও নাই

যাহা তাঁহার সৃষ্ট। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাঁহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই আত্ম-জ্ঞানকে প্রয়োগ করিয়া তিনি রূপান্তরিত করিয়া নিজের জ্ঞান-সম্পত্তি রচনা করিয়াছেন। তুমি যে প্রাতঃকালে চক্ষু খুলিলেই সুনীল আকাশ দেখিতে পাও, প্রকৃতির শোভা দেখিতে পাও, তাহাতে তোমার কি হাত আছে?—যিনি এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে সে জ্ঞান দিতেছেন।

সকল জ্ঞানই যখন তিনি দেন, তখন পারমার্থিক জ্ঞান ত বিশেষ ভাবে তাঁহারই প্রদত্ত সম্পত্তি, কারণ তাহা তাঁহার নিজ স্বরূপের প্রকাশ; তাহা তাঁহার মুখ-জ্যোতি। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই পারমার্থিক জ্ঞান সকলের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় না কেন? তবে জিজ্ঞাসা করি, সকলের দৃষ্টি প্রস্তর খণ্ড সকলের মধ্যে হীরক চেনে না কেন? হীরক চিনিতে যেমন বিশেষরূপে তীক্ষ্ণ ও একাগ্র দৃষ্টি চাই, তেমনি পারমার্থিক তত্ত্ব দেখিবার জন্য দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও একাগ্রতা চাই। এই দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও একাগ্রতাটা বড় সাধনের ফল। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন,

সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যক্
জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং।

অর্থ—এই পরমাত্মাকে সত্যের দ্বারা, চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক জ্ঞানের দ্বারা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা লাভ করা যায়।

তাঁহারা পরমার্থ স্ফুরণের চারিটী নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া-

ছেন ; প্রথম সত্য-প্রিয়তা অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে পরমার্থের স্ফূর্ত্তি চায়, তদীয় প্রকৃতিটী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সে কখনই সত্যকে অতিক্রম করিতে পারে না, সর্ব্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যেরই অনুধ্যান করে, সত্যেরই অনুসরণ করে। এটী বড় সহজ কথা নয়।

দ্বিতীয়—তাহার তপস্যা বা চিত্তের একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। যে সাধনা দ্বারা দেহ ও মন উভয়ের বিশুদ্ধি লাভ হয়, সেই তপস্যা—যে তপস্যা দ্বারা চিত্ত একাগ্রতা-সম্পন্ন হয়, সেই তপস্যা। এটীও বড় সহজ কথা নয়।

তৃতীয়—সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ জগৎতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান,—যে জ্ঞান বিনয়কে প্রসব করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগ্রত করে, সেই জ্ঞান। ইহাও সহজ নয়।

চতুর্থ—ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ রাখা। ইহাও সহজ কথা নয়।

পূর্ব্বোক্ত চারিটী নিয়মের বিষয় চিন্তা করিলেই অনুভব করা যাইবে যে, তোমার আমার চিত্তে যে পরমার্থের স্ফূর্ত্তি হয় না, তাহার কারণ আমরা তাহার উপযুক্ত নহি। মিথ্যাচারী, স্বৈরাচারী, অশন-বসন-লোলুপ, উদ্ধত, অবিনীত, অজ্ঞ, ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র লোকে যদি পরমার্থের স্ফূর্ত্তি লাভ করে—তবে আর অসম্ভব কিছুই থাকে না। ভাবিয়া দেখ, আমরা অনেকে ঐ প্রকৃতি-সম্পন্ন কি না?—বিষয়-সুখাভিলাষী, উদ্ধত, অবিনীত অজ্ঞ কি না? এরূপ মানুষ দিয়া যে সমাজ গঠিত

তাহাতে ধর্ম্মভাব কখনই জাগিতে পারে না; পরমার্থ স্ফূর্ত্তি হয় না।

ভগবৎপ্রেরণা লাভ করিতে হইলে, ভগবদিচ্ছার অনুগত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়; তপস্যার দ্বারা হৃদয় মনের একাগ্রতা লাভ করিতে হয়; তাহা আমাদের নাই বলিয়া হৃদয়ে ভগবৎপ্রেরণা আসে না।

তাঁহার প্রেরণা মানুষের হৃদয়ের বিশুদ্ধতার উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করে। একজনের যদি জগৎ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত থাকে, যদি সে কুসংস্কারাপন্ন হয়, তথাপি তাহার যদি ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, প্রাণে ব্যাকুলতা থাকে, চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তবে ঈশ্বর তাহার অন্তরে পরমার্থের স্ফূর্ত্তি করিয়া থাকেন। এমন মনে করিও না, আমাদের মত বিশুদ্ধ, আমরা কুসংস্কারী নহি, আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিয়াছি, পরমার্থ স্ফূর্ত্তি আমাদেরই হইবে। তোমরা মনে মনে বেড়া দিয়া বসিলে কি হইবে, ঈশ্বর কখনও কোনও বেড়া স্বীকার করেন নাই; তিনি মুক্ত হস্তে ব্যাকুলাত্মাদিগকে সত্যান্ন বিতরণ করিয়াছেন। ধনীরা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফুলের গাছ বসায়, ভাবে ইহা আমাদের গাছ, ইহার সুগন্ধ ভার আমরাই সেবন করিব, বায়ু আসিয়া সেই সুগন্ধ ভার হরণ করিয়া পথে যে দরিদ্র যাইতেছে তাহাকে বলে,—"নে, নে, নিয়ে যা, ইহা তোদের সকলেরই জন্য।" তেমনি অজ্ঞ, অধম, ও সংকীর্ণচেতা মানুষ ব্রহ্মকৃপা ও মুক্তিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া দিয়া এক-

চেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়, ঈশ্বর, পথের লোককে ডাকিয়া বলেন, "নে নে নিয়ে যা মুক্তি তোদের সকলেরই জন্য।" তুমি মনে মনে মস্ত ধার্ম্মিক হইয়া বসিলে কি হইবে, এ জগতে যে চায় সেই পায়। তোমার ধার্ম্মিকতার অভিমান বলিতেছে যে, তুমি চাও না। সাধুরা যখন ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন একটী বেড়াবদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করেন নাই, তাঁহারা মনে করিয়াছেন, সমুদায় জগত তাঁহাদের শ্রোতা ; যে চায় সেই পাইবে। আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই ভাবকে অতিরিক্ত মাত্রায় লইয়া গিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মের জন্য উন্মুখ নয়, তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইতে চাহিতেন না। আমি বসিয়া রহিলাম, তোমার ধর্ম্মতত্ত্বের প্রয়োজন হয়, আমার নিকট এস, প্রয়োজন না থাকে যে বিষয়-সুখ চাহিতেছে, তাহা ভোগ কর। দুই প্রকার বণিক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দোকানদার আর এক ফিরিওয়ালা। বস্ত্রের দোকানদার বস্ত্র লইয়া নিজ দোকানে বসিয়া আছে ; তোমার বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে সেখানে যাইবে ; বস্ত্র না চাহিয়া যদি তণ্ডুল চাও, তবে সেখানে যাইবে না ; তেমনি ঐ দেশের সাধুরা ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন, তোমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রয়োজন থাকে সেখানে যাইবে আর বিষয়-সুখের প্রয়োজন থাকে ত সেখানে যাইবে না। ফিরিওয়ালার ন্যায় চাও না চাও কাণের কাছে 'মুক্তি চাই'—'মুক্তি চাই'—বলিয়া বেড়াইতেন না। ইহাকে অতিরিক্ত মাত্রা এই জন্য বলিয়াছি যে মানবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্মুখ

করিবারও প্রয়োজন আছে। পাপীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সাধুরা তাহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ফল কথা এই, এ জগতে যে চায় সেই পায়।

ধর্ম্মসাধন দুই প্রকারে হয়, এক মানুষ ধর্ম্মকে গড়ে দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম মানুষকে গড়ে। ধর্ম্ম যখন মানুষকে গড়ে, তখন তাহাকে একেবারে গ্রাস করে, তাহাকে গালিয়া ঢালিয়া নূতন করিয়া লয়। ভগবৎ-প্রেরণার অধীন হইলে মানুষের এই দশা হয়। এই আমি ঐ ধর্ম্ম, আমি ধর্ম্ম করিতেছি, এরূপ নিজ হইতে ধর্ম্মের পার্থক্য জ্ঞানটা উজ্জ্বল থাকা ভাল নয়; উহা সাধনলব্ধ রাজসিক ধর্ম্মের লক্ষণ, উহাতে অহমিকা জন্মিতে পারে। আর যেখানে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে ধার্ম্মিক হয়, স্বভাব ধর্ম্ম হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, ঈশ্বর-গ্রস্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে চলে, সেটা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। উহা প্রেমের ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্মার্থে আমি ইহা ছাড়িয়াছি, উহা করিয়াছি, আপনাকে সংযত রাখিয়াছি, এরূপ টনটনে জ্ঞান থাকিলে সাধনাভিমানের উৎপত্তি হয়। রূপসীর রূপের অভিমান অপেক্ষা সাধকের সাধনাভিমান দেখিতে অধিক কদর্য্য ও মুক্তিপথের কণ্টক। প্রেমের স্বভাব এই, ইহা নিজের যোগ্যতা খুঁজিয়া পায় না।

ভগবৎপ্রেরণা প্রেমিক হৃদয়েই অবতীর্ণ হয়। তাহা প্রেমিকের হৃদয় মনকে গ্রাস করে, চিন্তাকে আপ্লুত করে, ধর্ম্মভাবকে স্বাভাবিক ভাবে উৎসারিত করে। বাস্তবিক ইহা সেই প্রেমনদীকে প্রবাহিত রাখে, যাহার তীরে জীবনতরু সহজে

বাড়িতে থাকে। যে কার্য্য অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা প্রেরণাধীন ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য হয়। বৈরাগ্য, সংযম, সেবা সকলি তাহার পক্ষে সুখসাধ্য হইয়া যায়। জগতের সাধুগণের জীবনে আমরা ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাপ্ত হই। ঈশ্বর করুন, আমরা সেই নির্ম্মল-চিত্ততা ও সেই ব্যাকুলতা লাভ করি, যাহাতে হৃদয় তাঁহার প্রেরণার অধীন হয়।

দেব-প্রসাদ ও আত্ম-প্রভাব

সুক্ষেত্রে সুসময়ে বীজ বপন করিলেই যথাসময়ে তাহা অঙ্কুরিত হয় এবং একটী সুন্দর সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়; আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। বৃক্ষটী কিরূপে বাড়ে? সকলেই জানেন বৃক্ষের বাড়িবার উপাদান দুই প্রকার। প্রথমতঃ, বৃক্ষ পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়তঃ আকাশ হইতে বায়ু ও উত্তাপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ নীচু হইতে কিছু আসে এবং উপর হইতে কিছু পায়। সেইরূপ মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতিও শক্তিদ্বয়ের সমবেত কার্য্যের ফল। মানুষও নীচু হইতে কিছু দেয় ও উপর হইতে কিছু পায়। নীচে আত্মপ্রভাব ও ঊর্দ্ধে দেব-প্রসাদ। নীচে মানুষের নিজের সংগ্রাম ও প্রার্থনা, ঊর্দ্ধে ভগবানের কৃপা ও সাহায্য। এই আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদের সমাবেশ কিরূপে হয়, কতটুকু মানবের চেষ্টা ও কতটুকু ঈশ্বরের কৃপা, একতার মধ্যে দ্বিত্ব কিরূপে প্রচ্ছন্ন থাকে? ইহা অধ্যাত্মতত্ত্বের একটী গূঢ় ও গভীর রহস্য!

দেবপ্রসাদ ও আত্ম-প্রভাব এই দুইটী ভাব বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নভাবে ফুটিয়াছে। সচরাচর ভক্তি-

পথাবলম্বী মাত্রেই দেব-প্রসাদের উপরে কিছু অধিক ঝোঁক দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় লইয়া গিয়াছেন। মানুষকে অতি হীন ও অসমর্থ জানিয়া ইহারা ভগবৎ-কৃপাকেই সার বলিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে য়িহুদী ধর্ম্ম ও তৎশাখা স্বরূপ খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রধান উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহারা দেবপ্রসাদকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমাদের রুচিকর নহে। ইঁহদের মতে দেব-প্রসাদের অর্থ মানুষকে পাপের সমুচিত শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া। পৃথিবীর রাজারা অথবা ক্ষমতাশালী পুরুষেরা যেমন মানুষের প্রতি কুপিত হন, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, বা তুষ্টি সাধনার্থ কিছু করিলে, প্রসন্ন হইয়া সমুচিত শাস্তি হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন, জগৎ-পতিও সেইরূপ কাতরোক্তি-জনিত ও বাধ্যতা-জনিত করুণার বশবর্ত্তী হইয়া পাপীকে নরকবাস হইতে নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা ঈশ্বরে ক্ষুদ্র মানবীয় রাজার ভাব আরোপ করিয়া, তাঁহাকে অব্যবস্থিত-চিত্ত ও যথেচ্ছাচারী করিয়াছেন। বোধ হয় জগতের আদিম সমাজ সকলের মানবদিগের পক্ষে এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক ছিল। মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের ধারণা করিতে গেলেই তাঁহাদের দৃষ্টি দেশের রাজাদিগের উপর পড়িত এবং তাঁহারা রাজাদিগকে যেরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত ও স্বেচ্ছাপরতন্ত্র দেখিতেন, ঈশ্বরকেও সেইরূপ কল্পনা করিতেন। আমাদের দেশেও কবিগণ স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবদেবী কল্পনা

করিবার সময়, তাঁহাদিগকে দেশের রাজাদিগের ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত ও যথেচ্ছাচারী করিয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলার রোষ বা পরিতোষ কখন কি হয় তাহার যেমন স্থিরতা ছিল না, তেমনি ইঁহাদের দেবদেবীদিগেরও রোষ বা পরিতোষের কারণ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। সর্ব্বদাই লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরু পাপে লঘুদণ্ড দেখা যাইতেছে। যে কোনও প্রকারে সন্তোষ সাধন করিতে পারে, সেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়।

য়িহুদী ধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম তিন ধর্ম্মই বলেন, ঈশ্বরের অবাধ্যতার ফল পাপ, পাপের ফল নরকবাস, ইহা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য ও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের দ্বারা দৃঢ়-রূপে আবদ্ধ। কেবল একমাত্র পরম কারুণিক পরমেশ্বরই এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল ভেদ করিতে পারেন, পাপীকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন ; সেইটীই তাঁর দয়া ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইঁহাদের মতে পাপীর পরিত্রাণ ও সূর্য্যের গতিরোধ করার ন্যায় ; পাঁচখানি রুটি ও পাঁচটী মৎস্য দ্বারা পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানের ন্যায়, একটা অতি-নৈসর্গিক ব্যাপার, ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কার্য্য। এই সকল সম্প্রদায় যেমন একদিকে ভগবৎ-কৃপার এই প্রকার ভাব গ্রহণ করেন, অপর দিকে বলিয়া থাকেন, আত্ম-প্রভাব বলিয়া একটা কিছু নাই। মানুষ জন্মতঃই পাপী, মানুষের উদ্যম, চেষ্টা, প্রার্থনা কিছুই নহে, তদ্দ্বারা কিছুই সাধিত হইতে পারে না ; ভগবৎ-

কৃপা তাহার উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ না হইলে, তাহার সকল উদ্যমই বৃথা।

আমাদের দেশের ভক্তিপথাবলম্বিগণের কথা ইহা অপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত; তাহার উল্লেখ পরে করিতেছি। সম্প্রতি আর এক প্রকার ধর্ম্মমতের সমালোচনা করি। এই মতাবলম্বিগণ আত্ম-প্রভাবের উপরে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন বীজ হইতে বৃক্ষটী উৎপন্ন হওয়া যেমন স্বাভাবিক, মানুষের শুভ বা অশুভ কর্ম্ম হইতে সুখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হওয়া তেমনিই স্বাভাবিক। মানব এমন কিছুই ভোগ করে না, যাহা তাহার নিজ কর্ম্মজনিত নহে। হয় এ জীবনের কর্ম্ম না হয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম। বিষ্ণু পুরাণের ধ্রুবোপাখ্যানে দেখা যায় যে ধ্রুব যখন বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় জননীর নিকট আসিয়া কাঁদিতেছেন, তখন মাতা তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বলিতেছেন—

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি ত্বয়াযৎ কৃতমেবহি।
তৎকোপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতংত্বয়া॥

অর্থ—সুকৃত বা দুষ্কৃত হউক তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপহরণ করিতে পারে, এবং তুমি যাহা কর নাই, তাহা কে তোমাকে দিতে পারে।

এরূপ উপদেশ আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। মানুষ যাহা করে নাই তাহা কেহই দিতে পারে না, ঈশ্বরও দিতে পারেন না; এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল

ঈশ্বরও ভেদ করিতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বরসন্নিধানে প্রার্থনাদি করা বৃথা। শান্তিশতক নামক সংস্কৃত গ্রন্থে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধে স্তেপিবশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তং কর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি॥

অর্থ—"দেবতাদিগকে নমাস্কর করি, অথবা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া ফল কি? তাঁহারা ত পোড়া বিধির বশবর্ত্তী; অতএব বিধিকেই প্রণাম করি; তাহাতেই বা ফল কি? তিনি ত কর্ম্মানুসারেই ফল দিয়া থাকেন। ফল কর্ম্মের অধীন, অতএব দেবতাদিগকে বা বিধিকে প্রণাম করিয়া ফল কি? অতএব কর্ম্ম সকলকেই প্রণাম করি, যাহাদের উপরে বিধাতারও হাত নাই।"

সকলেই জানেন মহাত্মা বুদ্ধ এদেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও প্রধান ভাব এই ছিল। অনেকে মনে করেন, যে, তিনি নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার মূল ভাব এই ছিল, যদি ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাঁহার সহিত মানবের মুক্তির কোনও সম্বন্ধ নাই; মুক্তি মানবের আয়ত্তাধীন ও স্বীয়-চেষ্টা-সাধ্য। কর্ম্মানুসারে মানুষের বন্ধন এবং কর্ম্ম দ্বারাই মানুষের মুক্তি। যদি নিমের বীজ বপন করিয়া আম গাছ কেন হইল না বলিয়া কেহ দুঃখ করে এবং হে

ঈশ্বর এই গাছে আম ফলুক, বলিয়া প্রার্থনা করে, তাহার প্রার্থনা যেমন বাতুলতামাত্র, তেমনি পাপের বীজ বপন করিয়া কেহ যদি তাহার ফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য প্রার্থনা করে, তাহাও বাতুলতামাত্র। বুদ্ধ বলেন, ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা না করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপের বীজ উৎপাটন কর, ও সদনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যের বীজ বপন কর। এ মতে মানবের মোক্ষ সর্ব্বতোভাবে মানবের আত্ম-প্রভাব-সম্ভূত। যেমন উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু হইতে দূরে—এই পথ সেইরূপ ভক্তিপথ হইতে দূরে।

এই মেরুদ্বয়ের মধ্যে কিরূপে গন্তব্য পথ নির্ণয় করা যায়? একজন বলিতেছেন, মানুষ কিছুই নহে, ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন মানবের পরিত্রাণ নাই; অপর জন বলিতেছেন, মানুষই শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-কৃপা কিছুই করিতে পারে না। এই বিভিন্ন উক্তি দ্বয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে করা যায়? এই স্থলেই এদেশীয় ভক্তি-পথাবলম্বিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, এই উভয় উক্তির মধ্যেই সত্য আছে। অর্থাৎ মানুষ কিছুই নহে, ভগবৎ-কৃপাই সার—ইহা সত্য, অথচ মানবের মুক্তি মানবের সাধন-সাপেক্ষ ইহাও সত্য। এই উভয়ের সমাধা কিরূপে হয়? একজন বিদেশীয় ভাবুকের প্রদর্শিত একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার ভাব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, এক দিন দেখিলাম একটি পক্ষী তান ধরিয়া আকাশে উঠিল। সে সময়ে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল।

অবোধ বিহঙ্গ স্বীয় বলদর্পে প্রথমে মনে করিল যে, বায়ু-স্রোতকে বাধা দিয়া বিপরীত দিকে গমন করিবে। কিন্তু কিয়দ্দূরে যাইতে না যাইতে, তাহার পক্ষদ্বয় ভারিয়া আসিল, সে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল, পড়িয়া শ্বসিতে লাগিল, শ্বসিয়া শ্বসিয়া পুনরায় আকাশমার্গে উত্থিত হইল। এবারে সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে, সুতরাং আর বায়ুর প্রতিকূলে গেল না, বায়ু স্রোতে দেহ ভাসাইয়া বায়ুর সহিত উড়িতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে চক্ষের অগোচর হইয়া গেল। আমি দেখি, এ জগতে মানবের উন্নতি এই প্রকারে হয়। অনন্ত বায়ু স্রোত যেরূপ সর্ব্বদা প্রবাহিত, সেইরূপ ভাগবতী শক্তি দ্যুলোক ভূলোকে, জড়ে চেতনে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। তিনিই মানবহৃদয়ে থাকিয়া ধর্ম্মকে উৎপন্ন করিতেছেন, সেতু স্বরূপ হইয়া মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছেন। তিনি যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গ্রহগণকে সূর্য্যের সহিত, পরমাণুকে পরমাণুর সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছেন, তেমনি ধর্ম্ম নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া জনসমাজকে নিজের সহিত, মানুষকে মানুষের সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছেন এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিতেছেন। বায়ু-স্রোতের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছাস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। আত্মশক্তি-প্রয়োগ করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়, সেই স্রোত তোমাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবে। সাধনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সম্মিলিত হওয়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্য অমিলন দূর করা,

তপস্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরেচ্ছাকে নিজহৃদয়ে প্রবল হইতে দেওয়া; অতএব উভয়েরই কার্য্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।

এক অর্থে ইহা অতীব সত্য যে মানুষ কিছুই নহে—ভগবৎ কৃপাই সার। কারণ একবার ভাবিয়া দেখ, মানুষ কি মূল্য দিয়া ভগবৎকৃপা ক্রয় করিতে পারে? যদি সে দ্রব্য মূল্য দিয়া কিনিবার হইত, মানুষ কি তাহা পারিত? মানুষের এমন কি আছে? অজ্ঞ, দুর্ব্বল, অন্ধপ্রায় মানুষ তার এমন কি আছে, অনন্ত প্রেমকে আবর্জ্জিত করিতে পারে. এ কথা কি সত্য নহে যে, জননী যেমন শিশুর গুণে শিশুকে ভাল বাসেন না, কিন্তু নিজ প্রকৃতির অনুরোধে, তেমনি আমরা যে তাঁহার কৃপা পাই, তাহা আমাদের গুণে নহে, কিন্তু তাঁহার প্রেমময় স্বরূপের গুণে। এই কারণে ভক্তেরা তাঁহাকে অকারণ-কারুণিক বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ইচ্ছার সহায়তা ভিন্ন আমরা কিছুই নহি। যতক্ষণ তাঁহার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার অনুকূল, ততক্ষণ আমরা কৃতী, আর যখন আমাদের ইচ্ছা তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইতে চায় তখনি আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হই। অতএব, এ কথা কি সত্য নহে যে ভগবৎকৃপাই সার এবং আমরা কিছুই নহি।

তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দিকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই প্রেরণার বশবর্ত্তী হওয়াই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। কিরূপে এই প্রেরণার বশবর্ত্তী হওয়া যায়? এইখানেই আমাদের সাধনের প্রয়োজন। আমাদের স্বরূপকে

বিকশিত করিয়া, যতই তাঁহার স্বরূপের অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই তাঁহাকে গ্রহণ করি ও তাঁহার প্রেরণার বশবর্ত্তী হই। কি প্রকারে আমরা আমাদের প্রকৃতিকে উন্নত করিতে পারি। প্রথম, জগৎতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা; দ্বিতীয় আত্মার স্বরূপ বিশুদ্ধ ও একাগ্র করা; তৃতীয় স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা আপনাকে তাঁহার আদেশের অনুগত করা; চতুর্থ সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রীর দ্বারা চালিত হইয়া সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধন করা। এই সকল সাধনা-পথে আমরা যত অগ্রসর হই, ততই তাঁহাকে জানিবার ও লাভ করিবার উপযুক্ত হই।

প্রকৃত ভক্তিপথাবলম্বীরা বলেন, একদিকে দেব-প্রসাদ অপরদিকে আত্ম-প্রভাব, একটী অপরটীর বিরোধী এরূপ নহে, কিন্তু একটী অপরটীর সহকারী মানবের মুক্তি-সাধনে উভয়ে মিলিয়া কার্য্য করে। যে ভাবে ঋষিরা বলিয়াছেন "সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" সাধক ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া কামনার বিষয় সকল ভোগ করেন, ইহার মধ্যে সেই ভাব। মানব স্বীয় মুক্তি সাধনে ঈশ্বরের সহচর অনুচর মাত্র। তিনি মানবাত্মাকে স্বতন্ত্রতা দিয়া মানবের জন্য এই বিধি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ত মানবকে মুক্তির দিকে প্রেরণ করিতেছেন, মানবেরও কিছু করা চাই, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হওয়া চাই। তিনি মানবকে নিজের সহকারী করিয়া লইতে চান, অথবা নিজে মানবের সহকারী ও সুহৃৎ হইতে চান, এই তাঁর বিচিত্র লীলা। তিনি মানবকে যেন সর্ব্বদা বলিতেছেন, আমর যাহা করিবার তাহা

করিতেছি, তোমার যাহা করিবার আছে কর, তুমি অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও সংগ্রাম কর, তুমি জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্য-সাধনে দৃঢ়তা লাভ কর, ও সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধনকরিবার চেষ্টা কর, আমি তোমার সঙ্গেই আছি। যে পরিমাণে আত্ম-প্রভাব সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা। যে পরিমাণে বৃক্ষ পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে সেই পরিমাণে বায়ু ও উত্তাপকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়। প্রার্থনার অর্থ যদি এই হয়, নিজের শ্রমের ভার ঈশ্বরকে দেওয়া, বিনা আয়াসে সপ্তমসর্গে যাওয়া, তবে সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না; আর প্রার্থনার অর্থ যদি এই হয়, নিজের প্রকৃতিকে তাঁহার ইচ্ছাধীন করা, তবে তাহা পূর্ণ হয়। প্রার্থনারও ত একটা দায়িত্ব আছে। হে মানুষ, তুমি যখন ঈশ্বরকে বলিতেছ "হে ঈশ্বর, আমাকে এই পঙ্কময় হ্রদ হইতে উদ্ধার কর" তখন তুমিও কি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিবে না, নিজে সন্তরণ করিয়া কূলের দিকে যতটুকু অগ্রসর হইতে পার, তাহা করিবে না? আদুরে ছেলে যেমন চৌকি-খানির উপরে বসিয়া কাঁদে, মা আমাকে নামাইয়া দেও নিজে পা খানি বাড়ায় না, তুমিও কি তাহাই করিবে? এরূপ অলসের প্রার্থনা ঈশ্বর কখনও পূর্ণ করেন না। মহাত্মা বুদ্ধ যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিদ্রুমের তলে বসিয়াছিলেন, এই আমি বসিলাম, আলোক না পাইলে উঠিব না; আমার অঙ্গের সন্ধি সকল শিথিল হউক; মাংসপেশী সকল শীর্ণ হউক; আমার দেহকে কীটে ক্ষত বিক্ষত করুক; আমাকে আলোক পাইতেই

হইবে।” এরূপ প্রতিজ্ঞার মহাফল আছে। মানুষ যখন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, তখন ভগবান সাধু সাধু বলিয়া ত্বরিত তাহার সাহায্যের জন্য ধাবিত হন। তোমার আমার মনে এতটা প্রতিজ্ঞার বল আসে না এই জন্য তুমি আমি বুদ্ধ নহি। একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বল দেখি, আর পাপে থাকিব না, যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্, এই আমি উঠিলাম, ঈশ্বর ত্বরিত আসিয়া তোমার হৃদয়ে ভর করিবেন; কেঙ্গারু যেমন শাবককে নিজ কুক্ষি মধ্যে পূরিয়া বিপদ হইতে পলায়ন করে, তেমনি তিনি তোমাকে নিজ কুক্ষির মধ্যে পুরিয়া বাঁচাইবেন। পাপি! তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আনন্দজনক সমাচার কি হইতে পারে? তুমি উত্থিত হও, তুমি প্রতিজ্ঞার বর্ম্ম পরিধান কর, তুমি ক্ষুদ্র শক্তির ক্ষুদ্র তরবারিখানি ধারণ কর, দেখিবে তাঁহার সুদর্শনচক্র তোমার পশ্চাতেই আছে। হে কাপুরুষ, তুমি পাপ ভয়ে ভীত হইও না; রণবাদ্য বাজিবার অগ্রেই কাঁপিও না; আদুরে ছেলের ন্যায় আত্ম-শক্তি প্রয়োগে বিমুখ থাকিও না; জানিও জানিও জানিও, এ রণক্ষেত্রে তুমি একাকী নও, আর একজন আছেন, যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে গগন-বিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় কক্ষকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তিনিই আছেন। হায়! হায়! আমরা কেন এত অধম, কেন এত অবিশ্বাসী, কেন সেই জীবন্ত শক্তির ক্রোড়ে আপনাকে দিয়া শক্তিশালী হই না? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? ধিক্ ধিক্ এই ক্ষুদ্র বিষয়াসক্ত হৃদয়কে শত ধিক্।

মুমুক্ষুত্ব।

এজগতে তুমি কোন্ স্থান অধিকার করিবে, তুমি কি লৌকিক বিষয়ের মধ্যে, ক্ষুদ্র কামনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া হীন হইয়া থাকিবে কিম্বা মহৎ বিষয়ের অনুধ্যান ও অনুশীলনের দ্বারা হৃদয় মনকে মহৎ করিবে, তাহার অনেকটা এজীবনটাকে তুমি কি ভাবে দেখ তাহার উপরে নির্ভর করে। কি হইলাম, এ প্রশ্নের দ্বারা আপনার জীবনকে বিচার না করিয়া, কি পাই-লাম এই প্রশ্নের দ্বারা যদি বিচার কর, তাহা হইলে লৌকিক লাভালাভের উপরেই তোমার দৃষ্টি প্রবলরূপে পড়িবে। তখন আর ভাবিবে না যে ঈশ্বরের এই জগতে আমি যে একজন মানুষ আসিলাম, আমি যে একজন্ নানা-শক্তিসম্পন্ন জীব এত দিন এখানে বাস করিলাম, আমি কি হইয়া দাঁড়াইলাম, কি শিখিলাম, কি করিলাম, জগতকে কি দিলাম, ঈশ্বরেচ্ছা কতদূর সম্পন্ন করিলাম, কি ভাবিবে এ রাজ্যে কতটা স্থান অধিকার করিলাম, ক'খানা বাড়ী করিলাম, কত হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, কত শত ভরি সোণার গহনা, কত টাকার জমিদারী, বা কত আয়ের ব্যবসায় করিলাম। এজগতে কে কত পায় তাহা দিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিও না; কিন্তু কে কি হয় তাহা দিয়াই বিচার কর। অধিক আহার করা যাহার অভ্যাস

তাহার উদর বৃহদায়তন হয় ;—তৎপরে সকল দিন তাহার অধিক আহার না যুটিতে পারে, সকল দিন এরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য না পাইতেও পারে, কিন্তু উদরের স্ফীতিটা থাকিয়া যায় ; সেইরূপ জগতে তুমি যাহা দেখ, যাহা কর, যাহা উপার্জ্জন কর, যাহা হইবার চেষ্টা কর, সেই প্রয়াসে, সেই সংগ্রামে তোমার চরিত্রটা বৃহদায়তন হয়, তাহাতে বিশালতা, গভীরতা, সারবত্তা আসে ; সেই টুকুই থাকিয়া যায়. সেই টুকু তোমার, সেই টুকু মরণের পরেও থাকে। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন "ধর্ম্ম স্তমনুগচ্ছতি" ধর্ম্ম পরকালে মনুষ্যের অনুগামী হয় !

ধর্ম্ম চরিত্রের ও অন্তরালে থাকেন। পুর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, ঈশ্বর যে মানব-হৃদয়ে বাস করিতেছেন তাহার প্রকাশই ধর্ম্ম। হৃদয়বাসী ঈশ্বর, সত্য ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতারূপে যখন চিন্তাতে, ভাবে, আকাঙ্ক্ষাতে ও কার্য্যে উথলিত হইতে থাকেন তখন তাহাই ধর্ম্ম। আমরা বালক কালে ক্রীড়ার সঙ্গিগণের সহিত কৌতুক করিবার নিমিত্ত এক-গাছের ফুল আনিয়া বাড়ীর গাছে কৌশলে বসাইয়া দিতাম,—দিয়া বলিতাম "দেখ্ দেখ্ আমাদের গাছে কেমন ফুল ফুটেছে" কিন্তু সে ফুলের শোভা অধিকক্ষণ থাকিত না ; অল্পক্ষণ পরেই তাহা বিবর্ণ হইত ; দল ঝরিয়া যাইত ; পুষ্পহীন বৃক্ষ পুষ্পহীনই থাকিত। সেইরূপ তোমার নিকট ধার করা সদ্গুণে আমার ধর্ম্ম হয় না ; বাহিরের শাসনে আরোপিত সাধুতাতে ধর্ম্ম হয় না ; বৃক্ষের রসের ন্যায় যে সাধুতা জীবনের উৎস হইতে উৎ-

সারিত হইয়া জীবনতরুকে সতেজ করে, এবং ফুল ফল প্রসব করে, তাহাই ধর্ম্ম। একটী স্ত্রীলোক কূয়া হইতে জল তুলিতেছিল, যীশু তাহাকে বলিলেন—"তুমি কূয়া হইতে বৃথা কি জল তুলিতেছ, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি এমন জল দেখাইয়া দিব যে তাহা পান করিলে আর তৃষ্ণা হয় না" ; ইহাও সেই জীবন্তধর্ম্মের উৎসের কথা।

তুমি আমি কি ইহা চাই না যে আমাদের প্রাণে এমন একটা উৎস খুলুক যাহা হইতে তাজা তাজা ধর্ম্ম সর্ব্বদা উৎসারিত হইবে ? ধর্ম্মের একটা উৎস না পাইলে কেবল সাধনার দ্বারা ধর্ম্ম পাওয়া দুঃসাধ্য। কোন কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্ম-সাধনের এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম সকল স্থাপন করিয়াছেন, যাহা সমুচিতরূপে পালন করিতে গেলে সাধকের চিত্ত শ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। মানব-হৃদয়কে তিক্ত করা ধর্ম্মের কাজ নয়, মিষ্ট ও সুখী করাই ধর্ম্মের কাজ। হৃদয়ে একটা ধর্ম্মের উৎস খুলিলে সেটা হইতে পারে।

আর হৃদয়ে যদি একটা উৎস থাকে তুমি যেখানে যাও তোমার সঙ্গেই ধর্ম্ম আছে. মানুষ এজগতে যে ভাল থাকে, অনেক সময়ে তাহার বার আনা হাওয়ার গুণে। কেবল ব্যাধি যে সংক্রামক তাহা নহে হৃদয়ের ভাবও সংক্রামক, সাধুতাও সংক্রামক। আজ তুমি ব্রাহ্ম আছ, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে উৎসাহী আছ, তাহার কারণ হয়ত এই যে, তুমি সেরূপ লোকের সংসর্গে আছ, সেরূপ হাওয়াতে আছ, সেরূপ উৎসাহ-

জনক বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে আছ। কোন কোন মানুষের প্রকৃতি কাচের ন্যায়; অপরের ভাব ও কার্য্য সহজে সে সকল প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়; ইহাদের জীবনের অধিকাংশ কার্য্য অনেক সময় রঙ্গভূমির নটদিগের কার্য্যের ন্যায় অপরের ভাবকেই প্রকাশ করে; তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এই সকল মানুষকে একাকী কর, বা অপর ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে নিক্ষেপ কর, দেখিবে পূর্ব্ব ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক সময়ের উৎসাহী ব্রাহ্ম, এক সময়ের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক, হয় ত প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। আমার বিশ্বাস জীবন্তধর্ম্মের উৎস না পাইয়াই সকল সম্প্রদায়ের অনেক লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছে। এ সকল মানুষ কোনও দিকেই টেঁকে না; বিষয়াসক্তির সহিত সংগ্রামে টেঁকে না; প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে টেঁকে না; বিরুদ্ধ ভাবের স্রোতে পড়িলেও টেঁকে না। এসকল মানুষ অপরের ধর্ম্মজীবনের সহায়তাও করিতে পারে না। এদেশে একটী প্রাচীন প্রবাদ বাক্য চলিত আছে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি", যে নিজে সিদ্ধি লাভ করে নাই সে অপরকে কি প্রকারে সিদ্ধি দিতে পারে? তুমি নিজে অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছ, সাঁতরাইতেছ, কি ধরি, কি ধরি করিয়া আপনাকে সামলাইবার জন্য আকুল হইতেছ, তুমি অপরকে ধরিয়া কিরূপে তুলিবে? যদি তোমার দুখানা পা রাখিবার মত একটু জমি পাও তবেই বলিবে—"আমি অগাধ জলের মধ্যে দুখানা পা রাখিবার মত

একটু জমি পাইয়াছি ? "ধন্যোস্মি কৃতকৃতোস্মি" আমি ধন্য হইয়াছি, আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি"। যখন মানুষ সংসারস্রোতে দাঁড়াইবার এমন একটু জমি পায় তখনি তার প্রাণে জীবন্ত-ধর্ম্মের উৎস খোলে।

মহাপুরুষদিগের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে তাঁহারা জীবনের একটা ভূমি পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে জীবন্ত ধর্ম্মভাবের উৎস খুলিয়াছিল। বুদ্ধ যৌবনের প্রারম্ভে কি আলোক দেখিলেন যাহা বার্দ্ধক্যে, মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত, তাঁহার হৃদয়ে বাস করিল ! মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও সেই কথা মুখে লইয়া মরিলেন ! মহম্মদ চল্লিশ বৎসর বয়সে যে কথা ধরিলেন, বার্দ্ধক্যে মৃত্যু দিনেও তাহা মুখে লইয়া পৃথিবী হইতে অপস্থত হইলেন। তাঁহারা কিছু দেখিয়াছিলেন, কিছু পাইয়াছিলেন, কিছুর উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহাদের জীবন জল-পার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদা সতেজ ও ফলপ্রদ ছিল। আমাদিগকেও জীবন্ত ধর্ম্মের উৎস অন্বেষণ করিতে হইবে।

জীবন্ত ধর্ম্মের উৎস যে কোথায় তাহা ত এক কথাতেই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু কাজে লাভ করাই দুষ্কর। জীবন্ত ধর্ম্মের উৎস স্বয়ং ভগবান। তিনি যদি তোমাতে আমাতে ভাল করিয়া উৎসারিত হইতে পান, তাহা হইলেই তুমি আমি তাজা ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি। যদি বল তিনি ত সকল হৃদয়েই আছেন, তিনি ত সর্ব্বশক্তিমান, তবে কেন তিনি সকল হৃদয়ে উৎসারিত

হন না? উত্তরে বলি কেবল তিনি যে আছেন তাহা ত নয়, সেই সঙ্গে আমিও যে আছি; তিনি প্রেরক আমি প্রেরিত, আমি তাঁহার সহিত একীভূত হইলে তবে ত তাঁহার প্রেরণা আমাতে উৎসারিত হইবে। যদি কোনও গৃহে গৃহিণীর কথা শুনিয়া মনে কর "ওটা কর্ত্তার ও কথা"—আবার কর্ত্তার কথা শুনিয়া মনে কর—"ওটা গৃহিণীর ও কথা" তবে সে কিরূপ গৃহে? যে গৃহে কর্ত্তা গৃহিণীতে প্রেমে প্রেমে এরূপ যোগ যে দুইএ মিলিয়া যেন এক. এরূপ গৃহে কি নয়? ঈশ্বর ত হৃদয়ে আছেন তিনি ত প্রেরণা করিতেছেন, কিন্তু আমি যে তাঁহার সহিত একীভূত নই, এই কারণেই তাঁহার প্রেরণা ধর্ম্ম-রূপে আমার হৃদয়ে ও জীবনে উৎসারিত হইতে পারিতেছে না। কে এই একত্বকে স্থাপন করে? ইহা প্রেমেরই সাধ্য, প্রেমেরই কার্য্য। যদি তাঁহাতে এরূপ প্রেম অর্পিত হয় যাহাতে পাপে অরুচি ও পুণ্যে রুচি জন্মে, যাহাতে সর্পের নির্ম্মোকের ন্যায় বিষয়াসক্তি খসিয়া পড়িয়া যায়, এবং ধর্ম্মের চিন্তা, ধর্ম্মের সাধন ও ধর্ম্মের আচরণ, মানুষের হৃদয়ের পক্ষে মধুস্বরূপ হয়, তাহা হইলেই জীবনে তাজা ধর্ম্মের উৎস খুলিয়া যায়। তখন মানুষ ঋষিগণের সহিত একবাক্যে বলিতে পারে "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—ধর্ম্মই সকল প্রাণির মধ্যে মধু-স্বরূপ, "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" বায়ু মধু বহন করিতেছে, নদী সকল মধু বহন করিতেছে। এরূপ প্রেম ভগবানে অর্পিত হইলে মানুষ

যাহাকে মুক্তি বলে তাহা আপনাপনি সিদ্ধ হয়। বৈষ্ণব কবিগণ যে বলিয়াছেন "জগতের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী" তাহা অতীব সত্য কথা। মুক্তিকে যে অর্থেই গ্রহণ কর না কেন ঈশ্বরে অকপট প্রেম জন্মিলেই তাহা সুসাধ্য হয়। এদেশে মুক্তি শব্দের প্রধানতঃ তিন প্রকার অর্থ দেখা গিয়াছে। প্রথম, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি; দ্বিতীয়, যে মোহ নিবন্ধন মানুষ অনিত্যকে নিত্য জ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইতেছে সেই মোহের নিবৃত্তি মুক্তি; তৃতীয়, যে কর্ম্মবন্ধন বশতঃ মানুষ বার বার সংসার-পাশে বদ্ধ হইতেছে সেই কর্ম্মবন্ধনের নিবৃত্তি মুক্তি। মানুষ অকপট প্রেমে সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের সহিত একীভূত হইলে এই সকল প্রকার মুক্তিই কি সুসাধ্য হয় না? ঋষিগণ বলিয়াছেনঃ—

সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"

"অর্থ—সাধক এই মেদিনীয় পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন; তিনি শোক ও পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন; এবং সকল প্রকার হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।" ইহা সত্য কথা। প্রেমে তাঁহাকে লাভ করিলেই মানুষের সকল বন্ধন আপনাআপনি খসিয়া পড়ে।

কিন্তু এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সকল হৃদয়ে প্রবল দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আত্মা সকলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা

যাইতে পারে। প্রবুপ্ত আত্মা, প্রবুদ্ধ আত্মা ও মুমুক্ষু আত্মা! প্রষুপ্ত আত্মা যাহারা তাহারা আপনাদের আত্মার অবস্থার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও তৎপ্রতি উদাসীন। এই সকল আত্মা গতানুগতিকের অধীন হইয়া সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রষুপ্ত আত্মাদিগের মধ্যে আবার তিন শ্রেণী আছে। প্রথম, যাহারা বিষয়াসক্তিতে প্রষুপ্ত, দ্বিতীয় যাহারা স্বৈরাচারে প্রষুপ্ত, তৃতীয় যাহারা মৃত-ধর্ম্মে প্রষুপ্ত। বিষয়াসক্তিতে প্রষুপ্ত ব্যক্তিগণ বিষয়কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছে এবং তাহারই অনুসরণ করিতেছে। ঈশ্বর বলিয়া যে একজন আছেন, ধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে, পরকাল বলিয়া যে কিছু আছে ইহা ইহারা স্মরণ করে না, প্রচলিত বিশ্বাস বলিয়া, এ সকল বিশ্বাস মানবের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া, মৌখিক বিশ্বাস করে মাত্র, সে বিশ্বাস তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যে প্রবেশ করে না। তাহারা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিয়াছে যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর অপেক্ষা টাকা মূল্যবান, বিষয় বিভব মূল্যবান, সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের চিন্তাকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কে অগ্রে স্থাপন করিয়াছে। মানবাত্মার যে একটা পরমার্থিক দিক আছে সে বিষয়ে তাহারা একেবারে অন্ধ সুতরাং সে বিষয়ে তাহারা প্রষুপ্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রষুপ্ত আত্মা সকল স্বৈরাচারে প্রষুপ্ত। ইহাদের মন পুর্ব্ব শ্রেণীর ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয়াসক্তির দ্বারা চালিত নহে। ইহাদের লক্ষণ এই যে ইহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বতোভাবে

নিজ নিজ প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতা অন্বেষণ করিতেছে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বলিলেই যে সকল সময় অসাধু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা বুঝিতে হইবে তাহা নহে। ঈশ্বর প্রীতিবিহীন হইয়া অসংযত ভাবে সাধু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও স্বৈরাচারের মধ্যে গণ্য। এই শ্রেণীর মানুষ নিজের যাহা ভাল লাগে তাহাই করে, তাহার অতিরিক্ত কিছু জানে না বা অন্বেষণ করে না। ইহাদের প্রবৃত্তিকুল সতেজ ও প্রবল স্রোতস্বতীর ন্যায় তোড়ে ইহা-দিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইহারা না জানিয়া অনেক সময় ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হয় বটে, তাঁহারই আদিষ্ট কার্য্যের আচরণ করে বটে, কিন্তু তাঁহার আদেশ বলিয়া নয়, নিজের অভীষ্ট বলিয়া। যে প্রেমের যোগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা ইহাদের অন্তরে নাই। সে বিষয়ে ইহারা প্রষুপ্ত।

তৃতীয় শ্রেণী মৃতধর্ম্মে প্রষুপ্ত। ইঁহারা বাহিরে দেখিতে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, ধর্ম্মসাধনের বাহিরের নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা ঈশ্বর-প্রীতি সম্বন্ধে প্রষুপ্ত। ইহাঁদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা নাই, ব্যাকুলতা নাই, ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, প্রেমত দূরের কথা। ইহাঁদের ধর্ম্ম বাহ্যিক ক্রিয়ামাত্র; বিশ্বাস অপরের মুখে শেখা কথা মাত্র। ইহাঁরা ঘোর আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-প্রবঞ্চনার মধ্যে পড়িয়াছেন। ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পালন করিয়া ভাবিতেছেন ধর্ম্মার্থে যাহা কর্ত্তব্য করা হইল; তোতাপাখীর ন্যায় শেখা কথা, দয়াময় নাম, বলিয়া ভাবিতেছেন—এইত ঈশ্বরকে

দয়াময় বলিলাম, ইহাতেই সকল পাপ খণ্ডিয়া যাইবে। অনেক সময় দেখা যায় ইঁহারা ধর্ম্মের ছায়ার পশ্চাতে বিষয়াসক্তির কায়া রাখিয়াছেন, তাহা নিজেরা দেখিতেছেন না। জাগ্রত, জীবন্ত, সতেজ ঈশ্বরপ্রেম ইঁহাদের হৃদয়ে নাই সুতরাং ইঁহারাও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রসুপ্ত।

এই সকল প্রসুপ্ত আত্মা কখন কখনও জাগ্রত হয়, কখনও নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়; নিজের দুর্গতি ও ধর্ম্মের মহত্ত্ব অনুভব করে; তখন তাহাদিগকে জাগ্রত আত্মা বলা যাইতে পারে। এই প্রবোধন-প্রণালী সকলের পক্ষে সমান নহে। কেহ কেহ সংসারের অনিত্যতা ও বিষয়ের অসারতা অনুভব করিয়া জাগ্রত হন; আবার কেহ কেহ অগ্রে সেই প্রেমময়ের প্রেমের মাধুরী ও ধর্ম্মের সারবত্তা অনুভব করিয়া প্রবুদ্ধ হন। এই দুইটী প্রণালী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-গতি-সম্পন্ন। একটীর গতি বিয়োগের দিকে; অপরটীর গতি যোগের দিকে। এদেশের অনেক লোক প্রথমোক্ত ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ভর্তৃ-হরির বৈরাগ্য বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে তিনি একটী স্ত্রীলোকের প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন; বড় ভালবাসিয়া তাহাকে একটী উৎকৃষ্ট ফল দিয়াছিলেন; পরে সেই ফলটী অপর একজন রাজপুরুষের নিকট পাইলেন; তখন তাঁহার চেতনা হইল; তিনি ভাবিলেন ছি, ছি,! এ কুহকে থাকিতে নাই।

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা,
সাচান্য মিচ্ছতি জনং সজনোন্যরক্তঃ।

অর্থ—আমি যাহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করি সে জন আমাতে অনুরক্ত নয়; সে আর একজনকে চায়, কিন্তু সে আবার একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত!" ছি! ছি! পাপের একি কুহক জাল! এইরূপ একটা আকস্মিক কারণে কত লোকের যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, পাপের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু এই উদ্বুদ্ধ অবস্থাতে মানুষের ছাড়িবার ভাবই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিতে থাকেন "ছাড় অনিত্য অসারে", কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই যে আর একটী কথা লুকান থাকে—"ভজ সারাৎসারে" সেটী তাঁহাদের মনে অগ্রে ফোটে না। শেষে যখন ফোটে তখনও প্রেম ভক্তির ভাব অপেক্ষা সন্ন্যাসের ভাব তাঁহাদের জীবনে অধিক থাকে।

অপর শ্রেণীর উদ্বুদ্ধ আত্মাদিগের প্রকৃতি বিভিন্ন। তাঁহারা সেই প্রেমময়ের প্রেমের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাদের পবিত্র প্রকৃতিতে ধর্ম্ম আপনার আকর্ষণকে বিস্তার করে। ইহারা স্বতঃ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার সাত্ত্বিক ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

তদ্গুণ শ্রুতি মাত্রেণ যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ, মনোগতি
রবিচ্ছিন্না—

অর্থাৎ গঙ্গার স্রোত যেমন অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেইরূপ ভগবানের গুণাবলী শুনিবামাত্র যখন চিত্তবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন গতিতে তাঁহার অভিমুখে যায় তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি। বাস্তবিক এই সকল প্রবুদ্ধ আত্মার প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক ভক্তি জাগিয়া থাকে।

আত্মা এইভাবে প্রবুদ্ধ হইলেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন একদিকে নিজের দুর্ব্বলতা ও অধমতা অপর দিকে ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতা যুগপৎ হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে, এবং ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইবার জন্য, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, মনে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়। এই আবেগে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে; আকাঙ্ক্ষা নবীভূত হইতে থাকে। এই অবস্থাতে সেই আত্মাকে মুমুক্ষু বলা যায়। মুমুক্ষু আত্মা ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে গেলেই দুইটী সুমহৎ বিঘ্ন তাহার পথে অভ্যুদিত হয়। প্রথমতঃ সে দেখিতে পায়, তাহার হস্ত পদ আসক্তি-রজ্জুতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পায়, যে প্রবৃত্তির সেবা করিয়া, উঠিয়া পড়িয়া, বন্দী হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞার বল এতই হ্রাস হইয়াছে যে এখন দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলেও দাঁড়াইতে পারে না। আসক্তির রজ্জু কাহাকে বলে? মানুষের যত প্রকারে পতন হয় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, ভিতরে প্রধান কারণ সুখস্পৃহা। মানুষের স্বভাব এই, যে কার্য্যে দৈহিক বা মানসিক

সুখ হয়, উত্তেজনাজনিত এক প্রকার আনন্দ হয়, সেই কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে চায় অর্থাৎ সেই উত্তেজনাজনিত আনন্দটুকু বার বার লাভ করিতে চায়। আমার ইজী চেয়ার-খানিতে বসিয়া যদি তোমার আরাম বোধ হয় তার পর দেখি যখন তখন আমার ইজী চেয়ার খানিতে আসিয়া বসিতেছ। নস্যটী নাকে দিলে রি রি করে, স্নায়বীয় উত্তেজনাজনিত এক প্রকার সুখানুভব হয়, এজন্য দেখি মানুষ বার বার নস্যটী নাকে দিতেছে। মানব প্রকৃতির দ্বিতীয় স্বভাব এই, যে কার্য্যটী অভ্যাস-প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বাধা দিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। নস্যটী লওয়ার জন্য বন্ধুগণ বিরক্ত, তুমিও কতবার প্রতিজ্ঞা করিতেছ যে ছাড়িবে অথচ ছাড়িতে পার না ; অভ্যাস বশতঃ মনের বাধা দিবার শক্তি নষ্ট হইয়াছে। মানুষের পতনের মধ্যে আর কোনও কথা নাই। কত সুরাপায়ীকে অনুতাপ করিতে দেখিয়াছি, কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে দেখিয়াছি, আবার সেই সুরাপায়ীর বন্ধুবর্গের সহিত ও সুরার সহিত যেই সাক্ষাৎ হইয়াছে অমনি বালির বাঁধের ন্যায় সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! কারণ এই সুরা দেখিলেই সুরার উত্তেজনা জনিত সুখটুকু স্মরণ হয়, তখন মন আর বাধা দিয়া রাখিতে পারে না, প্রতিজ্ঞাতে বল আসে না। ইহাকেই বলে আসক্তি। আসক্তির একদিকে সুখস্পৃহা অপর দিকে প্রতিজ্ঞার বলের অভাব। মুমুক্ষু আত্মার পথে এই দুইটাই প্রধান বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান হয়। এই দুইটীকে অতিক্রম করা সময়-সাপেক্ষ।

কোনও কোনও সাপ আছে যাহা মানুষের পায়ে বা হাতে জড়াইলে টুকরা টুকরা করিয়া সাপের দেহ কাটিয়া ফেলিতে না পারিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অসক্তির বাঁধনও সেই প্রকার। ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে অনেক দিন লাগে। দ্বিজত্ব এক দিনে লাভ হইতে পারে; কিন্তু দ্বিজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সময়-সাপেক্ষ। মুমুক্ষু আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের করুণাতে বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের অতীব প্রয়োজন।

দ্বিজত্ব।

সংস্কৃতে দ্বিজ শব্দের চলিত অর্থ দুই প্রকার, পক্ষী এবং ব্রাহ্মণ; পক্ষীকে এই জন্য দ্বিজ বলা যায় যে পক্ষী একবার অণ্ডের আকারে জন্ম গ্রহণ করে, পুনরায় জীবের আকারে আবির্ভূত হয়। ব্রাহ্মণকে যে দ্বিজ বলে, সে বিষয়ে এই একটা চলিত কথা আছে :—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।"

অর্থ—সকলেই শূদ্র হইয়া জন্মে, ব্রাহ্মণ সংস্কার-বশতঃ দ্বিজ হন।

প্রাচীনেরা উপনয়ন বা ধর্ম্মদীক্ষাকে ব্রাহ্মণের জীবনের পক্ষে এরূপ একটা ব্যাপার মনে করিতেন, যে তাহাকে দ্বিজত্ব আখ্যা দিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পরমহংসদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হইবার সময়, ব্রাহ্মণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ শিখা-সূত্র ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসীকে নূতন বেশ দিয়া জগতের নিকট পরিচিত করা হয়। ইহার পর বংশ, জাতি, জন্মস্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিতে নিষেধ; শরীর সম্বন্ধে স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ভবনে প্রবেশ ও বাস নিষিদ্ধ। এইরূপে দ্বিজত্বের সমুদয় চিহ্ন

দেদীপ্যমান রাখা হয়। শুনিয়াছি রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হন, তাঁহাদের দীক্ষার প্রণালীও না কি এইরূপ। তদ্দ্বারা পুরাতন জীবনের মৃত্যু ও নূতন জীবনের উৎপত্তি বিশেষরূপে সূচিত হয়।

ইহাতে কি প্রমাণ হয়? ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে, জগতের সাধুগণ মানুষের ধর্ম্মোন্মুখ অবস্থাকে এরূপ গুরুতর মনে করিয়াছেন যে তাহাকে দ্বিতীয় জন্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কেন এরূপ করিয়াছেন? তাহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বিজত্ব কাহাকে বলে? দুই কথায় তাহার লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। মানুষ যখন জ্ঞাতসারে প্রবৃত্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, যখন পাপের দিকে পশ্চাৎ ও ঈশ্বরের দিকে মুখ করিরা দাঁড়ায়,—তখন তাহার দ্বিজত্ব ঘটে। এ পরিবর্ত্তনটা মানব-জীবনে বড় সামান্য নহে। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা ইহার ভাব কতকটা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। একজন ধনীর সন্তান যৌবন-মদে মত্ত হইয়া, স্বীয় পিতার আদেশ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পিতৃপ্রাপ্ত ধন লইয়া, কুসঙ্গীদের সঙ্গে বিদেশে আমোদ করিতে গেল। দিন দিন ধনের ক্ষতি, মানের ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতি, সকল দিকে ক্ষতি হইতে লাগিল, তবু তাহার চেতনা নাই! অবশেষে আর ধন নাই, তখন কুসঙ্গিগণ এক প্রতারণা-জাল বিস্তার করিতে পরামর্শ দিল। এক সহরে গিয়া তাহাকে নবাব বা রাজা সাজাইয়া, বাজারের লোকের জিনিসপত্র লইয়া

রাতারাতি পলাইবার পরামর্শ করিল! যখন সে প্রতারণা কার্য্যটা হইয়া গেল এবং পুলিস তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, এবং তাহাদিগকে আত্মগোপন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে সহরে সহরে বেড়াইতে হইল, তখন সেই ধনী সন্তানের মনে বড়ই লজ্জা বোধ হইল, সে একদিন বলিল,—"আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না; তোমরা বড় ছোট লোক, সামান্য অর্থের জন্য পরকে প্রবঞ্চনা কর, আমি পিতার কাছে যাই।" সে এই কথা বলিবামাত্র তাহার সঙ্গিগণ অনুরোধ, উপরোধ, প্রভৃতি সহকারে তাহাকে বারণ করিতে লাগিল; সে কিছুতেই শুনিল না; তাহারা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, সে শুনিল না; সবলে হাত ছাড়াইয়া, তাহাদের জিনিসপত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া, পিতার গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

এরূপে যাওয়াটা কতটা প্রতিজ্ঞার বলের কর্ম্ম! তেমনি প্রবৃত্তির অধীনতা ত্যাগ করিয়া মানুষ যখন ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে যায়, তখন কি মহাপরিবর্ত্তনই ঘটে! কি প্রতিজ্ঞার বলেরই প্রয়োজন হয়! প্রবৃত্তির অধীনতাতে কি দুঃখ তাহা মানুষ দেখিয়াছে; আমরাও প্রতিদিন দেখিতেছি। মানব-সংসারে দাবানলের ন্যায় যে দুঃখানল নিরন্তর জ্বলিতেছে, তাহার অধিকাংশ কি মানবের আত্ম-কৃত নহে? রোগ শোক জরা মরণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য দুঃখ ত আছেই, যাহা সকলকেই সহিতে হয়, নিরন্তর সতর্ক থাকিয়াও যাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু হায়! মানুষের এমনি

দুর্গতি, যে, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মানুষ আবার নূতন নূতন দুঃখ উৎপন্ন করে! কাষ্ঠ যোগাইয়া, বাতাস দিয়া, দুঃখানল জ্বালিয়া তোলে! প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যন্ত্রণানলে দগ্ধ হয়। অপরকেও দগ্ধ করে! ঋষিরা বলিয়াছেন ঃ—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থ—"কামনার বিষয় পাইয়া কামনা কখনই নিবৃত্ত হয় না; বরং ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইলে অগ্নি যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে"। প্রবৃত্তিরূপ অনলের কাষ্ঠ আমরা নিজেই; —আমাদের শরীর মনকে পোড়াইয়া ইহা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, সংসারে কত দুঃখ কত হাহাকার, কত আর্ত্তনাদ, কত বৈর, কত বিদ্বেষ, কত অত্যাচার, কত মনস্তাপ! একজন বিশটী কি পঁচিশটী টাকা বেতন পায়, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলেও তাহাতে সংসার চলে না; কিন্তু এই দারিদ্র্য তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে, সে আবার সুরাপান করিতে ও তৎসহায় অপরাপর পাপের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছে; গিয়া দেখ, সে মত্ত হইয়া আপনার পত্নীকে মারিয়া অর্দ্ধ-মৃত করিতেছে; সন্তানগুলিকে অন্ন-বস্ত্র-হীন করিয়া পথে ছাড়িয়া দিতেছে; প্রতিবেশিগণের সহিত নিরন্তর কলহে দিন অবসান করিতেছে। ইহা দেখিলে কার না চক্ষে জল পড়ে? কে না বলে হায় রে! জীব! প্রবৃত্তির হাতে আপনাকে দিয়া তোর কি দুর্দ্দশা!

প্রবৃত্তির হাতে আপনাকে দেওয়া বড় সর্ব্বনাশের কথা! পাপকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া আর আপনার প্রাঙ্গণে কণ্টক-তরুর বীজ বপন করা সমান। নিজেরই যাতনার কারণ সঞ্চয় করিয়া রাখা। যে পূর্ব্বোক্ত ধনী-সন্তানের ন্যায় প্রবৃত্তির হাতে আপনাকে দিয়াছে, সে যে দিন বলে,—"আর আমি প্রবৃত্তির দাসত্ব করিব না, ধর্ম্ম যিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সংসারকে ধারণ করিতেছেন, যিনি আমাতে রহিয়াছেন, আমি এত দিন বুঝি নাই, আমি সেই ধর্ম্মের হাতে আপনাকে দিব," সে দিন কি তার নব জন্মের দিন নয়? সে দিন সে এক নূতন জগতে প্রবেশ করে; সেখানকার সকলি নূতন।

প্রথম, সেখানকার জ্ঞান নূতন। যতদিন ধর্ম্ম-দৃষ্টি খোলে নাই, ততদিন মানুষ যে সকল বিষয়কে সার বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল, এখন দেখিল, সে সমুদায় অসার হইয়া গেল, এবং যাহাকে সে পুর্ব্বে অসার ভাবিতেছিল, তাহাই সার হইল। সে এতদিন ভাবিতেছিল কেবল জড়রাজ্যেই সুদৃঢ় নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত আছে; এখন দেখিল আত্মার রাজ্যেও এক সর্ব্ব-বিজয়িনী শক্তি পাপকে শাস্তি দিয়া পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে। আগে ভাবিত জগতে চারিদিকে অন্ধশক্তির ক্রীড়া, সে তন্মধ্যে দণ্ডায়মান আছে, আত্মরক্ষা করাই তাহার প্রধান কাজ, স্বপোষণই তার প্রধান ধর্ম্ম, এখন দেখিল যিনি জড়ে তিনিই চেতনে, তাঁহার সত্তার মহাপ্লাবনে জগত নিমগ্ন, সাগর তরঙ্গোপরি একগাছি তৃণ যেমন ভাসে, তেমনি সেই সত্তা-

সাগরোপরি এই জগতে ভাসিতেছে। দেখ উভয় জ্ঞানে কত তারতম্য।

এ রাজ্যের জ্ঞান যেমন নূতন ভোগও তেমনি নূতন। সংসার-রাজ্যে, প্রবৃত্তিরাজ্যে, থাকিতে তাহার সুখ দুঃখ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই, এখন নূতন প্রকার সুখ দুঃখের অভ্যুদয়। সংসার-রাজ্যে থাকিতে ধনমানের লাভে সুখ ও তাহাদের ক্ষতিতে দুঃখ হইত, এখন সে সব দিকে দৃষ্টি নাই; এখন তদপেক্ষা ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও নিজ চিত্তের বিশুদ্ধি বহুগুণে অধিক প্রার্থনীয় মনে হয়; এবং একটু সামান্য পতনে যে মানসিক যাতনা হয়, কোনও ধন বা মানের ক্ষতি তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। আগে বৈরনির্য্যাতন করিতে পারিলে সুখ হইত এবং না করিতে পারিলে দুঃখ হইত, এখন মন মানবের সর্ব্ববিধ প্রতিকূলতাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া গণনা করে; এবং যে বিদ্বেষ্টা তাহারও কল্যাণ-চিন্তা করিতে সুখী হয়। দেখ কি পরিবর্ত্তন।

এ রাজ্যের অন্ন পানও নূতন। পূর্ব্বে আত্মা বিষয় চিন্তাতেই পরিপুষ্ট হইত, স্বার্থসিদ্ধির আশার দ্বারা বলবান হইত, ও স্বার্থ চিন্তার মধ্যেই বাস করিত; এখন আত্মার অন্ন পান অন্য প্রকার, আত্মা এখন সত্যের অনুধ্যান ও অনুসরণে উৎসাহিত এবং সত্য-স্বরূপের সহিত অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা পরিপুষ্ট। তিনিই এ রাজ্যে আত্মার অনুপান।

এই দ্বিতীয় রাজ্যের সম্বন্ধ সকলও নূতন। পূর্ব্বে যাহাদের

সহিত আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের অনেকে হয়ত দূরে গিয়াছে; আবার দূরে যাহারা ছিল, তাহারা হয়ত নিকটে আসিয়াছে। স্বার্থসিদ্ধি ও বিষয়-সুখ লাভ যখন মনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তখন যাহারা স্বার্থসিদ্ধির সহায় বা তাহার উপায়-স্বরূপ ছিল, মন তাহাদিগকেই আত্মীয় বোধ করিত ও তাহাদের সঙ্গ অন্বেষণ করিত, বা যাহারা অসার আমোদের সহায়, তাহাদের উপরে প্রীতি স্থাপন করিত; এখন আত্মার আত্মীয়তা স্বতন্ত্র স্থানে অর্পিত। মহাত্মা যীশু একবার স্বীয় শিষ্যগণকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মা ভাই কে? যে কেহ প্রভু পরমেশ্বরের চরণাশ্রিত সেই আমার মা, আমার ভাই।" এ উক্তির জন্য তাঁহাকে কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, স্ববর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতার ন্যূনতা ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, নব-জীবন-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এমন একটা নৈকট্য ও আত্মীয়তা স্থাপিত হয়, যাহা রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঘনিষ্ট ও তদপেক্ষাও প্রিয়। নব-জীবন প্রাপ্ত আত্মা যেমন এক দিথক অপর নবজীবন-প্রাপ্ত আত্মাদিগের নৈকট্য অনুভব করে, তেমনি জগতের সাধু ও ভক্তগণকে আপনার হৃদয়ের প্রিয় ও আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিতে থাকে।

এই যে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা, ইহাতে দেশকালের ব্যবধানকে কিছুমাত্র অন্তরায় বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান ও অতীত কালের সমুদয় মহাজনকে হৃদয়ের নিকটে পাওয়া

যায়। সকল সাধু সাধ্বীকে আপনার লোক ও সকল সাধু কাজকে আপনার কাজ বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই বলিয়াছি এ রাজ্যের সম্বন্ধ সকলও নূতন।

যে পরিবর্ত্তনে এক দিকে এত পরিবর্ত্তন ঘটায়, তাহাকে কি দ্বিজত্ব বলা অসঙ্গত? কখনই নহে। তবে এই দ্বিজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কালসাপেক্ষ। এক দিনে মানুষের মুখটা ঈশ্বরের দিকে ফিরিতে পারে, কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিটাকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন করা বহুকাল ও বহুসাধন সাপেক্ষ। এক পলাশীর যুদ্ধে স্থির হইয়াছিল যে এদেশ মুসলমানদিগের হস্তে না থাকিয়া ইংরাজদিগের হস্তে থাকিবে; কিন্তু সেই এক দিনে অর্জ্জিত দেশকে আয়ত্তাধীন করিতে ও ইহার সকল বিভাগকে শাসনাধীনে আনিতে ইংরাজদিগের দেড়শত বৎসর গিয়াছে। সেইরূপ এক দিনে তোমার মনে প্রতিজ্ঞা উঠিতে পারে যে, আর প্রবৃত্তিকুলের দাসত্ব করিব না, এবার ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অনুগত হইব, কিন্তু সেই আনুগত্য স্থাপন করা, প্রকৃতির সকল বিভাগকে ঈশ্বরের বশবর্ত্তী করা, এক একটী অভ্যাসশৃঙ্খলকে ছিন্ন করা বহু আয়াসসাধ্য। মানুষ যখন দ্বিজত্ব পায়, যখন তাহার প্রাণে ব্যাকুলতার উদয় হয়, তখন তাহার এমনি ব্যগ্রতার উদয় হয়, যেন এক দিনের বিলম্ব আর সয় না; তখন সে ঈশ্বরকে বলিতে থাকে—"হে হরি, তুমি ত নিমেষে পতিতকে তরাইতে পার, আমাকে তরাইতে আর বিলম্ব কর কেন?" যে নরকের পঙ্কিল হ্রদের গভীর গর্ভে পড়িয়াছিল, সে ব্যাকুলতার মুহূর্ত্তে

ইচ্ছা করে, যে এক লম্ফে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া যায়, সকল দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সাধুশ্রেষ্ঠ হয়। কিন্তু ঈশ্বর এমন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। তিনি বলেন, আসক্তির সাপকে বহু দিন ধরিয়া আপনার দেহে জড়াইতে দিয়াছ, এখন বসিয়া বসিয়া কাঁদ আর টুকরা টুকরা করিয়া কাট। ঈশ্বর বোধ হয় এই জন্যই ঐ প্রকার বিধি করিয়াছেন যে, তাহা হইলে পাপের প্রতি ঘৃণা দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে; আমরা চক্ষের জলে ভাসিয়া বলিব "বাপ্‌রে পাপের পাশ কি সর্ব্বনেশে জিনিস যে একবার গলায় পরিলে, অনেক যাতনা পাইয়া খুলিতে হয়।" একবার একজন কাফ্রী ক্রীতদাস স্বীয় প্রভুর সহিত ইংলণ্ডে আসিয়াছিল; ইংলণ্ডে আসিয়া সে গুরুতর পীড়াতে আক্রান্ত হয়; তাহার প্রভু মনে করেন যে, সে আর বাঁচিবে না, তাই লোকে যেমন পীড়িত পশুকে পথে পড়িয়া মরিবার জন্য তাড়াইয়া দেয়, তেমনি তাহার নির্দ্দয় প্রভু তাহাকে রাজপথে তাড়াইয়া দিলেন। এই অবস্থাতে সে সুবিখ্যাত গ্রান্‌ভিল শার্পের চক্ষে পড়ে। তিনি তাহাকে একটী হাঁসপাতালে রাখিয়া দেন। সেখানে আরোগ্যলাভ করিলে, তাহাকে অন্য এক স্থানে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিছুদিন চাকুরী করিয়া সে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করে ও তদ্দ্বারা একটী সামান্য দোকান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। যখন দুই চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ব্ব-জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিতেছে, এমন সময়ে

একদিন তাহার দোকানের সম্মুখে একখানি গাড়ি থামিল এবং একজন লোক আসিয়া তাহার গলায় কাপড় দিয়া তাহাকে বন্দী করিল। হতভাগ্য ক্রীতদাস চাহিয়া দেখে যে, তাহার পুরাতন প্রভু। এই হতভাগ্য কাফ্রীর সে দিন যে দশা হইয়াছিল, অনেক নব-জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তির কি মধ্যে মধ্যে সেই দশা হয় না? যখন আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছি, স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইয়াছি মনে করিতেছি, তখন হঠাৎ কোনও পুরাতন প্রবৃত্তি নিদ্রিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া, আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া দিল; তাহার পুরাতন দাসকে বন্দী করিল। তখন সেই মুমুক্ষু ও দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত আত্মা অন্তর্দাহে অস্থির হইয়া পড়ে; নিজের মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া, সেণ্ট পলের ন্যায় বলিতে থাকে "O wretched man that I am! who shall deliver me from this body of death!—"হায়রে আমি হতভাগ্য, কে আমাকে এই মৃত্যুময় দেহের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।"

দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত আত্মারও পতন হইতে পারে, কিন্তু এ পতনেও পূর্ব্বকার পতনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে প্রবুপ্ত আত্মা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে সুখ পাইত, পাপকে স্পৃহণীয় বলিয়া মনে করিত, বরণ করিয়া লইত, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন মন থাকে ঈশ্বরচরণে, প্রবৃত্তিকুল অভিভূত করিয়া লইয়া যায় অপর দিকে। মানুষ যতক্ষণ পাপকে ঘৃণা করিতেছে ততক্ষণ তাহার হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গেই আছে। যে

অবস্থায় মানুষ অসাধুতার স্মরণে, চিন্তনে ও আচরণে আনন্দ পায় এবং অসাধুভাবকে হৃদয়ে পুষিতে ভাল বাসে, সে অবস্থা নরক-বাসের অবস্থা। আমরা ত আর স্বর্গ বা নরক বলিয়া স্থান বিশেষ মানি না; আকাশের উপরে স্বর্গ ও পাতালের নিম্নে নরক এ কথা বিশ্বাস করি না; আমরা নরক বলিতে আত্মার সেই অবস্থা বুঝি, যাহাতে মানুষ পাপকে স্পৃহণীয় মনে করে ও তাহাকে হৃদয়ে পুষিতে ভালবাসে। যেমন বর্ত্তমান শরৎকালে প্রতিদিন দেখি আকাশ বেশ পরিষ্কার রহিয়াছে, কোথাও কোনও মেঘের চিহ্ন নাই, হঠাৎ গগনের এক কোণ হইতে একখানা মেঘ উঠিয়া আসিল, ও এক পাশলা বৃষ্টি ছড়াইয়া গেল, তেমনি মানুষ যতদিন রক্ত মাংসময় দেহে আছে, ততদিন পবিত্রাত্মা সাধুরও মনে সময়ে সময়ে মলিনভাব আসিতে পারে। তিনি যদি তাহাতে আনন্দ না পান, যদি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, তাহা হইলেই জানা গেল, তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই আছেন। আত্মা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে রহিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞার বলের অভাবে প্রবৃত্তিকুল ক্ষণকালের জন্য পরাভূত করিয়া ফেলিল, সে অবস্থাকে পাপের অবস্থা বলা যায় না, তাহা দুর্ব্বলতা বটে, কিন্তু গুরুতর পাপ নহে; পতন বটে, কিন্তু নরকবাস নহে। মহাত্মা সেণ্টপলের আর একটী উক্তিতে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন ;—

"For that which I do I allow not, for what I would that do I not ; but what I hate that do I.

If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.

Now then it is no more I that do it, but sin that dwellth in me.

অর্থ—আমি যাহা করি, আমি তাহা পছন্দ করি না, আমি যাহা করিতে চাই, তাহা আমি করিতে পারি না, আমি যাহা ঘৃণা করি তাহাই আমার দ্বারা কৃত হয়।

অতএব দেখ, আমি যাহা করিতে চাই না, তাহাই যদি আমার দ্বারা কৃত হয়, তাহাতে ত এই প্রমাণিত হয় যে, আমি ঈশ্বরের বিধিকে সৎ বলিয়া মান্য করিতেছি।

তবে ত সে কাজ আমার নয়, কিন্তু আমার হৃদয়বাসী পাপ-প্রবৃত্তিকুলের।

দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মধ্যে পতন হইলেও তাঁহারা পতিতাবস্থায় থাকিতে পারেন না ; বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতন তাঁহাদের ব্যাকুলতাকে দশগুণ বর্দ্ধিত করে, ও তাঁহাদের প্রভূত উন্নতির কারণ স্বরূপ হয়। মার্টিন লুথারের বিষয় এরূপ শুনা যায় যে, তিনি বলিতেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতন ব্যাকুলাত্মাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়। ইহার আঘাতে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠেন ও দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞার সহিত তপস্যাতে প্রবৃত্ত হন।

এইরূপ করিয়া দ্বিজত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক দিন যায়। সে সময়ে ধৈর্য্য ও ঈশ্বরের করুণাতে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে রক্ষা করিতে হয়। এই অবস্থাতে একটী বিপদ আছে তাহা নিরাশা। বার বার পড়িয়া মানুষ যখন দেখে যে, সে আর আত্ম-রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তখন নিজ শক্তিতে ও সেই সঙ্গে দেব-প্রসাদে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। চক্ষের জলে ভাসিয়া বলে, কে বলে ঈশ্বর পাপীর প্রার্থনা শোনেন, তবে আমার প্রার্থনা বৃথা হইল কেন? এ পতন বার বার আসে কেন? এরূপ নিরাশা ব্যাধিতে যাঁহাদিগকে ধরিতেছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন? ইহকাল পরকালের সাধুগণ একবাক্যে বলিতেছেন—"হে আত্মন্ ধৈর্য্যধারণ কর, ভক্ত-বৎসল ভগবান ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিবেন না।"

সাধুদের সাক্ষ্য।

সকল দেশেই ও সকল যুগেই এমন কতকগুলি মানুষ দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা অপর দশজনকে পরমার্থে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের কথা শুনিয়া লোকে মনে করিয়াছে, কৈ মানুষের মুখে ত সচরাচর এমন কথা শোনা যায় না। সেই পুরাতন তত্ত্ব, সেই পুরাতন কথা, অথচ ইঁহাদের মুখ হইতে সেই কথাগুলি নূতনভাবে ও নূতন শক্তিসম্পন্ন হইয়া বহির্গত হইয়াছে। এই যে প্রাচীনে নূতন ভাব, ইহার এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ, ইহা ইঁহাদের সকলের উক্তিতেই দৃষ্ট হইয়াছে। তাহার ফল স্বরূপ শত শত নরনারীর হৃদয় ইঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; দলে দলে লোক ইহাদের অনুগমন করিয়াছে। জগতের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন জাতি সকলকে নানা রাজ্যে ও নানা শাসনতন্ত্রে বিভক্ত দেখা যায়, এক এক দেশ এক এক রাজার শাসনাধীন, সেইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও মানবকুলের অনেক রাজা দেখিতে পাওয়া যায়, সমগ্র মানব-সমাজ এই বিভিন্ন রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ও লোকে ইঁহাদের শাসনাধীন।

মানব-কুলের এই রাজারা সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষ বলিলে অনেক লোকে এই বুঝে যে, তাঁহারা তামাকে সোণা করিতে পারেন, বা অপর কোনও অলৌকিক ও অতিনৈসর্গিক

ক্রিয়া করিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষের অর্থ আমি আর এক প্রকার বুঝিয়া থাকি। যাঁহারা সাধনাগুণে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ। সত্যের সাক্ষাৎকার বলিলে কি বুঝায়? তাহা দুইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি। সকলেই ইহা প্রতিদিন দেখিতেছেন দূরে কোনও শব্দ হয়, মানুষ তাহা শোনে। কিরূপে শোনে? শব্দ রহিল কোথায়, আর মানুষের কর্ণ কোথায়? মধ্যে কতটা ব্যবধান। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি যে, মানবের কর্ণে পটহের ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মময় আবরণ আছে, শব্দ আকাশ বা ইথরের তরঙ্গের দ্বারা নীত হইয়া সেই পটহে আসিয়া আঘাত করে। সেই কম্পন স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহাতেই শ্রুতিজ্ঞান জন্মে। আকাশ বা ইথরের এই তরঙ্গ এতদিন জ্ঞানিগণের অনুমানলব্ধ বিষয় মাত্র ছিল, সকলেই বলিতেন, নিশ্চয় কোনও প্রকার তরঙ্গ আছে, নতুবা শব্দজাত কম্পন নীত হয় কি প্রকারে, কিন্তু কেহ সে তরঙ্গ পরীক্ষার দ্বারা দেখেন নাই, ডাক্তার জে, সি, বসু প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা দেখিয়াছেন, পরীক্ষা দ্বারা ঐ তরঙ্গের নিঃসংশয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাড়িতের তরঙ্গ আর তাঁহাদের শোনা কথা নয়, অনুমানলব্ধ জিনিস নয়, দেখা জিনিস! তুমি আমি আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকলকে যেরূপ উজ্জ্বলভাবে দেখিতেছি, তাঁহারা তেমনি উজ্জ্বলভাবে উহা দেখিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎকারের আর এক প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। একবার একটী ইংলণ্ডীয় ধনি-সন্তানের একটী বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাই এই। একবার একজন ধনিসন্তান পিতৃমাতৃহীন হয়। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে নিজের জ্যেষ্ঠতাতের হাতে পড়ে। জ্যেষ্ঠতাতটী কৃপণ-স্বভাব বিষয়ী লোক ; বিষয় চিন্তাতে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত, সে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং সে বালক তাঁহার নিকট স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন কিছুই পাইত না জেঠাই মা ও ততোধিক, ঐ নারী নিজে যদিও পুত্রহীনা ছিলেন এবং মনে করিলেই এই হতভাগ্য বালককে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বার্থপর ও নির্ম্মম অন্তরে সে প্রীতি ছিল না, তিনি তিক্ত ও কঠোর ব্যবহারে ঐ বালকের হৃদয়কে চির-বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর দুই একটী স্ব-সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকও ছিলেন, তাঁহারাও স্বার্থপরতার মূর্ত্তি, নিজেদের খুটিনাটি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, এ বালকের প্রতি মনোযোগ করিতেন না। বালকটীকে সকলেই অন্তর্ম্মনা ও চির-বিষণ্ণ দেখিতে পাইত। সে কাহারও নিকট মন খুলিত না। যে দুই এক জনের নিকট মন খুলিত, তাহাদের সহিত নারী প্রকৃতি লইয়া বিবাদ হইত। সে নারী-দ্বেষী হইয়াছিল। সে বলিত, নারী-প্রকৃতির প্রশংসা যে লোকে এত করে সে সমুদয় কল্পিত কথা। প্রণয় বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহা নহে ও সমুদয় কেবল স্বার্থের খেলা, নর-নারীর নিকৃষ্ট প্রকৃতির

প্রণোদিত কার্য্য। স্বার্থের জন্যই, আত্ম-সুখের জন্যই মানুষ পরস্পরকে আশ্রয় করে। পবিত্র প্রেম, অকপট প্রণয়, বলিয়া যে একটা কিছু আছে, বন্ধুগণ তাহাকে তাহা বুঝাইতে পারিত না। ক্রমে সেই বালক যুবক হইল। একবার সে কোনও কার্য্যানুরোধে কোনও সহরে গিয়াছিল। সেখানে একজন দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকের ভবনে তাহাকে কয়েক দিন বাস করিতে হয়। ঐ গৃহস্থের একটী কন্যা ছিল। সেই কন্যাটীর সহিত পরিচয় হইয়া যুবক যেন হঠাৎ আর এক জগৎ দেখিতে পাইল। এমন মধুরতা, এমন লজ্জাশীলতা, এমন চিত্তের উদারতা ও সুকোমলতা সে পূর্ব্বে নারীচরিত্রে দেখে নাই। দেখিয়া তাহার মন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। নারীজাতির প্রতি তাহার যে ঘৃণা ছিল, কোথা দিয়া যে অন্তর্হিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে ঐ মহিলার সাধুতা ও পবিত্র-চিত্ততার অনুধ্যান করিতে করিতে স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তৎপরে দেখা গেল, সে অবসর পাইলেই সেই সহরে সেই পরিবারে যাইতেছে। কিছু দিনের মধ্যেই এই সংবাদ জ্যেষ্ঠ-তাতের গোচর হইল। বাড়ীর মহিলারা বলিলেন, সে প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স বোঝেন, প্রেমের বিষয় কিছু বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"রস না, ওকে দেশভ্রমণের জন্য পাঠাইতেছি, তাহা হইলেই ওর নেশা ছাড়িয়া যাইবে।" এই বলিয়া কৌশলে তাহাকে

দেশ ভ্রমণের জন্য পাঠাইলেন। যুবক দেশ ভ্রমণ করিতে গেল ; কিন্তু দিক-দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন উত্তর দিকেই ফিরিয়া থাকে, তেমনি তাহার মন ঐ বালিকার দিকে ফিরিয়াই রহিল। বহু দিন পরে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। তখন জ্যেষ্ঠতাত বিপদ গণনা করিতে লাগিলেন এবং কল কৌশল পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ-ভাবে নিষেধ আরম্ভ করিলেন, "তুমি ওখানে যাইতে পারিবে না। আমাদের মত অবস্থার লোকের এরূপ হীনাবস্থ ব্যক্তি-দিগের সহিত বন্ধুতা করা ভাল নয় ; ও বালিকাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না ; ও তোমার উপযুক্ত স্ত্রী কখনই নহে।" এই বিষয় লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সহিত যুবকের বিরোধ উপস্থিত হইল;তিনি ক্রোধ করিয়া তাহার সমুদায় পৈতৃক বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং নিজ ভবন পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। যুবক গৃহ-তাড়িত হইয়া সেই রমণীর পাণি-গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন একজন বন্ধু এক দিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"কি হে ভাই, এই না তুমি বলিতে প্রণয় বলিয়া একটা কিছু নাই, নর-নারী পরস্পরকে স্বসুখ-পরতার জন্যই আশ্রয় করে। এখন কি বল ? প্রণয় বলিয়া একটা কিছু আছে কিনা ?" তখন ঐ যুবক সলজ্জভাবে বলিল. "আগে আমি অন্ধ ছিলাম ; এখন দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

পূর্ব্বোক্ত দুইটী দৃষ্টান্তে সকলে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎ-

কারের অর্থ কি বুঝিলেন? পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার দুই প্রকারে হয়। প্রথম, সাধনার দ্বারা কোনও সত্যে নিঃসংশয়িত-রূপে বিশ্বাস স্থাপন করা, দ্বিতীয়, কোনও নূতন শক্তির দ্বারা নিজে অধিকৃত হইয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া। এ ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলকে সাক্ষাৎকার না করিলে, তাহা আমাদের নিকট মৃত হইয়া থাকে। সাধুমুখে কত কথাই শুনিতে পাই, শাস্ত্রে কত কথাই দেখিতে পাই, সে সমুদায় শোনা কথা মাত্র। যত দিন তাহার প্রমাণ নিজের মধ্যে না পাওয়া যায়, ততদিন তাহা নিজস্ব নহে। তুমি যে অপরকে বল,—'দয়াল নামে তরে যাবে" তুমি কি দয়াল নামে তরিয়াছ? তুমি কি নিজ অন্তরে দয়াল নামের শক্তি দেখিয়াছ? তুমি কি সেই ধনিসন্তানের ন্যায় বলিতে পার "আগে অন্ধ ছিলাম, ঈশ্বর যে আছেন, তাহার প্রমাণ এখন নিজ হৃদয়েই দেখিতেছি, তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হইয়া বুঝিতেছি।" এরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের প্রমাণ পাইবার জন্য কত লোক ব্যগ্র হন? জগতের অধিকাংশ লোকেই গতানুগতিকের অনুসরণ করিতেছে; অধিকাংশ ধর্ম্ম-প্রচারক তোতা পাখীর ন্যায় শোনা কথা বলিতেছে। কতিপয় অসাধারণ-প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ এখানে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ইঁহারাই জগতের মহাজন। ইঁহারা এক এক জন এক এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বুদ্ধ শান্তভাবে সিদ্ধ, মহম্মদ দাস্যভাবে সিদ্ধ, পারস্য কবি

হাফেজ সখ্যভাবে সিদ্ধ, যীশু বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ, চৈতন্য মধুরভাবে সিদ্ধ। বাৎসল্যভাব দুই প্রকারে হইতে পারে; ঈশ্বর পিতা আমি সন্তান, এই একভাব, আর আমি পিতা বা মাতা ও ঈশ্বর সন্তান, এই আর এক ভাব। দ্বিতীয়োক্ত ভাবটী মীরাবাই প্রভৃতি এ দেশের বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে অনেকে সাধন করিয়াছেন, কিন্তু যীশু প্রভৃতি পিতৃভাবেই সিদ্ধ।

এই সকল মহাজনের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, নিজেরা একবার তলাইয়া দেখিবেন সত্যের ভূমি কিছু পাওয়া যায় কিনা; এবং জীবন মরণ পণ করিয়া এই ব্রতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ব্যাকুলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বিষয়ে চিন্তা করিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। বুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যে আমার শরীরের অঙ্গ সকল খসিয়া পড়ুক, কীটে এ দেহকে ক্ষত বিক্ষত করুক, তথাপি আমি এই বোধিদ্রুমের তল হইতে উঠিব না; আলোক পাইতেই হইবে"। যীশু মানসিক যাতনাতে অভিভূত হইয়া চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত্রি, অরণ্য মধ্যে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন, সত্যের সাক্ষাৎকার না হইলে উঠিব না। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে এমনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, যে বলিলেন, "সত্যের আলোক না পাইলে এ প্রাণ রাখিব না," এই বলিয়া গিরিপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। চৈতন্য

এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে—"কৃষ্ণ রে বাপ রে! দেখা দে রে" বলিয়া কাঁদিয়া গয়াতীর্থের পথে বাহির হইয়াছিলেন; এবং নবদ্বীপেও সময়ে সময়ে মাটিতে পড়িয়া এরূপ মুখ ঘসিতেন যে মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইত। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা কি সাধারণ মানুষের হয়? এই স্থানেই ইঁহাদের অসাধারণত্ব। লোকে যে সকল চিরপ্রচলিত মত ও ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট ছিল, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া ইঁহারা চিন্তা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলন এবং অতলে ডুবিয়া মহামূল্য সত্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। সিসিলি দ্বীপস্থ প্রাচীন সাইরেকিউজ নগরে আর্কিমিদিস নামে একজন মহা-পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি একবার একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার মীমাংসার জন্য কয়েক দিন চিন্তিত ছিলেন। এক দিন স্নানাগারে স্নান করিতে গিয়া জলের টবের মধ্যে বসিবামাত্র ঐ মীমাংসাটী তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইল। তখন সেই তত্ত্ব অনুভব করিয়া, তাঁহার মনে এতটা আনন্দ ও এতটা আবেগ হইয়াছিল যে তিনি "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া, নগ্নদেহে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। এই সকল মহাজনও কি একটা দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া জগতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলন। বুদ্ধ নিরঞ্জন নদীর তীরে বহুকাল তপস্যায় যাপন করিলেন, কিন্তু যেদিন সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেদিন বারাণসীতে পঞ্চ শিষ্যের উদ্দেশে ধাবিত হই-লেন; "তোমরা শোন আমি নূতন আলোক পাইয়াছি।" পথে

যে তাঁর সংস্রবে আসে, সেই পরিবর্ত্তিত হয়। যীশু চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি একান্তে যাপন করিয়া যেদিন সিদ্ধিলাভ করিলেন, সে দিন মহোৎসাহে ফিরিয়া আসিলেন,—বলিলেন,—"হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব"। যাহাকে ধরেন, সেই বদলিয়া যায়। দুইজন ধীবর ভ্রাতা এক স্থানে থাকিত, যীশু তাহাদের ভবনে একরাত্রি বাস করিলেন, তাহাদের কাণে কি মন্ত্র দিলেন, পরদিন তাহারা উভয়ে জাল ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে যে দিন সিদ্ধি লাভ করিলেন, সে দিন আর পর্ব্বতকন্দরে থাকিতে পারিলেন না। মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর, "লা এল্লা ইল্লিহা—একমাত্র সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই,—লা সরিক, তাঁহার অংশী নাই"। যে তাঁহার সংশ্রবে আসে সেই বদলিয়া যায়।

একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি ইহারা কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, এবং কিসের গুণে এত মানুষ বদলিয়া গেল। ভিতরকার কথাটা একই,—যাহা তুমি আমি আজও বলিতেছি। বুদ্ধ বলিলেন—"মানবের কার্য্যের উপরে মহাধর্ম্ম নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে সত্য বলিয়া জান, ও বাসনাবিলয় করিয়া তাহার অধীন হও।" যীশু বলিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের পিতা, এ রাজ্য তাঁহারি রাজ্য, তোমরা সমগ্র মন, সমগ্র হৃদয় ও সমগ্র শক্তির সহিত তাঁহাকে প্রীতি কর ও তাঁহার ইচ্ছাতে

আত্ম-সমর্পণ কর। মহম্মদ” বলিলেন—“মহান্ প্রভু পরমেশ্বর, জগত তাঁহারই রাজ্য, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আজ্ঞাধীন হও।” কথাটা কি একই নয়? সকলেরই উক্তির মধ্যে দুইটী সার কথা পাওয়া যাইতেছে; প্রথম কথা এই, এ জগতে মানুষ কর্ত্তা নহে; তাহার উপরে আর এক শক্তি আছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকে ও মানবের ভাগ্যকে নিয়মিত করিতেছে; দ্বিতীয় কথা এই, প্রবৃত্তি-কুলকে সংযত করিয়া, আত্ম-বিলোপ করিয়া, সেই শক্তির অনুগত হওয়াই মানবের পক্ষে সদ্গতি। দেখিতেছি ইন্দ্রিয়াতীত শাসন-শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রবৃত্তিকুলকে সেই শাসনের অনুগত করা, এই দুইটীই সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধুর সাধনের ভিতরকার কথা। ইহা মানব-প্রকৃতির একটা গূঢ় রহস্য? যে, যাহারা মানবকে যথেচ্ছাচার করিতে বলিয়াছে, প্রবৃত্তিকুলের অনিয়ত চরিতার্থতার উপদেশ দিয়াছে, তাহারা মানবের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু যাঁহারা মানবকে আত্ম-সংযমের উপদেশ দিয়াছেন,—বলিয়াছেন “উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে বাধ্য ও ধর্ম্মশাসনের অনুগত কর,” তাঁহারাই হিতৈষী বন্ধু ও আচার্য্য, উপদেষ্টা বা গুরুরূপে গৃহীত হইয়াছেন। সর্ব্বদা দেখি স্বাধীনতা জীবের প্রিয়। পক্ষীটী আপনার মনে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে, হঠাৎ তাহাকে ধর, বন্দী কর, স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে সে নিজের পদ-দ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তথাপি সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে না! শিশুটী আপনার মনে খেলিতেছে, তাহার হস্ত দুখানি ধর, তাহার

স্বাধীনতাতে বাধা দেও দেখিবে, কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই সে কাঁদিয়া উঠিবে। জীব স্বাধীনতা চায়। কেন তবে "প্রবৃত্তিকুলকে সংযত কর" সাধুদের মুখে এ উপদেশ শুনিতে ভাল লাগে? —কেন এই এক বিষয়ে ও এক স্থানে আমরা আনুগত্য ও দাসত্বকে এত স্পৃহণীয় মনে করি? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বর আমাদের আত্মাতেই সন্নিহিত রহিয়াছেন? আমাদের স্বরূপের সহিত তাঁহার স্বরূপ মিশ্রিত বলিয়াই আমাদের ঊর্দ্ধদিকে গতি, সংযমের প্রতি আমাদের এত নিষ্ঠা।

আমাদের হৃদয়ের উপরে সাধু মহাজনগণের যে এত প্রভাব তাহারও মুল এই খানে। আমাদের প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক পারমার্থিকতা আছে, তাঁহারা তাহারই মুখপাত্র। এই জন্য তাঁহাদের এত আদর। আমরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থাতে হৃদয়ে যে সর্ব্বোচ্চ ভাব ধারণ করি, তাঁহাদের মধ্যে তাহাই প্রতিফলিত দেখি, এই জন্য আমাদের চিত্তের উপরে তাঁহাদের এতটা শক্তি। তুমি যদি আমাকে ক্ষুদ্র কথা বল, ক্ষুদ্র আদর্শ দেখাও, ক্ষুদ্রে আসক্ত কর; তুমি আমারই মত একজন দুর্ব্বল মানুষ,—তোমার বন্ধুতা না থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত; যাঁহারা আমার চিত্তকে ক্ষুদ্র বিষয় হইতে তুলিয়া মহৎ বিষয়ের অনুধ্যানে নিযুক্ত করেন, আমাকে প্রবৃত্তিকুলের উপরে জয়শালী করিয়া প্রকৃত স্বাধীন জীব করিতে চান, তাঁহারাই আমার হৃদয়ের রাজা, আমার মন সহজেই তাঁহাদের চরণে অবনত হয়। এই জন্য মানবহৃদয়ের উপরে মহাজনদিগের এত প্রভাব।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমরা মানবজীবনের মহত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করি, ও আমাদের উচ্চপ্রকৃতিকে খুঁজিয়া পাই। এই মহৎকার্য্য যাঁহারা সম্পাদন করেন, তাঁহারা কি জগতের, মহোপকারী বন্ধু নহেন ?

শাস্ত্রের সাক্ষ্য।

আমাদের দেশের প্রাচীন পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল পারমার্থিক বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও একজন ঋষি ঐ সকল উপদেশের বক্তা; তিনি ব্যাসের নিকট শুনিয়াছেন; ব্যাস নারদের প্রমুখাৎ পাইয়াছেন; নারদ স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছেন! এইরূপে অধিকাংশ উপদেশরই মূল বক্তা ব্রহ্মা। বেদ ব্রহ্মার মুখবিনিঃসৃত বাণী। এরূপ বিশ্বাস যে কেবল এদেশেই আছে, তাহা নহে. অপরাপর সম্প্রদায় মধ্যেও এই প্রকার বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়: য়িহুদীরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা যে ধর্ম্ম নিয়মের অধীন তাঁহাদের আদি পুরুষ মুষা তাহা স্বয়ং ভগবানের মুখে শুনিয়াছিলেন। ইসলামধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন, যে কোরাণের সুরা সকল স্বয়ং ভগবান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। জরথস্ত্র বলিয়াছেন, যে আহুর। মাজদা তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে সর্ব্ব দেশে ও সকল জাতি মধ্যে এই বিশ্বাস দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাই ধর্ম্মতত্ত্বের চরম উৎপত্তি স্থান; এবং তিনিই তাহা সাধুদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এ কথা কি সত্য নহে? জগতের সকল তাপের উৎপত্তি স্থান

যেমন সূর্য্য, তেমনি সকল জ্ঞানের উৎপত্তি স্থান সেই পরমাত্মা। আমার ঘরে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বলে, তোমার ঘরে একটী বড় ল্যাম্প জ্বলে, কুম্ভকারের চূল্লীতে মহা অনল জ্বলে, অরণ্য মধ্যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে, অগ্নিকে যে আকারে, যে মাত্রায়, যেখানেই দেখ না কেন, সকলের আদি করণ ঐ সূর্য্য, তেমনি জ্ঞানকে যে আকারে যে মাত্রায় যে পাত্রেই দেখ না কেন, সকলের উৎপত্তি স্থান সেই জ্ঞানময় পুরুষ। এ কথাটা যাঁহার কিছু অতিরিক্ত বোধ হইতেছে, তিনি একবার নিবিষ্টচিত্তে কোনও একটা জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করুন। কল্পনা করুন যে, একজন নূতন লোক কোনও এক ভবনে আসিয়া একটী অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; গৃহ মধ্যে কি আছে তাহা জানেন না। আলোকটী যখন আনীত হইল, তখন দেখিলেন একপার্শ্বে একখানি খাট আছে, একদিকে একটী কলসীতে জল আছে, একটী গ্লাস আছে, একটী বাতি ও দেশলাই আছে, একপার্শ্বে একটী আলনা আছে। দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, আলনাতে পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া রাখিয়া জলপান পূর্ব্বক খাটখানিতে শয়ন করিতে হইবে। এ জ্ঞানের কতটুকু তাঁহার সৃষ্টি? ঘরের জিনিসগুলি তিনি আনেন নাই, আলোটী তাঁহার সৃষ্ট নহে, চক্ষের দৃষ্টি শক্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, জলে যে তৃষ্ণা যায়, খাটে যে শুইতে হয়, ইহাও পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞান, তিনি কার্য্যে লাগাইলেন এই মাত্র। আমরা এ ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু জ্ঞান লাভ করিতেছি, তাহা কি এইরূপ নহে? দ্রষ্টব্য

পদার্থ, আলোক ও চক্ষের দৃষ্টি শক্তি, এই তিনের সংযোগে দর্শন জ্ঞান হয়, ইহার কোনটীই আমাদের কৃত নহে, আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। তৎপরে আমাদের মন এক কার্য্য করে, দৃষ্ট পদার্থ সকলকে তুলনা করিয়া সাদৃশ্য নিরূপণ করে, ও তাহাদিগকে জাতিতে বিভক্ত করে, সেটীও মনের প্রকৃতিসিদ্ধ, আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। দুইটী মাত্র কার্য্য আমাদের ইচ্ছাধীন। পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞানের সমাবেশে জ্ঞানান্তরে প্রবিষ্ট হওয়া, এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞানকে কার্য্যে নিয়োগ করা। অতএব দেখ, লৌকিক কি পরমার্থিক কোনও জ্ঞানই আমাদের কৃত নহে, সকলেরই উৎপত্তি স্থান সেই পরমাত্মা।

কিন্তু লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে মানুষ চিরদিনই একটা প্রভেদ করিয়া আসিতেছে। বলিতে গেলে জ্ঞানের মধ্যে আবার প্রভেক কি? সকল জ্ঞানই পবিত্র, সকল জ্ঞানই পরমাত্ম-জাত ও জীবের কল্যাণোদ্দেশে বিসৃষ্ট। তবে যে জ্ঞান কেবল এই দেহ-রাজ্যে আবদ্ধ ও দৈহিক-সম্বন্ধ-সংস্পৃষ্ট এবং এই ভৌতিক জগতের সীমার মধ্যেই নিয়মিত, তাহা অপেক্ষা যে জ্ঞান দেশ কালাতীত ও সেই অক্ষর অবিনাশী পুরুষের সহিত সংস্পৃষ্ট, তাহা যে মহত্তর তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে জড়ের পর উদ্ভিদ, উদ্ভিদের পর জীব, জীবের পর চৈতন্য, চৈতন্যের পর ধর্ম্মবুদ্ধি, এইরূপ যতই আমরা উচ্চতর মঞ্চে আরোহণ করি, ততই দেখিতে পাই, যে যেটী উচ্চতর

তাহার প্রয়োজনের দ্বারা নিম্নতরটীকে নিয়মিত করিতে হয়। জীবনের প্রয়োজনানুসারে জড়, চৈতন্যের প্রয়োজন অনুসারে জীবন, ও ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজনানুসারে চৈতন্যকে রাখিতে হয়। সেইরূপ পারমার্থিকের প্রয়োজন দ্বারা লৌকিককে নিয়মিত করিতে হয়, সুতরাং পারমার্থিক উচ্চ ও লৌকিক নিম্ন।

মানব-বুদ্ধিতে এই স্বাভাবিক সংস্কার প্রবল থাকাতে, যুগে যুগে মানব-মণ্ডলী লৌকিক জ্ঞানের উপরে পারমার্থিক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। শেষোক্তটীকে ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া অপরটীকে উপেক্ষা করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, পারমার্থিক জ্ঞান কিরূপে মানবের নিকট অভিব্যক্ত হইল? বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে একটী মহা ইষ্টজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল ভাষান্তরিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হস্তে পড়িয়াছে। এই সকল গ্রন্থের তুলনা ও বিচার দ্বারা একটী মহাসত্য দিন দিন মানুষের মনকে অধিকার করিতেছে' সেটী, এই, পণ্ডিতেরা ধরাপৃষ্ঠকে যেমন গ্রীষ্ম মণ্ডল; নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডল, হিম-মণ্ডল প্রভৃতি নানা মণ্ডলে বিভাগ করিয়াছেন, এবং এক এক মণ্ডলে যেমন বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মণ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষেই অন্বেষণ কর, আর আমেরিকাতেই অন্বেষণ কর, যেমন অনেক সময়ে এক এক বিশেষ জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী পাইবে, সেইরূপ মানবের ধর্ম্ম-চিন্তাতেও যেন

এক একটী মণ্ডল আছে। যে কোনও দেশে বা যে কোনও জাতিমধ্যে যে কেহ মণ্ডল-বিশেষে আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই যেন এক প্রকার নব সত্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ মধ্যে যে সকল সাধু সজ্জনের উক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে জন্মিয়াও অনেক সময় একই প্রকার সত্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে চিন্তা ও ভাষাতে এতই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে, একটীকে অপরটীর অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ঈশ্বর যে মানব-হৃদয়ে সত্যকে অভিব্যক্ত করেন, তাহার একটা নিয়ম আছে। যিনি যেখানে অজ্ঞাতসারে এই নিয়মকে পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে সত্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিয়ম যে কি তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। এই কার্য্যের কঠিনতা অনুভব করিয়াই মহাত্মা যীশু বলিয়াছিলেন—"বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, তুমি কেবল তাহার শব্দই শ্রবণ কর, কিন্তু বলিতে পার না, কোথা হইতে তাহা আসিতেছে ও কোনদিকে তাহা যাইতেছে ; পরমেশ্বরের প্রেরণাধীন প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ।" বাস্তবিক মানবের কার্য্যের মধ্যে এই প্রকার অনির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতা আছে, যাহার উপরে আমরা প্রকৃতির অপরাপর বিভাগের ন্যায় সুদৃঢ় নিয়ম স্থাপন করিতে পারি না। দশ বৎসর পরে কোন্ দিন কোন্ক্ষণে সূর্য্যগ্রহণ হইবে তাহা এখন গণিয়া বলিতে পারি, কিন্তু মানব-সমাজের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কিছুই স্থিরতররূপে

বলিতে পারি না। কার্য্য কারণ চিন্তা করিয়া যখন ভাবিতেছি এক প্রকার ঘটিবে, তখন হয়ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটিয়া গেল। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তাহাই যখন আমাদের নির্দ্দেশের ও নিয়মের বাহিরে রহিল, তখন আত্মার নিভৃত কন্দরে আত্মা পরমাত্মাতে যে মিলন ও সেই মিলনজনিত যে ফল তাহা কিরূপে আমাদের নির্দ্দেশ ও নিয়মের অধীন হইবে?

যাহা হউক, কি নিয়মে পারমার্থিক সত্য মানব-হৃদয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও আংশিকরূপে তাহার নিয়ম কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে, যে ব্যক্তির নিকট পারমার্থিক সত্য অভিব্যক্ত হইবে, তাঁহাতে আর কিছু থাকুক না থাকুক পবিত্রচিত্ততা থাকা চাই। পবিত্রচিত্ততার অর্থ অভিসন্ধির সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা। যে ব্যক্তি সত্যের জন্যই সত্যকে আশ্রয় করে ও ঈশ্বরের জন্যই তাঁহাকে অন্বেষণ করে তাহার অভিসন্ধি বিশুদ্ধ। অভিসন্ধির এই বিশুদ্ধতা না থাকিলে প্রেম জাগে না, মানুষ ভক্তির অধিকারী হয় না। মানুষে মানুষে যে ভালবাসা, পুরুষে নারীতে যে ভালবাসা, তাহাও যখন চিত্তের পবিত্রতা ভিন্ন জাগে না, তখন ভগবদ্ভক্তি কিরূপে জাগিবে? পবিত্র চিত্ততার পরেই আর একটা দেখা যায়, তাহা ঐকান্তিকতা। ঐকান্তিকতার অর্থ, না হইলেই নয়, মনের এই প্রকার জেদ। আমাদের দেশের সাধুগণ চিরদিন এই উপদেপ দিয়াছেন যে ভগবান এই জেদের বশবর্ত্তী। তিনি জেদের হাত এড়াইতে

পারেন না। এই সত্য বুঝাইবার জন্য অনেক আখ্যায়িকা রচনা করা হইয়াছে। তাহার একটী বলিতেছি—এক ব্রাহ্মণের গৃহে এক দেবমূর্ত্তি ছিল; ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তিকে প্রতিদিন অর্চ্চনা করিতেন। একবার কোনও কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণের গ্রামান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি আপনার নবোপনীত অষ্টম বর্ষীয় পৌত্রকে বলিয়া গেলেন, "রাত্রে দুধ ও মিষ্টান্ন ঠাকুরকে দিস্ ও আরতি করিস।" তদনুসারে বালক সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের আরতি করিল ও দুধ ও মিষ্টন্ন ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর দুধ খাও।" কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিল, ঠাকুর দুগ্ধ পান করেন না, তখন বলিল, "তুমি দাদার দুধ খাও, আমার কাছে কেন খাবে না; দাদা যে তোমাকে দুধ দিতে বলেছেন, তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছ? কেন তুমি দুধ খাও না? দুধ খাও।" তাহাতেও ঠাকুর দুধ খাইলেন না। তখন বালক করযোড় করিয়া বলিল, "যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে মাপ কর, দুধ খাও।" ঠাকুর তাহাতেও দুধ পান করিলেন না; তখন সে কাঁদিতে লাগিল, ও ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল, "ঠাকুর অপরাধ মাপ কর, দুধ খাও।" ঠাকুর তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। শেষে বালক উঠিয়া গেল, ও একখানি ধারাল ছুরিকা আনিয়া বলিল, "ঠাকুর দুধ খাও ত খাও, নতুবা তোমার সমক্ষে গলায় ছুরি দিয়া মরিব।" এই বলিয়া যেমন গলে ছুরি দিতে যাইবে, অমনি

ঠাকুর বাম হস্তে সেই শিশুর হাত ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে দুধের বাটী তুলিয়া মুখে দিলেন।

আমরা সকলেই জানি এ সকল আখ্যায়িকা অমূলক ও মনঃকল্পিত, কিন্তু আখ্যায়িকাকারের উদ্দেশ্য যাহা তাহা অনুভব করিতে পারা যাইতেছে। পবিত্রচিত্ততাতে শিশু হইতে হইবে, ও প্রাণান্তিক জেদ করিয়া ভগবানকে ধরিতে হইবে। এই দুইটীর একত্র সমাবেশ হইলেই বোধ হয়, ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বর সে হৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব অভিব্যক্ত করিতে থাকেন।

এইরূপে সময়ে সময়ে সাধুহৃদয়ে যে সকল পারমার্থিক তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই বংশপরম্পরাক্রমে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইতেছে; এক একখানি শাস্ত্র এক একটী জাতির রত্নাগার স্বরূপ। যিনি যে কিছু রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তিনি তাহা ঐ রত্নাগারে রাখিয়া গিয়াছেন। এইখানেই আবার মানুষের এক মহা বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে, যাহা অপর প্রাণীতে দেখা যায় না, এবং পশুপ্রায় বর্ব্বর মানবেও দেখা যায় না। সেটী এই, পূর্ব্বপুরুষ-প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পত্তির সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন। ইহার গুণেই মানব-সমাজের সভ্যতা সম্ভব হইয়াছে। কখনও শুনি নাই যে, বর্ত্তমান বংশীয় ব্যাঘ্রেরা পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষ ব্যাঘ্রদিগের আদেশ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিতেছে; ইহা কেবল মানুষেই সম্ভব।

প্রাচীনের প্রতি এই নিষ্ঠার উপরেই শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত

যদিও স্থল বিশেষে এই নিষ্ঠা অতিরিক্ত মাত্রায় গিয়া মানবের স্বাধীন-চিন্তার গতি রোধ করিতেছে, এবং সর্ব্ববিষয়েই মানব-সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তথাপি ইহা না থাকিলে মানব-সমাজ অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু হারাইত; এক পুরুষের কীর্ত্তি আর এক পুরুষে বিলুপ্ত হইত; এবং জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সোপান-পরম্পরা থাকিত না।

পারমার্থিক-তত্ত্ব-বিষয়ে এই নিষ্ঠা ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছে। সে বিষয়ে ইহার কার্য্য দেখিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরের প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া যেন চারি দিকে সত্য ছড়াইয়া গিয়াছেন; আর মানবজাতি যেন একটী ঝুড়ী লইয়া সেগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে পশ্চাতে আসিয়াছে; এবং খনিজ ধাতুসংগ্রহ বিষয়ে যাহা প্রতিদিন ঘটে, তাহা এ বিষয়েও ঘটিয়াছে। যখন স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু সকল খনি-গর্ভ হইতে উদ্ধৃত হয়, তখন তাহাদিগকে একেবারে পরিষ্কৃত অবস্থাতে পাওয়া যায় না; তৎসঙ্গে মৃৎ পাষাণ প্রভৃতি অনেক প্রকার অপর পদার্থও মিশ্রিত থাকে; কিন্তু মানুষ স্বর্ণের লোভে স্বর্ণ-মিশ্রিত মৃৎ পাষাণকেও যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া যায়; সেইরূপ সাধুগণের পারমার্থিক উপদেশ মানব-জাতি এতই মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, যে তাহার অনুরোধে তৎসহ মিশ্রিত অনেক অপকৃষ্ট পদার্থও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

শাস্ত্রের অধীন হওয়াকে কেহ কখনও দাসত্ব মনে করে নাই।

মানবহৃদয়ের উপরে ধর্ম্মের যে এই শক্তি ইহা মানব-প্রকৃতির একটা গূঢ় রহস্য। অল্প লোকে আইন আদালত জেল প্রভৃতি স্থাপন করে, অধিকাংশ লোকে সেই শাসনের অধীন থাকে। যাঁহারা বলেন, জগতে প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র লোকেরই সংখ্যা অধিক, তাঁহাদের এটা চিন্তার বিষয়, কেন অধিকাংশ লোকে অল্পাংশ লোকের শাসনের অনুগত থাকে? কোনও সমাজের দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোকগুলি একত্র হইলে ত সৎ লোকগুলিকে শাসনাধীন রাখিয়া নিজেরা যথেচ্ছাচার করিতে পারে। কেন তবে তাহারা তাহা করিতে পারে না? হয় বল অধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে তাহার আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্র হইতে দেয় না; না হয় বল, ধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে ধর্ম্মের নামে সাজা দিলে মানুষের নিজের মন বলে এ "এ মার, মানুষের নহে, ইহা ধর্ম্মের মার," সুতরাং তদ্বিরুদ্ধে উত্থান করার সাধ্য থাকে না। আমার বোধ হয়, দুই কথার মধ্যেই সত্য আছে। ধর্ম্ম ঈশ্বরের স্বরূপ, সুতরাং অধর্ম্ম যাহা তাহা তদ্বিরুদ্ধ ও তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সত্য অনুভব করিয়াই ঋষিগণ বলিয়াছেন ;—

সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।

অর্থ—"যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়; অর্থাৎ মূলবিহীন বৃক্ষের যেমন এ জগতে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি অসত্য বা পাপের এ জগতে বাঁচিবার উপায় নাই। অধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; এজন্য ঈশ্বরের বিধি এই, অধর্ম্মকে

লইয়া কিছু গড়িবে না; অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া মানুষ দাঁড়াইবে না; অল্প-সংখ্যক ধার্ম্মিকের সমক্ষে বহু সংখ্যক অধার্ম্মিককে চির দিনই কম্পিত হইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথাও সত্য; ধর্ম্ম মানব-প্রকৃতির অন্তর-নিহিত এমনি জিনিস, যে আমি তোমার কাজ দেখিয়া তোমাকে ধিক্কার দিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই তোমার প্রকৃতি আমার কথায় সায় দিতেছে; ও তোমাকে ধিক্ ধিক্ করিতেছে; আমি তোমাকে মারিলে তোমার প্রকৃতিই বলিতেছে "এ মার মানুষের নয়, এ ধর্ম্মের মার" তখন আর তুমি আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিবে কিরূপে? তোমার হৃদয়বাসী ঈশ্বর আমার হৃদয়বাসী ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া তোমাকে দৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিতেছেন; তুমি মুখে যতই স্বাধীনতার অহঙ্কার কর না কেন, জানিও তুমি অন্তরে অন্তরে ধর্ম্মের মহাশাসনের অধীন।

ইহা সত্য যে, ঈশ্বর যুগে যুগে মানবের নিকটে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ও মানব-হৃদয়ে পারমার্থিক তত্ত্ব সকল উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল ঈশ্বরোদ্ভাসিত সত্য কি দেশ বিশেষে বা জাতিবিশেষে বদ্ধ? তাহা নহে। তাহা সমগ্র মানবজাতিরূপ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। নানা মন্ত্র নানা ঋষির নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া বেদ সংহিতা সংকলিত হইয়াছে; নানা গ্রন্থ নানা দিক হইতে সংগ্রহ করিয়া, বর্ত্তমান বাইবেল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে; নানা জনের নিকট হইতে সুরা সকল একত্র করিয়া বর্ত্তমান কোরাণ গ্রন্থ নিবদ্ধ হইয়াছে।

জগতের মহাবেদ, মহাবাইবেল, বা মহাকোরাণ সংকলনের দিন আসিতেছে, যে মহা কার্য্যে জগতের সকল জাতির ও সকল যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সহায়তা করিবে। তখন আমরা আর দেশ বিশেষের বা জাতিবিশেষের গ্রন্থবিশেষকে ঈশ্বর-প্রদত্ত শাস্ত্র বলিয়া অপর সকলকে উপেক্ষা করিব না; কিন্তু জগতের সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে সেই পুণ্যস্বরূপের দেদীপ্যমান প্রমাণ পাইব। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্ শাস্ত্র ঈশ্বর-প্রণোদিত তাহা কিরূপে চিনি? তদুত্তরে প্রশ্ন, জড় জগতের কোন্ পদার্থ কিরূপ তাহা কি করিয়া চেন? বলিবে যে, আলোকের সাহায্যে। আমি বলি পরমার্থতত্ত্বও তাঁহারি মঙ্গলালোকে চিনিবে। তুমি ঈশ্বরের প্রেরণা না পাইলে অপ-রের প্রেরণা বুঝিবে কিরূপে? ঈশ্বর-প্রীতি তোমার হৃদয়ে বাস করিয়া চক্ষে আলোক দিলে, তবে তুমি পরমার্থ তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইবে। তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ, তুমি নিজে তাহা হও, তবে তাহা দেখিতে পাইবে। ধর্ম্ম রাজ্যের এই একটা মহা নিয়ম যাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর করুন ইহা আমাদের মনে থাকে।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ কি ?

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দুই প্রকার আতিশয্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রথম আতিশয্য বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাতে দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয় অতিশয্য ভারতের প্রাচীম ধর্ম্মভাব ও ইউরোপের মধ্য যুগের ধর্ম্মভাবের মধ্যে পাওয়া যায়। এই জগতকে ও মানব-জীবনকে দুই দিক্ দিয়া দেখিতে পারা যায়। প্রথম, জগতের দিক্ দিয়া অর্থাৎ এই দেহ ও দৈহিক সুখ দুঃখের দিক দিয়া; দ্বিতীয় আত্মা ও আত্মার উন্নতি অবনতির দিক দিয়া। প্রথম, আমরা এখানে এই ভাবে বাস করিতে পারি, যাহাতে বোধ হয় আমাদের বিবেচনায় এই জড় জগত ও এই দেহই সর্ব্বেসর্ব্বা এবং আত্মাটা গণনার মধ্যেই নহে; আবার আমরা এভাবেও থাকিতে পারি যাহাতে বোধ হয় আত্মা এবং আধ্যাত্মিক বিষয় সকলই সার; জগত ও দেহ অনিত্য ও অসার এবং উপেক্ষার যোগ্য।

এই দুই ভাব পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাতে আমরা একটী ভাব অতিরিক্ত মাত্রাতে দেখিতে পাই; ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম ভাবে অপরটীর আতিশয্য দেখা যায়। উভয়ের তুলনায় বিচার করিলে প্রকৃত গন্তব্য

পথ নির্ণয় করিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু তুলনায় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার দৈহিক-ভাব-প্রধানতা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে সেই সভ্যতার বর্ত্তমান মুখ্য ভাব বা গতিকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে; ইহার মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট ও আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে, এবং যে সকল মহদনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা বা বিস্মৃত হওয়া উদ্দেশ্য নহে; কিংবা ইহার গতি যে চিরদিন এরূপ থাকিবে তাহা বলাও অভিপ্রায় নহে। কিন্তু মানব-চরিত্র বিচারের স্থলে যেমন কে কোন্ দিন একটা ভাল কথা বলিয়াছে, বা একটা ভাল কাজ করিয়াছে তদ্দ্বারা চরিত্রের বিচার হয় না; কিন্তু তাহার সমগ্র চিন্তা ও কাজের সাধারণ গতি কোন দিকে তদ্দ্বারাই বিচার হয়, তেমনি মানব-ইতিহাসের কোনও একটা যুগের বিশেষ ভাবের বিচার করিতে হইলে, সে সময়কার মানুষের মনের প্রধান গতিটাকেই নিরূপণ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ইউরোপের মধ্যযুগের অতি-রিক্ত আধ্যাত্মিকতার প্রতিক্রিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ মধ্যযুগের ধর্ম্মসমাজ সকল আধ্যাত্মিকতার নামে অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন; শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জ্ঞানের পথ

অবরোধ করিয়াছিলেন ; বিশ্বাসের দোহাই দিয়া স্বাধীনচিন্তার প্রসার বন্ধ করিয়াছিলেন ; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে ঘোর নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের দোহাই দিয়া দেহকে অকারণ নিগ্রহ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে বোধ হয় তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে ; মানুষ জ্ঞান, স্বাধীনচিন্তা ও দৈহিকসুখকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি ক্রমে ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতি। বিজ্ঞানের অদ্ভুত বিকাশ ও মানবের জ্ঞানের অসীম উন্নতি বর্ত্তমান সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ। যে ঊনবিংশ শতাব্দী অবসান-প্রায়, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ও মানবের শক্তিসামর্থ্য যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহা একসঙ্গে ধারণ করিতে গেলে হৃদয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়! অথচ এই মহা বিশাল জ্ঞান আমাদিগকে কি বলিতেছে ? ইহা আত্মার কোনও সংবাদ দেয় না। বিজ্ঞান বলিতেছে আত্মা আছে কি না আছে সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমি যে রাজ্যে কার্য্য করিতেছি, আমি যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি, তন্মধ্যে আত্মার উদ্দেশ কোথাও পাই না। আমি যে সকল বিষয়ের বিচার ও পরীক্ষা করি, তাহাদিগকে পরিমাণ করা যায় ; ওজন করা যায় ; ব্যবচ্ছেদ করা যায় ; ইন্দ্রিয়-গোচর করা

যায়; তন্মধ্যে আত্মার প্রমাণ কোথাও নাই। আর ইহাও যুক্তিযুক্ত কথা যে পদার্থ-বিদ্যার প্রধান আলোচ্য জড় পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম; সুতরাং তন্মধ্যে আত্মার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পদার্থ-বিদ্যার অতিরিক্ত আদর এবং মনোবিজ্ঞান ও আত্ম-বিজ্ঞানের অনাদর হওয়াতে মানুষ আত্ম-তত্ত্বের প্রতি অন্ধ হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ এই ভাব এতদূর লইয়া গিয়াছেন, যে বলিয়াছেন জড়ের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছুই নাই! জড়ীয় পরমাণু ও গতি এই উভয় হইতেই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। গতি কোথা হইতে আসিল? সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, জড়ীয় পরমাণু ও গতি উভয়ের ক্রীড়াক্ষেত্রে চৈতন্য কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? তাহা হইলে ইঁহারা বলিবেন, গতি ও তাপ প্রভৃতির ন্যায় চৈতন্যকেও জড়ের এক প্রকার ধর্ম্ম ভাবিলেই হয়। এরূপে জড় ও চেতনের প্রভেদ ঘুচাইয়া দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যত দিন তাঁহারা জড় হইতে গতি ও তাপ প্রভৃতির ন্যায় চৈতন্যকেও উৎপন্ন করিতে না পারিতেছেন, তত দিন চৈতন্য যে জড়ের ধর্ম্ম, তাহা বলিবার অধিকার নাই। যাহা হউক বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের প্রকৃতি এই যে, ইহা আত্মাকে অস্বীকার করিয়া ও বিস্মৃত হইয়া কার্য্য করে। তৎপরে এই জ্ঞানের গতিও পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের দিকে। আত্মার কোমল শান্ত ভাব গুলির চালনার

প্রতি ইহার অনাস্থা ও পদার্থ সকলের গুণাবলীর পরীক্ষার দিকেই সম্পূর্ণ আস্থা।

বর্ত্তমান সভ্যতার জ্ঞান যেমন আত্ম-জ্ঞান-বিহীন, ইহার সমুদয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতিও তেমনি মূলে দৈহিক-সুখ-লালসা-সম্ভূত। সভ্যজগতের মানুষ মানবজীবনকে ভোগ-সামগ্রীর দ্বারাই বিচার করে ; অর্থাৎ ভোগ-সামগ্রী যাহার যত অধিক তাহার জীবন তত সার্থক। তুমি যদি বসিবার জন্য ইজী চেয়ারখানি না পাইলে, তোমার বৈঠক ঘরটী যদি প্রচলিত রীতির অনুসারে সাজাইতে না পারিলে, তোমার দ্বারে যদি জাপানিজ পরদা ঝুলাইতে না পারিলে, গৃহের প্রাচীরে ভাল ভাল ছবি যদি না দিতে পারিলে, সিংহলের শম্বুক, আরবের প্রবাল, হাতীর দাঁতের পাখা, জাপানের হাঁড়ি, যদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, তবে তোমার জীবন সার্থক হইল না, তাহা ঘোর দুঃখময় রহিল। এ জগতে জন্মিয়া যতটা দৈহিক সুখভোগ করিতে পারা যায়, করিতে হইবে ; তাহার ব্যাঘাত হওয়াই সর্ব্বপ্রধান দুঃখ।

সুখভোগের সামগ্রীর দ্বারা জীবনকে বিচার করে বলিয়াই বর্ত্তমান সভ্যতাতে মানবের চক্ষে দুইটী মহা দুঃখ, সে দুটী দরিদ্রতা ও ব্যাধি। এই দুইটী নিবারণের জন্য যত প্রয়াস, পাপ ও দুর্নীতি নিবারণের জন্য সে প্রয়াস নাই। সহস্র সহস্র নরনারী পাপে ডুবিতেছে সে জন্য তত দুঃখ নাই ; কিন্তু লণ্ডন সহরের ন্যায় অনেক মহা নগরের বহুসংখ্যক নরনারীকে কখনও

কখনও একবেলা অনাহারে থাকিতে হয়, ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর হইতে পারে না। পাপাসক্তি ও দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন হাজার পরিবার যে বিপদের আলয় হইতেছে, অনেক রমণীর প্রাণ তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে দুঃখ নাই ; কিন্তু প্লেগে ধরিয়া দশটা লোক যদি তিন দিনের মধ্যে মারা যায়, তবে আর রক্ষা নাই। সমগ্র সভ্যজগতে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে।

দরিদ্রতা ও ব্যাধি যে মানবের দুঃখ নহে, অথবা তন্নিবারণের চেষ্টা যে কর্ত্তব্য নহে, এরূপ বলা অভিপ্রায় নয়। মানবের অপরাপর দুঃখের মধ্যে এগুলিও দুঃখ, ইহাদের নিবারণের প্রয়াসও কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে সহায়তা করা ধার্ম্মিকগণের একটী প্রধান কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বর্ত্তমান দহিকসুখ-প্রধান সভ্যতার চক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই, ইহা প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে যে কিছু আন্দোলন ও সামাজিক বিপ্লব দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যেও এই দৈহিক-সুখভোগ-লালসা প্রবল দৃষ্ট হয়। সোসিয়ালিষ্ট, এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি যত কিছু বিপ্লবকারী দল দেখা দিতেছে, সকলের ভিতরকার ভাব এই, জগতের ভোগসামগ্রী কতিপয় ব্যক্তিতে ভোগ করিবে কেন ? কেন সর্ব্বসাধারণে তাহা পাইবে না ? এ কথাটা যে মন্দ তাহা নহে ; জগদীশ্বর যে এজগতকে ধন ধান্যে পূর্ণ করিয়াছেন তাহা কি কতিপয় ব্যক্তির জন্য ? সুমিষ্ট ফলটী কি

দরিদ্রেরও খাইতে ইচ্ছা করে না ? সুন্দর ফুলটীর আঘ্রাণ কি তাহারও লইতে ইচ্ছা করে না ? কিন্তু সুমিষ্ট ফলটী বা সুন্দর ফুলটীর দিকে তাহার হাত বাড়াইবার যো নাই ; ধনীরা তাহা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন ; হস্ত বাড়াইলেই বলিতেছেন, "যা যা ও সব তোদের জন্য নয় ; আমরা খাইয়া, ফেলিয়া, ছড়াইয়া যাহা পথে ফেলিয়া দিব, তাহা তোরা কুড়াইয়া খাইবি।" এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা যে পর-দুঃখ-কাতর হৃদয়ের পক্ষে বড়ই দুঃখ-দায়ক তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু মানবের পক্ষে সুমিষ্ট ফলটী খাইতে না পাওয়াই কি সর্ব্ব-প্রধান দুঃখ ? বর্ত্তমান সভ্যতার ভাব বলিতেছে "হাঁ" তাহাই, এইটুকু ইহার প্রকৃতি।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে রাজনীতি বিষয়ে যে কিছু আন্দোলন হইতেছে, তাহার ভিতরেও প্রধান ভাব এই যে কিছু পাইতে হইবে ;" স্বসুখপরতা ইহার মূলভিত্তি। এ জগতে যেমন কিছু পাইতে হয় তেমনি কিন্তু দিতেও হয়। কিন্তু দৈহিক সুখ-প্রধান রাজনীতি কেবল স্বত্ত্ব, অধিকার, (rights) লইয়া ব্যস্ত করে, কি দিতে হইবে, (duties) কি, সে দিকে বড় মনোযোগ করে না। এ রাজনীতি নিজের স্বত্ত্ব স্থাপনে যেরূপ মনোযোগী অপরের দুঃখ দূরীকরণে তত মনোযোগী নহে। নিজের স্বত্ত্বের মধ্যে আবার প্রবেশ করিলে দেখা যায় দৈহিক সুখভোগের অধিকার ও স্বাধীনতাই তাহার ভিতরকার প্রধান কথা।

এইরূপে সর্ব্ববিভাগেই দেখা যায়, বর্ত্তমান সভ্যতা জড়কেই

সর্ব্বেসর্ব্বা করে এবং দৈহিক সুখের প্রতিই ইহার প্রধান দৃষ্টি। এই এক প্রকার ভাবের আতিশয্য ; আবার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের ইউরোপের প্রতি ও এ দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এক প্রকার ভাবের আতিশয্য লক্ষ্য করি। এক ভাবে যেমন দেহই সার এবং দৈহিক সুখই চরম লক্ষ্য, অপর ভাবে তেমনি আত্মাই সার এবং আত্মার সুখই চরম লক্ষ্য। জগতের প্রাচীন কালের প্রায় সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যের উপরে আপনাদের সাধনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন—"এ দেহ ত অনিত্য, কৃমি ক্লেদপূর্ণ ও জরা মরণ-প্রপীড়িত, এ সংসার ত কারাবাস, হে জীব, আর কতকাল এই মোহজালে জড়িত থাকিবে? বৈরাগ্যকে আশ্রয় কর, অনিত্য দেহ ও মায়াময় সংসার উভয়কে ঘৃণা করিতে শিখ।" প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতেন, "এক কর্ম্মের জালে জড়িত হইয়া ত ভবদুঃখ সহিলে, হে জীব, দ্বিতীয় কর্ম্মের জাল আর কেন বয়ন কর? সংসারত্যাগী হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ কর, এবং নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ কর" প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিতেন—"আত্মাই ঈশ্বরের প্রিয় আবাস স্থান, দেহ শয়তানের কারখানা বাড়ী, দেহকে যতই নিগ্রহ করিবে, ততই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে। আত্ম-নিগ্রহের অর্থ দেহ-নিগ্রহ।"

এই দুই আতিশয্যের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বাস করে। ইহাতে একদিকে যেমন দৈহিক-সুখ-তৎপরতা নাই, অপর

দিকে তেমনি বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নাই, অকারণ দেহ-নিগ্রহ নাই। আত্মাতেই ইহার উৎস বটে, কিন্তু দেহকেও ইহা নিজের উন্নতির সহায় করিয়া লয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বলে ভোগ সামগ্রীর দ্বারা জীবনের বিচার নহে; কিন্তু জীবনের পূর্ণতা ও বিশালতার দ্বারাই জীবনের বিচার। ভোগের সামগ্রীর দ্বারা যদি জীবনের কৃতার্থতার বিচার করিতে হয়, তবে মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় অকৃতকার্য্য জীবন কাহারও হয় নাই। কারণ তিনি ভোগ-সুখ পায়ে ঠেলিয়াছিলেন; যীশুর ন্যায় কাহারও জীবন বৃথা যায় নাই, কারণ তাঁহার মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না; মহম্মদের ন্যায় কৃপাপাত্র আর জন্মে নাই, কারণ তাঁহার মৃত্যু কালে একটা বদনা, একটী মাদুর ও সামান্য দশ পনর টাকার সম্পাত্তির অধিক রাখিয়া যান নাই। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে সুখভোগের সামগ্রীর দ্বারা জীবনকে বিছার করিবার দিকে যার যত দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক জগতে, অমর জগতে, সে তত নিম্ন স্থান অধিকার করিবে। আর জীবনের পুর্ণতা ও বিশালতার দিকে যার যত দৃষ্টি সে তত প্রকৃত জীবন পাইবে ও উচ্ছ স্থান অধিকার করিবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জীবনের পুর্ণতা ও বিশালতা কাহাকে বলে? জল লইয়াই নদী, জল আসিলেই নদীর পূর্ণতা ও বিশলতা হয়, সেইরূপ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতাদি লইয়াই মানবের আধ্যাত্মিক জীবন, জ্ঞান, প্রেম, পত্রিতার দ্বারাই সেই জীবনের পুর্ণতা

ও বিশালতা বর্দ্ধিত হয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, এ জগতে আমরা ইচ্ছা করিয়া আসি নাই ; ইচ্ছা করিয়া থাকিতেছি না, ইচ্ছা করিয়া এখান হইতে যাব না। এক মহাশক্তি ও মহাজ্ঞান জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহা হইতে জড় ও চেতন উভয় উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া উভয়ে স্থিতি করিতেছে। জড় বলিলেই বলা হয়, যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, স্পর্শ করা যায়, ইত্যাদি। অতএব জড়ের জ্ঞানের সঙ্গেই একজন দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্পর্শকর্ত্তার জ্ঞান নিহিত, অর্থাৎ জড়ের সঙ্গেই চৈতন্যময় আত্মার জ্ঞান নিহিত। আবার চৈতন্যময় আত্মার চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতির ধারণা করিতে গেলেই দেখিতে পাই, তন্মধ্যে জড়-সংস্পর্শ-জনিত জ্ঞান নিহিত। এইরূপে জড় ও জীব যখন পরস্পর সাপেক্ষ, তখন এক অপরের উৎপত্তি স্থান হইতে পারে না ; এক পরম চৈতন্য পশ্চাতে রহিয়াছেন, যিনি জড় ও জীবনকে পরস্পর-বিরোধী অথচ পরস্পর-সাপেক্ষ করিয়াছেন। এই পরম শক্তি ও পরম জ্ঞান যদি আমাদের জীবনের আদি কারণ হইলেন, তবে তাঁহার বিধানের অধীন হওয়াই এ জীবনের পূর্ণতা ; বৃক্ষের পক্ষে পুষ্প ফল ধারণেই পূর্ণতা, তেমনি এ জীবনের পক্ষেও ঈশ্বরেচ্ছা-সম্পাদনে পূর্ণতা।

এই ত গেল একটা স্থূল কথা ; ইহার ভিতর একটু সূক্ষ্ম কথাও আছে। জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছা কাহাকে বলে? এইখানে একটী নূতন জগত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। জড়

ও জড়ের শক্তি সকল যে ভাবে সেই পরাশক্তি ও পরম জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, আমাদের জীবন কেবল সে ভাবে নিয়মিত নহে। মানুষে এমন কিছু আছে, যাহা অপর কুত্রাপি নাই। মানুষ ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন ; মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি ইহার প্রমাণ। ঈশ্বর এই ধর্ম্মবুদ্ধিতে আপনাকে ধর্ম্মাবহরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন মানবীয় জ্ঞানে আপনার জ্ঞানস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন, মানব-হৃদয়ের প্রেমে আপনাকে প্রেমময় বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি মানবের ধর্ম্মবুদ্ধিতে আপনাকে ধর্ম্মের নিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম নিয়ম সুনিশ্চিত, অপরিহার্য্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। ইষ্টক খানি ছুড়িয়া যেমন অভ্রান্তরূপে বলিতে পার যে তাহা ধরা পৃষ্ঠে পড়িবেই পড়িবে, তেমনি অভ্রান্তরূপে বলিতে পারা যায় এ জগতে পাপের শাস্তি ও ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। সুতরাং হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হওয়া ও জীবন সম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হওয়া একই কথা। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি হৃদয়বাসী ঈশ্বরের প্ররোচনা।

যে দিন হইতে মানুষ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের জন্ম হয় ও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়। যতদিন মানুষ তাঁহাকে কেবল জড়রাজ্যেই দর্শন করে, ততদিন তাঁহাকে কেবল শক্তিরূপেই দেখিতে পায়। তাঁহাকে শক্তিরূপে ধারণা করিতে গেলেই মন ভয়ভীত ও অভিভূত হইয়া

পড়ে। কারণ জড়রাজ্যে নিরন্তর যে সকল দুর্জ্জয় শক্তির ক্রীড়া দেখা যাইতেছে, কোন্ মানব-হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত না হইয়া তাহার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে। এই জন্যই বেদে বরা বার এরূপ প্রার্থনা দৃষ্ট হয়, "হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বিনাশ করিও না।" এই ভয়ভীত অবস্থাতে ইষ্টদেবের সন্তোষ-সাধনের চেষ্টাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হয়; তখন নৈবেদ্য ও বলিদানাদি দ্বারা পূজার বিধি প্রচলিত হয়।

যে মুহূর্ত্তে মানুষ অনুভব করিতে আরম্ভ করে, যে ঈশ্বর অন্তরে, তিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই মুহূর্ত্তেই এরূপ বাহ্য পূজার অসারতা মানবচক্ষে প্রতিভাত, হইতে থাকে। যে সম্প্রদায় মধ্যে নৈবেদ্য, বলি, প্রভৃতি বাহ্যপূজার আতিশয্য দৃষ্ট হইয়াছে, সেখানেও মধ্যে মধ্যে এমন সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাজন দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা মানুষের চিত্তকে বাহ্য-পূজা হইতে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ নামে যে উক্তি প্রত্যুক্তি আছে, তন্মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একস্থানে গার্গীকে বলিতেছেন:—

যোঽবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি
যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

অর্থ—"হে গার্গি? এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া কোনও ব্যক্তি যদি সহস্র বৎসর যাগযজ্ঞ হোম করে, সে সমুদয় বিফল হয়।"

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় প্রাচীন য়িহুদীদিগের মধ্যে নৈবেদ্য বলিদানাদি বাহ্য পূজার আড়ম্বর খুব ছিল। তাঁহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে ধর্ম্মসংস্কারকগণ দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা প্রেমহীন বাহ্য পূজার অসারতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একস্থানে আছে ঃ—

"তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না নতুবা আমি তাহা দিতাম ; হোমেতেও তুমি তুষ্ট নও, ভগ্ন-আত্মারূপ বলিই ঈশ্বরের গ্রাহ্য, ভগ্ন ও অনুতাপিত হৃদয়কে হে ঈশ্বর তুমি তুচ্ছ করিবে না।"

প্রাচীন য়িহুদীদিগের মধ্যে আইসেয়া নামে একজন যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের উক্তিতে একস্থানে বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বলেন,—তোমরা যে বহুসংখ্যক বলিদান কর, তাহাতে ফল কি ? আমি ছাগ মেষের আহুতি ও পশুমেধের আহুতি অনেক পাইয়াছি, বৃষ বা মেষশিশু বা ছাগের রুধিরে আমি প্রীত নহি। * * * বৃথা আর আহুতি আনিও না ; তোমাদের ধূপ দীপ আমার অসহনীয় ; তোমাদের অমাবস্যার বিশেষ বিধি, তোমাদের বিশ্রাম বারের ব্যবস্থা, তোমাদের সাধক-গোষ্ঠীর সম্মিলন এ সকল আমি সহিতে পারি না ; তোমাদের ধর্ম্মার্থ সভাকেও পাপ জ্ঞান করি ; তোমরা নিজেদের পাপ ধৌত কর, পবিত্র হও, আমার দৃষ্টি হইতে কার্য্যের অসাধুতা পরিহার কর, পাপাচরণ করিও না ; সাধুদের

আচরণ শিক্ষা কর, সুবিচার অন্বেষণ কর, দীন জনের দুঃখ দূর কর, পিতৃহীন নিরাশ্রয় সন্তানের ন্যায় বিচার কর, বিধবার পক্ষ অবলম্বন কর। তৎপরে আমার নিকট এস।”

ঈশ্বরকে আত্মাতে ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত দেখাই আধ্যাত্মিকতার ভিতরকার কথা। ঈশ্বরকে ধর্ম্মাবহরূপে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিলেই জীবনকে ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত করিবার আকাঙ্ক্ষা মানব-হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয় এবং হৃদয়ে আত্ম-দৃষ্টি জাগিতে থাকে। আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া, অনিত্যের মধ্যে সেই নিত্যকে লক্ষ্য করিয়া, মানুষ গভীর আত্ম-জ্ঞানে নিমগ্ন হইতে থাকে। এই আত্মদর্শনের অভ্যাস হইলে মানুষের দৃষ্টি বদলিয়া যায়। তখন আর দৈহিক সুখ লক্ষ্য থাকে না; আধ্যাত্মিক অবস্থাই লক্ষ্যস্থলে আসে। কি পারিবারিক জীবন, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকে। তখন কিসে পাব এই চিন্তা অপেক্ষা কিসে দিব এই চিন্তা প্রবল হয়। সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকে, পাছে অপরে কোনও ক্ষতি করে, আধ্যাত্মিক-ভাব-সম্পন্ন মানুষ সতর্ক থাকে, পাছে নিজের দ্বারা অপরের কোনও ক্ষতি হয়। এই উভয় ভাবে কত প্রভেদ! ঈশ্বর করুন আমরা আধ্যাত্মিক চক্ষে জীবনকে দেখিতে শিখি।

মানবের প্রকৃতিগত পারমার্থিকতা।

এই কলিকাতার ন্যায় একটী মহানগরে কত মানুষ বাস করিতেছে এবং তাহাদের সকলের দৈনিক খাদ্য দ্রব্য কিরূপে যুটিতেছে তাহা যদি একবার চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অথচ সকলেই বলিবেন, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, সহরের মধ্য হইতে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ এক শত জন লোক বাছিয়া লইয়া যদি একটী কমিটী করা যায়, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আরও পাঁচ শত সহকারী দেওয়া যায়, এবং তাঁহাদিগকে এই ভার দেওয়া যায় যে, সহরে যত পুরুষ রমণী, শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ, অসুস্থ লোক আছে, সকলের এক দিনের আহারের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে কিরূপ ব্যাপার দাঁড়ায় বোধ হয়? সহরের ৮।১০ লক্ষ লোকের সকলে কি যথা সময়ে আহার পায়? সকল রোগী কি পথ্য পায়? সকল শিশু কি দুগ্ধ পায়? ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে সে দিনকার সূর্য্য অস্ত যাইতে না যাইতে আর্ত্তনাদ, বিলাপ, অভিযোগ ও ক্রন্দনের রোলে সহর পূর্ণ হইয়া যায়। অথচ প্রতিদিন সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে, জলস্রোতের ন্যায় কার্য্য-স্রোত চলিয়া যাইতেছে, এই আট লক্ষ লোকের

অধিকাংশ আহার পাইতেছে, রোগীর পথ্য যুটিতেছে, শিশুরা দুগ্ধ পাইতেছে। ইহা কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? ইহার মধ্যে বিশ্ববিধাতার বিধান কি দেখা যায় না? তুমি বলিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাণিজ্যের দ্বারা এই অভাব পূরণ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, বাণিজ্যটা কি? সেটা কি বিধাতার বিধান নহে? তাঁহার বিধান কি কেবল ধর্ম্মরাজ্যেই থাকে,—মানবের স্বার্থপরতার মধ্যে কি তাঁহার মঙ্গল বিধি দেখিবার কিছু নাই? তোমরা বল বাণিজ্যের দ্বারা আট লক্ষ লোক খাইতে পাইতেছে, আমি বলি বিধাতা তাহাদিগকে খাইতে দিতেছেন। ইহা কি সত্য নহে?

সকল রাজ্যেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রজার বাস। রাজকার্য্যের ভার যাঁহাদের হস্তে তাঁহারা কি করেন? তাঁহারা রাস্তা, ঘাট, খাল, বিল প্রভৃতি করিয়া দিয়া, ও কৃষিকার্য্য ও শিল্পাদির উন্নতির সহায়তা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন যে, সেই কোটি কোটি লোক যথাসময়ে আহার পাইবে; কারণ তাঁহারা জানেন, যাহার যে জিনিসের প্রয়োজন আছে, সে তাহার অন্বেষণ করিবে; এবং যাহার তাহা বিক্রয় করিবার মত আছে, সে তাহা বিক্রয় করিবে। পথ ঘাট করিয়া দেও, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির বিকাশের সাহায্য কর, অবশিষ্ট কার্য্য বাণিজ্য করিয়া লইবে। স্থলবিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এমন দেশ থাকিতে পারে যেখানকার অধিবাসি-গণ এত অলস যে, বাণিজ্যের সকল সুবিধা হাতের নিকট

থাকিতেও নড়িতে চায় না; বসিয়া বসিয়া কষ্ট পায়; কিন্তু স্থলবিশেষে এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলেও মোটের উপর এ নিয়ম ঠিক যে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেও, আর অধিক ভাবিতে হইবে না, প্রজাগণ আপনাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আপনারাই সংগ্রহ করিবে। মানব-হৃদয়ের যে লাভ-প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী আছে তাহার প্রতি আমাদের এতটা নির্ভর।

মানব-হৃদয়ের অপরাপর প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর। যদি আজ সংবাদপত্রে শোনা যায় যে, কোনও জাতির দ্বারা একটী নূতন দ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং বিগত বর্ষে চৌদ্দ হাজার পুরুষ ও নয় হাজার স্ত্রীলোক সেই নূতন দেশে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাঁচ হাজার পুরুষ ও তিন হাজার রমণী বিবাহিত অবশিষ্ট অবিবাহিত। ইহা শোনার পর কি আর কাহারও মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়, ইহারা ত গেল, কিন্তু ইহাদের পরে সে দেশকে অধিকার করিয়া থাকিবে কে? মোটের উপরে কি এ কথা বলা যায় না, যে ঐ যে ৯ হাজার অবিবাহিত পুরুষ ও ৬ হাজার অবিবাহিতা নারী গিয়াছে, উহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি প্রণয় ও পরিণয়ে আবদ্ধ হইয়া গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশ রক্ষা হইবে। তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জন বিবাহিত হইবে, কে কে অবিবাহিত থাকিবে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে পারি, বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া

অনিবার্য্য। তাহারা যে কোনও বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিবে, বা পুরোহিত ডাকিয়া পরিণয় সম্বন্ধকে দৃঢ় করিবে, অথবা কোনও বিশেষ আইনের নির্দ্দেশানুসারে সম্মিলিত হইবে, তাহা বলা যায় না, কিন্তু বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষে প্রীতি সঞ্চার হইবে ও দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাহা অভ্রান্তরূপে বলা যায়। এখানে বিশ্বাস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দাম্পত্য-প্রেমের উপর। অপরাপর নিয়মের ন্যায় এ নিয়মের ও ব্যতিক্রম স্থল দেখা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মনে কর, আমাদের বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে নানা স্থানে কাপড়ের কল, পাটের কল, সূতার কল, রেশমের কল প্রভৃতি নানাপ্রকার কল কারখানা খোলা হইয়াছে। নানা স্থান হইতে হাজার হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়া এই সকল কলে কাজ লইতেছে। এই সকল স্ত্রীলোকের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর বিধবা স্ত্রীলোক। ইহাদের অনেকে কলিকাতা প্রভৃতি সহরে থাকিয়া, গৃহস্থের ঘরে দাসীর কাজ করে, অবশিষ্টাংশ এই সকল কল কারখানাতে কাজ করে। কলের চতুষ্পার্শ্বে ঘর করিয়া ইহারা অরক্ষিত অবস্থাতে বাস করে। কলে নানা শ্রেণীর ও নানা জাতির পুরুষের সহিত ইহাদিগকে সর্ব্বদাই মিশিতে হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহ-সম্বন্ধ বলিয়া একটা সম্বন্ধ ইহাদের মধ্য হইতে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। এই সকল পুরুষ ও রমণী ঘোর যথেচ্ছাচারের

মধ্যে বাস করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, সমাজ-দেহের এক অঙ্গে এইরূপ ব্যাধি প্রবেশ করিতেছে বলিয়া, আমরা কেহ কি এরূপ ভয় করি, যে জগতে এমন একটা দিন আসিতে পারে যখন পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধের অনুরূপ কিছু থাকিবে না? বরং এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই ধারণা যে আজ যদি এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়, যে বিবাহ সম্বন্ধ মনে করিলেই ভাঙ্গা যাইতে পারে, এবং কোনও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনও পুরুষের এবং কোনও পুরুষ সম্বন্ধে কোনও স্ত্রীলোকের কোনও দায়িত্ব থাকিবে না, তাহা হইলেও অচিরকালের মধ্যে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ স্থলেই নরনারী প্রেমে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে; সকল যথেচ্ছাচারের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। যেটা মানবের স্বভাব সেটাকে বারণ করে কে? তাহাকে এক আকারে ভাঙ্গিয়া দেও, আর এক আকারে গড়িয়া উঠিবে। গৃহ পরিবার সমাজ এ সকলকে এখনও যে আকারে দেখিতেছ, সে আকার ভাঙ্গিয়া দেও, নাতিদীর্ঘ কালের মধ্যে মানবের অন্তর-নিহিত প্রকৃতি আর এক আকারে তাহাকে গড়িয়া তুলিবে। বৃক্ষের স্বভাব উপরের দিকে উঠা, মূলাটার অর্দ্ধেক কাটিয়া তাহাতে জল দিয়া পাতাগুলি নীচু করিয়া ঝুলাইয়া দেও, দেখিবে বাঁকিয়া চুরিয়া আবার ঊর্দ্ধদিকেই উঠিবে। প্রণালিটা পরিবর্ত্তিত হইবে, জিনিসটা সেই থাকিবে। আগে জগতের রাজারা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং

তাঁহাদের শক্তি ভগবদ্দত্ত শক্তি, এখন অধিকাংশ সভ্যদেশে সেই শক্তি রাজাদের হস্ত হইতে অপহৃত হইয়া প্রজাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু রাজ-শাসন বস্তুটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কারণ মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে গেলেই তদঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তির ধন, মান রক্ষার জন্য এবং বাহিরের উপদ্রব নিবারণের জন্য একটা রাজ-শাসন চাই। এক আকারে ইহাকে ভগ্ন কর, আর এক আকারে গড়িয়া উঠিবে; মানুষ দেখিবে অরাজকতাতে সমাজের উচ্ছেদ, সুতরাং স্বাভাবিক সামাজিকতা-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অরাজকতা নিবারণের জন্য সম্মিলিত হইবে।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি গৃহ, পরিবার, দাম্পত্য, বাণিজ্য, রাজশাসন প্রভৃতি সমুদায় সামাজিক ব্যবস্থার বীজ মানব প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, এবং আমরা তাহা জানি বলিয়াই মানব-সমাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিরুদ্বেগে নির্ভর করিতে পারি। ইহাদের সংস্কার ও সংশোধনের যে প্রয়োজন নাই, তাহা বক্তব্য নহে; বরং এ সকলকে অনেক দেশে যে আকারে ও যে অবস্থাতে দেখা যায়, তাহার প্রভূত সংস্কারের প্রয়োজন আছে; কিন্তু এ সকলের ঐকান্তিক উচ্ছেদ যে কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহাই বলা উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন এই, অপরাপর বিষয়ের ন্যায় মানবের ধর্ম্মভাবও কি স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত? ইহাও কি স্থায়ী ও দুরপনেয়? বিগত শতাব্দীর শেষে ও বর্ত্তমান

শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক সংশয়ী লোক মনে করিয়াছিলেন, যে ভূত, প্রেত, ডাইন, শাকিনী, ডাকিনী প্রভৃতিতে বিশ্বাস যেমন এককালে সকল দেশেই ছিল, এখন সভ্য দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ক বিশ্বাসও একদিন চলিয়া যাইবে; তখন কেবল তাহা ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয় থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল, যে এ সকল বিশ্বাস মানব-হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার কোনও চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। বরং ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে, যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইতেছেন, তাঁহারাও নৌকা-মগ্ন ব্যক্তিদিগের ন্যায় কি ধরি, কি ধরি বলিয়া চারিদিকে হাত বাড়াইতেছেন এবং প্রাচীন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে অনেক সময় নূতন কুসংস্কারকে ধরিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমকালে আমরা দেখিতেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে নাস্তিকতা জগতে প্রবল ছিল, তাহা ভাটার জলের ন্যায় তিল তিল করিয়া জগত হইতে সরিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মভাব মানুষকে ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না। ইহা কখনই মানুষকে ছাড়িবে না। এক আকারে ভাঙ্গ আর এক আকারে ফুটিয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা মানবের ধর্ম্মভাবকে নানা ধর্ম্ম-সমাজ, নানা ধর্ম্ম-নিয়ম, নানা সাধন-প্রণালীর মধ্যে দেখি-তেছি। ইহার কিছুই অভ্রান্তরূপে সত্য নয়; অথবা অনন্ত-

কাল স্থায়ী নয়। রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যেরূপ চিরদিন পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ঘটিতেছে, তেমনি এ সকল বিষয়েও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। তাহা নিবারণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মানবের স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীন-আকাঙ্ক্ষা ঘুচাইয়া তাহাকে লোহার সিন্ধুকটীর ন্যায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধবিশিষ্ট বস্তুমাত্রে পরিণত করিতে না পারিলে পরিবর্ত্তন ঘুচাইবার উপায় নাই। লোহার সিন্ধুকটীকে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া আসি, দশ বৎসর পরে গিয়া দেখি, সেই খানেই বসিয়া আছে, মানুষের চিন্তাকে সেরূপে বসাইয়া রাখিবার উপায় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় শাস্ত্র ও গুরুর অভ্রান্ততার মত সৃষ্টি করিয়া মানব-চিন্তাকে লোহার সিন্ধুকটীর ন্যায় যুগ যুগ একস্থানেই বসাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। মানব-চিত্তের অনিবার্য্যগতি বশতঃ ঐ সকল সম্প্রদায় অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহিরের আকার ও প্রণালীর সহস্র পরিবর্ত্তন ঘটিলেও মানবের অন্তর-নিহিত ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইবার নহে।

অপরাপর বিষয়ে যেমন কতকগুলি ব্যতিক্রমস্থল দৃষ্ট হয়, এ বিষয়েও ব্যতিক্রম স্থল থাকিতে পারে। কোনও জাতির বা কোনও যুগের মানুষের মনে এরূপ লঘু-চিত্ততা থাকিতে পারে, যাহাতে সে জাতি মধ্যে বা সেই যুগের মানুষের মধ্যে পারমার্থিক ভাবের অতিশয় ম্লানতা লক্ষিত হয়। তখন মনে হইতে

পারে যে, এ জাতি হইতে বুঝি ধর্ম্মের নাম বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু অপেক্ষা কর, ধর্ম্মের চিরসহচরী একজন আছেন, তিনি নীতি, তাঁহাকে অগ্রে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে দেও, দেখিবে ধর্ম্ম পশ্চাতে আসিতেছেন। সে জাতি মধ্যে গৃহ ও পরিবার সকলকে উন্নত হইতে দেও, শিল্প সাহিত্যের বিকাশ হইতে দেও, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের জ্ঞান ফুটিতে দেও, কোনও প্রকার সামাজিক বিপ্লব বা দুর্গতি ঘটিয়া তাহাদের প্রকৃতিকে গভীর ও চিন্তাশীল হইতে দেও, দেখিবে ভাব ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা ও চিন্তার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মভাব জাগিতে আরম্ভ হইবে।

জগতে নাস্তিকতা প্রচার হইলই বা, প্রাচীন ধর্ম্মসমাজ ও প্রাচীন প্রণালী সকল ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেলই বা, হে অল্প বিশ্বাসি! নিরুদ্বেগে বাস কর, একজন সেতু স্বরূপ হইয়া ধর্ম্মকে ধারণ করিতেছেন। কৃষকের ক্ষেত্রের জল বহিয়া অন্য ক্ষেত্রে যায় না কেন? বলিবে সেতু থাকে বলিয়া; গ্রহ নক্ষত্র সকল সূর্য্যের চারিদিকে ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, তাহাদের পরমাণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটিয়া যায় না কেন? বলিবে মাধ্যাকর্ষণ তাহাদিগকে সেতু-স্বরূপ হইয়া রক্ষা করিতেছে বলিয়া; তুমি যে রাজপথে চলিতেছ ভাবিয়া দেখ তোমার মস্তকের উপরে কত মণ বায়ু রহিয়াছে, তোমার শরীর পিষিয়া ছাতু হইয়া যায় না কেন? বলিবে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল তোমাকে রক্ষা করিতেছে

বলিয়া ; তেমনি যদি জিজ্ঞাসা করি, মানবে ত হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বসুখ-প্রিয়তা প্রভৃতি আছে, তবে জনসমাজ উচ্ছিন্ন হয় না কেন ? ইহার উত্তরে ঋষিদিগের সহিত একবাক্য হইয়া কি বলিতে পার না,

সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।

তিনিই সেতু-স্বরূপ হইয়া এই সকল লোককে ছিন্ন ভিন্ন হইতে দিতেছেন না। যাহার যাহা প্রকৃতি সে তাহাকে প্রকাশ করিবেই করিবে। বোলতাগুলি তোমার গৃহের কোণে চাক বাঁধিতেছে, চাকখানি ভাঙ্গিয়া দিলে কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইবে যে ঘরের আর এক কোণে ঠিক তদনুরূপ আর এক খানি চাক বাঁধিতেছে। প্রকৃতি জীবকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। জানিও ধর্ম্মটাও এইরূপ মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। ধর্ম্মকে এক আকারে ভাঙ্গিয়া দেও, ইহা আর এক আকারে আপনাকে গড়িয়া তুলিবেই তুলিবে। মানবের উপরে ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকদিগের যে এত শক্তি তাহার কারণও এই প্রকৃতিগত পারমার্থিকতা। প্রকৃতিতে যাহা নাই, মনের উপরে তাহার আকমণও নাই। একখানি সুন্দর ছবি একজন মানুষের হাতে দেও সে অবাক হইয়া দেখিবে ; একটা বানরের হাতে দেও, ভাঙ্গিয়া চূরমার করিবে ; কারণ তাহার প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য গ্রহণের শক্তি নাই। মানব মনের উপরে সুন্দর ছবির যে শক্তি তাহার কারণ মানব-প্রকৃতিনিহিত। সেইরূপ মানব-হৃদয়ের উপরে সাধুদের যে এত প্রভাব, নীতির যে এত প্রভাব,

তাহার কারণ মানবের প্রকৃতিগত পারমার্থিকতা। সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষ আমাদের অন্তরে বাস করিতেছেন, তিনি আপনার জিনিস আপনি চিনিয়া লন, এই জন্যই আমাদের মন স্বভাবতঃ সাধুদের চরণে অবনত হইয়া পড়ে।

মানুষ দেশ কালের সীমার মধ্যে সর্ব্বদাই বাস করিতেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় সর্ব্বদাই দৈহিক ভোগ সামগ্রী সকলকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেছে, মানবের চিত্ত বহির্বিষয়ে কতটা ব্যাপৃত। অথচ মানব-প্রকৃতির মধ্যে কি এক প্রকার আশ্চর্য্য-শক্তি রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকলকে এতই প্রীতি করিতেছে, যে জন্য, সুখ স্বার্থ ধন, মান বিসর্জ্জন করাকে ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে না। যীশু হৃদয়গত যে ভাব বা আদর্শকে স্বর্গ-রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহার ন্যায় দেশ কালাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু আর কি হইতে পারে? তাহা একটা মনঃকল্পিত চিত্র মাত্র; অথচ তাহার প্রতি তাঁহার চিত্তের এমনি অভিনিবেশ হইয়াছিল যে, সে জন্য শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়াকেও দুঃখকর মনে করেন নাই। মহাত্মা বুদ্ধ তাঁহার হৃদয়-নিহিত আদর্শকে এতই প্রীতি করিয়াছিলেন যে, রাজবিভব পরিত্যাগ করাকেও ত্যাগ বলিয়া মনে করেন নাই। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলে আবদ্ধ মানব-মনের যে এই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে রতি,—ইহা মানব-প্রকৃতির একটী গূঢ় রহস্য। ইহার মূলে মানব-প্রকৃতির

স্বাভাবিক পারমার্থিকতা। মানব অনন্তের সহিত জড়িত বলিয়াই মানব-মনের সর্ব্বদা অনন্তমুখীন গতি। মানব-প্রকৃতি এই জগতের দিকেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাব সকলের দিকে সেই অনন্তপুরুষের সহিত অসীমভাবে মিশ্রিত। মানবাত্মা; দৈহিক ভাবে যাহা চাহিতেছে, তাহা দেশকালের সীমাধীন কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে যে যাহা চাহিতেছে তাহার সীমা-নির্দ্দেশ সম্ভব নহে। মানবাত্মা জ্ঞান চায়—সে জ্ঞানের অন্ত কোথায়? প্রেম চায়, সে প্রেমের অন্ত কোথায়? পবিত্রতা চায়—তাহারই বা অন্ত কোথায়? এইরূপে চিন্তা করিয়া দেখ, সেই পরম-পুরুষই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কারণ জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা তাঁহারই স্বরূপ, আমরা তাহাই চাহিতেছি।

তাই বলি, পারমার্থিকতা মানবের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একই মানব-প্রকৃতি দেশভেদে ও অবস্থাভেদে আপনাকে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। দাম্পত্য-প্রেম সভ্য-জাতি সকলের মধ্যে যে আকারে বাস করে, অসভ্যদিগের মধ্যে সে প্রণালীতে হয় তঃ আপনাকে প্রকাশ করে না। মাতৃ-স্নেহের প্রকাশ সভ্য রমণীদিগের মধ্যে যেরূপ, অসভ্যদিগের মধ্যে সেরূপ না হইতে পারে। মানবের অজ্ঞানাবস্থাতে প্রকৃতির এক প্রকার কার্য্যের উপরে এত প্রকার আবরণ পড়িতে পারে, যাহা উন্মোচন করিতে সমাজ-সংস্কারকের প্রয়োজন হয়। পারমার্থিকতা বিষয়েও সেইরূপ। জনসমাজের অজ্ঞতার অবস্থাতে মানবের স্বভাবনিহিত পারমার্থিকতা

আপনাকে নানাপ্রকার কুসংস্কারের আবরণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছে, জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি সহকারে সেই সকল আবর্জ্জনা বিদূরিত হইয়া প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কৃত হইয়াছে ; এই মাত্র, নতুবা পারমার্থিকতা কখনই মানবকে পরিত্যাগ করে নাই। ঈশ্বর করুন আমরা যেন নিরুদ্বিগ্নমনে এই স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের উপরে নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার মঙ্গল ক্রোড়ে আপনাদিগকে দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি।

অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ

ভগবদ্গীতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, গীতাকার তাঁহার গ্রন্থের আদ্যন্ত মধ্যে সর্ব্বত্রেই দুই শ্রেণীর মানবের কল্পনা করিতেছেন। এক শ্রেণী অবিদ্বান ও অপর শ্রেণী বিদ্বান। এই অবিদ্বান ও বিদ্বান শব্দদ্বয় তিনি এক বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা কর্ম্মে আসক্ত এবং কর্ম্মের অতিরিক্ত আর কিছু জানে না, তাহারা অবিদ্বান; আর যাঁহারা কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়কেই জানেন, এবং কর্ম্মে অনাসক্ত তাঁহারাই বিদ্বান। গীতাকার বলিতেছেন;—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥"

অর্থ—অবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যে ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিদ্বান ব্যক্তি সাধারণ প্রজাপুঞ্জকে সৎপথ প্রদর্শনের মানসে সেই প্রকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

গীতার উপদেশের প্রতি অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন যে, ইহা কি প্রকার নীতি? তুমি জান কর্ম্ম কিছু নয়, তুমি জান ইহা অনেকের বন্ধনের কারণ, তথাপি লোকের থমু

চাহিয়া ইহার আচরণ করিবে। কিন্তু পূর্ব্বাপর পাঠ করিলে, এবং কর্ম্ম শব্দে গীতাকার কি বুঝিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সে আপত্তি আর বড় প্রবল বলিয়া মনে হয় না। এক সময়ে এদেশে বেদান্ত ধর্ম্ম ও অদ্বৈতবাদ প্রচার হইয়া লোকের মনে সন্ন্যাসের ভাবটা অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তখন জ্ঞানী মাত্রেই কর্ম্মবিমুখ হইয়া অর্থাৎ গৃহধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। এই বিষয় লইয়া দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকগণ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিতেন; অপরদিকে বৈদান্তিকগণ কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এই উভয় শ্রেণীর সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশেই গীতা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গীতাকার একদিকে বলিতেছেন;—

"যশ্চাত্মরতিরেব স্যাদাত্মভুতশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

অর্থ—যাহার আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন, এবং যিনি আত্মজ্ঞানেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, সে মানুষের কর্ম্ম নাই।

আবার কিঞ্চিৎ পরেই বলিতেছেন ঃ—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥"

অর্থ—"জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণেই হউক, অথবা অপর লোককে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই হউক, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, লোক-সংগ্রহটা গীতাকারের সর্ব্ব-শেষ যুক্তি। এ যুক্তিটা যে একে-বারে দুর্ব্বল যুক্তি তাহাও বলা যায় না। ইংলণ্ডে সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্যগণ এ প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনেককে সুরাপান হইতে বিরত করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, মানিলাম সবলচেতা ব্যক্তিদিগের পক্ষে পরিমিত সুরাপান অনিষ্টজনক নহে, কিন্তু তাহাদিগকেও বলি, তোমরা পরিমিত সুরাপানের অভ্যাস রাখিলে, তোমাদের দেখাদেখি দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিগণ সেই অভ্যাস করিতে গিয়া সুরাতে আসক্ত হইতেছে; অতএব দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সুরাপান ত্যাগ কর। অনেকে এই ভাবে সুরাপান পরিত্যাগ করিতেছেন।

ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের সম্বন্ধে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী বচন প্রসিদ্ধ আছে ঃ—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।"

অর্থাৎ প্রভু আপনি ধর্ম্মের আচরণ করিয়া জগতকে শিখাইয়াছেন। চৈতন্য সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না; তথাপি তিনি লোক শিক্ষার্থ ধর্ম্মাচরণ করিতেন। এই ভাব বাইবেল গ্রন্থেও পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশু একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; উপাসনা প্রার্থনাদির সময় ও

নিয়ম আর তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না; তথাপি তিনি শিষ্যগণকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া দেখাইলেন। বলিলেন,—"তোমরা এই প্রকারে প্রার্থনা করিবে।"

এই লোক-সংগ্রহ-বিষয়ক যুক্তির এই টুকু মাত্র সত্য যে, এ জগতে আমাদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য এরূপ অনেক কাজ করিতে হয়, যাহা আমাদের পক্ষে না করিলেও চলে। মিথ্যাকে সত্য করা এ যুক্তির উদ্দেশ্য নহে। যাহা অসত্য, বা ধর্ম্মবিরোধী তাহার আচরণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে; গীতাকারেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে।

যাহা হউক, মূল উপদেশের মধ্যে একবার প্রবিষ্ট হওয়া যাউক। একটা বিষয় জানা আর না জানাতে অনেক প্রভেদ। যেটা জানি, সেটা আমার চিন্তাতে প্রবেশ করে এবং অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে কার্য্যের মধ্যেও প্রবেশ করে। আমার প্রাঙ্গণে একটী বৃক্ষ আছে তুমি জান, আর একজন জানে না। দুই জনে অন্ধকারে আমার ভবনে প্রবেশ করিতেছ, দুই জনের কার্য্য কি এক প্রকার হয়? তুমি প্রাঙ্গণে আসিয়াই সতর্ক হইবে, হাতড়াইবে; গাছটা যে ওখানে আছে, যে জানে না সে ব্যক্তি অসংকুচিত চিত্তে অগ্রসর হইতে গিয়া সেই বৃক্ষের গায়েই আঘাত প্রাপ্ত হইবে। যিনি এই বাঙ্গালা দেশটুকুকে অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি কখনও গমন করেন নাই, তিনি এই দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গদেশে বসিয়া

বসিয়া ভাবিবেন, বুঝি বা সমগ্র ভারত ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; যাঁহারা সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে মনে হাসিবেন ও বলিবেন ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু দুর্গোৎসব কাহাকে বলে জানে না। জানা না জানাতে এতটা প্রভেদ।

প্রাচীন কালের জ্যোতির্ব্বিদগণ জানিতেন না যে, গ্রহ উপগ্রহ সকল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা যে পৃথিবীতে বাস করিতেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে অতি বিপুল মনে হইত। ভাবিতেন পৃথিবী গ্রহকুলের রাণী; সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে; সকলে এই রাণীকে উপহার যোগাইতেছে। জ্ঞানের উন্নতি সহকারে এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে সৌরজগতে ও গ্রহগণের মধ্যে পৃথিবী একটী অতীব ক্ষুদ্রকায় গ্রহ মাত্র; ইহা অপরাপর গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে এক একটী এত বড় যে পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ। দূরবীক্ষণ সহকারে এত বৃহৎ ও এত দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল জানা গিয়াছে, যাহাদের কিরণ-জাল সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ছুটিতেছে অথচ এখনও পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই অসীম প্রসারের ভাব যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রাচানদিগের ন্যায় ভাবিতে পারেন, যে কয়েক ক্রোশ উঠিলেই হয়ত তারাগুলি মাথায়

ঠেকে, অথবা বোধ হয় ঐ তারাগুলির উপরেই স্বর্গ আছে।

এমনি আর একটী বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে কালের মানুষ পৃথিবীটাকে বড় ভাবিয়া যেমন ইহাকে আপনাদের চিন্তাতে প্রধান স্থান দিতেন, তেমনি মানুষকে সৃষ্টির রাজা জানিয়া সমুদয় সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করিতে চাহিতেন। বাইবেল গ্রন্থে বলে ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রে একটী পুরুষ সৃষ্টি করিলেন; পরে পুরুষের সহচরী হইবার জন্য নারীকে এবং মানুষের ভোগের জন্য ইতর-প্রাণীদিগকে সৃষ্টি করিলেন ঃ—

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রেও আছে ঃ—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ

অর্থ—"ইতর প্রাণী সকল যজ্ঞে বলি হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।" মানুষ সৃষ্টির রাজা, আর সমুদয় মানুষের জন্য। এখন এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, মানুষ এক মহা ধারা-বাহী বিবর্ত্তন-শৃঙ্খলার একটী গ্রন্থিমাত্র। ইতর প্রাণীগণ মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু মানুষ ইতর প্রাণী হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাদের পরে নহে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ।

পূর্ব্বোক্ত উভয় তত্ত্ব যাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি কি আর প্রাচীনদিগের চক্ষে এই জগৎকে ও মানুষকে দেখিতে পারেন? প্রাচীনেরাও জগতে বাস করিয়াছিলেন, আমরাও

জগতে বাস করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু দুই দল দুই বিভিন্নভাবে জগতকে দেখিতেছেন।

এখন আবার গীতার উপদেশ স্মরণ করি। এই জগতে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ দুই শ্রেণীর লোক বাস করিতেছেন ; এক শ্রেণী ঈশ্বরকে জানেন না, আর এক শ্রেণী ঈশ্বরকে জানেন। ইঁহাদের কার্য্যের প্রভেদ কোথায় ? সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখ, প্রতিদিনের কাজ, ধার্ম্মিকগণকে কি এ সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে ? তাহা ছাড়িয়া ধর্ম্মের ক্ষেত্র কি অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে ? আমাদের দেশে বহুদিবসাবধি সন্ন্যাস ধর্ম্মের মত প্রচলিত হওয়াতে এই একটা সংস্কার এদেশের মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, যে সংসারক্ষেত্র ও ধর্ম্মসাধনক্ষেত্র এ দুই সম্পূর্ণ পৃথক। তুমি যে অর্থোপার্জ্জন কর, পরিবার প্রতিপালন কর, রাজনীতির বা সমাজনীতির চর্চ্চা কর, জ্ঞানালোচনা কর, ইহার মধ্যে ধর্ম্ম নাই ; ইহা ত সাধারণ মানুষে করে, ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই সংসারক্ষেত্রের মধ্যে বেড়া দিয়া কতকটা স্থান ও সময় রাখিয়া জপ, তপ, নাম সাধন উপবাস কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে, সেইগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম। এই ভাবটি ঘুচিয়া গিয়া আর একটী ভাবের উদয় হওয়া আবশ্যক। সেটী এই, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। মানুষ যাহাই করুক, আর যতটা উন্নতি লাভ করিতে চাহুক, এই মাটি পাথর সম্বলিত পৃথিবীটা ভিন্ন অন্য

জগত তাহার জন্য নাই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত জ্ঞানলাভের দ্বার নাই ; মস্তিষ্কপুর্ণ একখানি অস্থিকোষ ভিন্ন অন্য ব্যাটারি নাই ; পঞ্চাঙ্গুলি বিশিষ্ট হস্ত পদ ভিন্ন, কর্ম্ম-নির্ব্বাহক ভৃত্য নাই ; এবং চব্বিশ ঘণ্টাত্মক দিন রাত্রি ভিন্ন অন্য কাল নাই। তুমি এ জগতে দারিদ্র্যে দিন কাটাইতেছ, কিন্তু তোমারই সমবয়স্ক ও সহাধায়ী একজন হয় ত লক্ষপতি হইয়াছে। তাহার জন্য কি আকাশ হইতে জল-ধারার ন্যায় ধন বৃষ্টি হই-য়াছে ? চব্বিশ ঘণ্টার দিন রাত তাহার জন্য কি আটচল্লিশ ঘণ্টা হইয়াছে ? তুমি যে জগতে রাতকানার ন্যায় ধন ধন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, মস্তিষ্কের সাহায্যে ও হস্ত পদের সাহায্যে সেই জগত হইতে সে ব্যক্তি ধন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ। তুমি হয় ত ১৮৬৫ সালে শিক্ষকতা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তদবধি এই ৩৫ বৎসরকাল কলুর বলদের ন্যায় পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যার মধ্যেই ঘুরিতেছ, তোমার বিদ্যার কিছুই উন্নতি হইল না ; কিন্তু হয় ত তোমার একজন সহাধ্যায়ী নানা ভাষাতে ও নানা বিদ্যাক্ষে পারদর্শী হইয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার জন্য কি আর একটা জগত এবং আর একটা মানবজীবন আসিয়াছিল ? তাহার কিছুই হয় নাই ; এই সামান্য জীবন, এই দৈনিক সুখ দুঃখ, এই দৈনিক সুবিধা অসুবিধার মধ্যে বাস করিয়াই তিনি আপনার মহত্ত্ব কুঁদিয়া লইয়াছেন। আর একটা স্বতন্ত্র মানব-জীবনের প্রয়োজন হয় নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। ধার্ম্মিক হইতে হইলে যে এই দৈহিক সুখ দুঃখময়, চিন্তা ও কার্য্যময়, মানব-জীবনের অতিরিক্ত আর একটা কিছু চাই তাহা নহে। কতকগুলি কাজ সংসারের সামান্য কাজ, আর কতকগুলি বেড়া দেওয়া কাজ কেবল ধর্ম্মের কাজ, এরূপ ভাবা ভ্রম। ধর্ম্মসাধনের জন্য স্থান ও সময় ঘিরিয়া রাখিতে হইবে না, এরূপ বলা অভিপ্রায় নয়। পাঠের জন্য যেমন স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট রাখি, তেমনি ধর্ম্মভাবের বিশেষ চালনার জন্য স্থান ও সময় কেন নির্দ্দিষ্ট রাখিব না? কিন্তু জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যকে ধর্ম্ম-সাধনের বাহিরে বলিয়া মনে করা উচিত নয়। তুমি যদি বল, আমি যখন জপ, তপ পূজা প্রভৃতি করিতে বসি, তখনই আমার ধর্ম্মসাধন হয়, আর যে সংসারে আনি, নি, খাই, স্ত্রী পুত্রের সেবা করি, তাহাতে আবার ধর্ম্মসাধন কি? তাহা ত সকলেই করে। আমি বলি এত ক্ষুদ্র চক্ষে যদি আপনার গৃহ পরিবারকে দর্শন কর, তবে সেখানে থাকিয়া তুমি ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে। যদি জীবনের মধ্যে এমন একটা স্থান রাখ, যেটা ধর্ম্মের এলাকার বাহিরে, তবে সে স্থানটাতে যতই থাকিবে, ততই তোমার অধোগতি হইবে; ততই তুমি বিষয়াসক্তির জালে জড়িত হইবে। কুলটা নারীগণ যে এত লজ্জাহীনা হয়, তাহার কারণ এই, তাহারা মনে করে, আমরা এমন স্থানে আসিয়াছি, এমন পথে দাঁড়াইয়াছি, যাহা জনসমাজের সাধারণ নীতির বাহিরে; নীতি ও ভদ্রতা

আমাদের জন্য নহে ; এমন অবাচ্য নাই, যাহা আমাদের পক্ষে বলা সাজে না ; বা এমন ব্রীড়াজনক কার্য্য নাই, যাহা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। এই সংস্কারে তাহাদিগকে দিন দিন আরও অধোগতি-প্রাপ্ত করে। পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশের ন্যায় জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম-বর্জ্জিত একটা স্থান রাখা মহা অনিষ্টের কারণ। এ সংসারে মানুষের এমন কাজ নাই, যাহা তাহার ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গীভূত নহে। কাজটীর দ্বারা তোমার ধর্ম্ম-জীবনের সহায়তা হইবে কি ক্ষতি হইবে, তাহার অনেকটা তুমি কি ভাবে সে কাজটী কর, তাহার উপরে নির্ভর করে। তুমি একটী মহৎ কাজকে ক্ষুদ্র ভাবে করিতে পার, আবার একটী ক্ষুদ্র কাজকে মহৎ ভাবে করিতে পার। দুই তোমার আয়ত্তাধীন।

যে অজ্ঞ সে কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয়টিকেই দেখে, তাহার অতিরিক্ত কিছু দেখিতে পায় না ; সুতরাং তাহাতেই আসক্ত ও আবদ্ধ হয়। যিনি প্রাজ্ঞ তিনি বিষয়াতিরিক্ত পদার্থে প্রীতি স্থাপন করিয়া বিষয়ে থাকিয়া ও তাহাতে বাস করেন না। বোধ হয় মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নিম্নলিখিত বচনটী পাওয়া যায় ঃ—

বসন্ বিষয় মধ্যেঽপি নবসত্যেব বুদ্ধিমান্
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎস্বু বিষয়েস্বপি।

অর্থ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয় মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে

বাস করেন না; কিন্তু অজ্ঞ যে সে বিষয় না থাকিলেও তাহার মধ্যে বাস করে।

বিষয় না থাকিলেও তাহার মধ্যে বাস করে, এ কথার তাৎপর্য্য কি? সে ব্যক্তির শক্তি, সুবিধা বা অবসর নাই যে, সে ইচ্ছানুরূপ সুখ ভোগ করে; অথচ সে এমনি হতভাগ্য যে বিষয়াভাবে বিষয় কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত বিষয়ের ভোগদ্বারা আপনার বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পায়। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই মহোপদেশ লাভ করিতেছি যে, আমাদিগকে জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রকে এবং সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম-সাধনের ক্ষেত্র মনে করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বোচ্চ ভাব তাহা তাহার সর্ব্বনিম্ন কাজের মধ্যে বাস করিতে পারে—এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া হইবে না। জাবনের ভোগের সামগ্রীর সংখ্যা ও পরিমাণ অপেক্ষা চরিত্রটা অধিক মূল্যবান; এবং চরিত্রটা জ্ঞান, প্রীতি ও সদিচ্ছার কার্য্যের সম্মিলিত ফল; এই দুইটী কথা স্মরণ রাখিলেই পূর্ব্বোক্ত আদর্শ জীবনে ফলিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি বলিতেছে, আমার উপরে কেহ বর্ত্তা আছে কিনা জানি না, হাতের নিকটে যে সুখ আছে, তাহা ভোগ করাই আমার লক্ষ্য; আর যে বলিতেছে, সুখ বা দুঃখ আমি জানি না, আমার উপরে একজন অধিপতি আছেন, তাঁহার ইচ্ছার

অধীন হওয়াই আমার লক্ষ্য, এই উভয়ের কাজ কি কখনও সমান হইতে পারে?

কেহ কেহ এই বলিয়া শেষ আপত্তি করিতে পারেন যে, চিরদিনই ত শুনিতেছি অজ্ঞের ন্যায় বিষয়ে আবদ্ধ ও আসক্ত থাকিতে হইবে না, কিন্তু প্রাজ্ঞের ন্যায় বিষয় মধ্যে বাস করিয়া বিষয়ে অনাসক্ত থাকিতে হইবে, মহৎভাবে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সকলকেও সম্পাদন করিতে হইবে; কিন্তু তাহা কি সম্ভব? শাস্ত্রে ত কহিয়াছেঃ—

ইন্দ্রিয়ানাস্তু চরতাং যন্মানোনুবিধীয়তে,
তেনাস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।

অর্থ—ইন্দ্রিয় সকল সততই নানা বিষয়ে বিচরণ করিতেছে; মন স্বভাবতঃ তাহাদের অনুগামী হয়, ইহাতেই বায়ু যেমন নৌকাকে লইয়া যায়, তেমনি মানবের প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

প্রজ্ঞা যখন স্বভাবতঃই হৃত হয়; তখন আর মানুষ প্রাজ্ঞ হইবে কিরূপে? ইহার মধ্যে কথা আছে; মনের স্বভাব বিষয়ে আসক্ত হওয়া, তাহাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে অনাসক্ত রাখিতে হইবে। এই জন্যই সাধনের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ দেশের বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে! তাঁহারা এক একজনে এদেশে কি কাজ না করিতেছেন! বাণিজ্য, দেশ রক্ষা, রাজ্য শাসন, সকল কার্য্যই ত তাঁহাদের হস্তে; তাঁহারা কেহই শ্রমে ক্রুটী করেন না; আবশ্যক হইলে রণক্ষেত্রে জীবন দিতেও প্রস্তুত

আছেন, সকল স্থানে যাইতেছেন, সকল কার্য্য করিতেছেন, সকল সুবিধা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, অথচ জানেন এদেশ আমাদের দেশ নয়, কয়েক বৎসর মাত্র এখানে আছি, কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহারা কি এ দেশে অনাসক্ত ভাবে বাস ও কার্য্য করিতেছেন না? তাঁহারা যাহা প্রত্যেকে প্রতিদিন করিতেছেন, তাহা কেন তোমার আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না? কেন আমরা স্বীয় স্বীয় মনকে বুঝাইতে পারিব না? জীবনের অবস্থা ও ঘটনা সকল চিরদিন থাকিবে না; আমরাও এখানে চিরদিন থাকিব না; এই সকল অবস্থা ও ঘটনার সাহায্যে জীবনের মহত্ত্ব লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য। এই ভাব হৃদয়ে ধরিয়া যিনি জগতে থাকেন তিনিই প্রাজ্ঞ।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের সূত্র।

যাঁহারা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার শেষ কালে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানে ও শিক্ষাতে তৎকালীন জনগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং সন্মান সম্ভ্রমে ও পদগৌরবে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরা মনে মনে উন্নত একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন; লিখিবার সময় একেশ্বরবাদই প্রচার করিতেন এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অবলম্বিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেবদেবীর প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ ও কটূক্তি বর্ষণ করিতেন; অথচ কার্য্যকালে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সেই লৌকিক দেব দেবীর চরণে প্রণত হইতেন। তাঁহাদের উদার ধর্ম্মমত চিন্তাতেই আবদ্ধ থাকিত; কার্য্যের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। ইহা যে কেবল প্রাচীন গ্রীস ও রোমেই দৃষ্ট হইয়াছিল এরূপ নহে, এতদ্দেশেও ঠিক তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। উপনিষদ-কার ঋষিগণের উক্তি সকল যখন আমরা পাঠ করি, তখন বিস্মিত হইয়া ভাবি যে এরূপ উদার ও উচ্চ একেশ্বরবাদের মত বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কেবল তাহা নহে, দেখিতে পাই, ঋষিগণ পদে পদে লোকপ্রচলিত যাগ

হোমাদি ক্রিয়াকলাপের অসারতা ঘোষণা করিতেছেন। ঋষিরা এক স্থানে বলিতেছেন—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

অর্থ—মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু যিনি আমাদের মনকে তাঁহার মননের বিষয়ীভূত করিতেছেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু (নামরূপাদি-বিশিষ্ট ও দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন) বস্তুর উপাসনা করিতেছে তাহা ব্রহ্ম নহে।

তৎপরে আরও বলিতেছেন ;—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।

অর্থ—ইহাঁকে চক্ষের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা বা অপর কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা তপস্যা দ্বারা বা যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

পুনরায়—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রানি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

অর্থ—হে গার্গি ! কেহ যদি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া এ লোকে হোম, যাগ, তপস্যাদি করে, সে সমুদয় বিফল হয়।

এই সকল বচন দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ঋষিগণ যে কেবল উন্নত একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা

নহে; লৌকিক ক্রিয়া কলাপের অসারতা অনুভব করিয়া তাহার প্রতি ভ্রুকুটী করিতেও ক্রুটী করেন নাই। অথচ ইহাঁরাই কার্য্য কালে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অবলম্বিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত উদার মত কেবল জ্ঞানরাজ্যেই বদ্ধ থাকিত। ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যায় ইহাঁরা ধর্ম্মকে কেবল তত্ত্ববিদ্যার চক্ষেই দেখিতেন; মনে করিতেন, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব কেবল জ্ঞানিগণের জন্যই, সাধারণ অজ্ঞ মানবে যাহার আচরণ করিতেছে, তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের চরিতার্থতাই তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য, মানুষের কার্য্যের সহিত তাহার সংস্রব নাই।

এখনও অনেক জ্ঞানী মানুষ কেবল তত্ত্ববিদ্যার চক্ষেই ধর্ম্মকে দেখিয়া থাকেন। কোনও বিশেষ মতের সহিত যে তাঁহাদের জীবনের ও কার্য্যের কোনও সংশ্রব আছে তাহা নহে, কিন্তু কোন্ মতটা সুযুক্তি ও বিচারসঙ্গত তাহা নিরূপণ করাই উদ্দেশ্য। তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রত্যেক প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করিয়া মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নে পরিণত করেন ও তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন; এবং সেই বিচার দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু অন্বেষণ করেন না; সে জন্য প্রয়াসীও নহেন। ইহা হইল ধর্ম্মকে তত্ত্ববিদ্যার চক্ষে দেখা।

ধর্ম্মকে মানুষ আর এক ভাবে দেখিতে পারে, তাহা

ইতিবৃত্তের চক্ষে দেখা। মনে কর একজন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মানবের সভ্যতার উন্নতির ক্রম নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছেন। কিরূপে আদিম বর্ব্বর মানব-সমাজে বাণিজ্য বিকাশ পাইল? কিরূপে রাজশাসনের সৃষ্টি হইল? কিরূপে প্রণয় পরিণয়াদির বিকাশ হইল? কিরূপে আইন আদালত দেখা দিল? এই সমুদয়ের বিকাশ ও উন্নতির প্রণালী নিরূপণ করিতেছেন। সেই সঙ্গে ধর্ম্মটা কি? ইহা কিরূপে মানব-চিত্তে ফুটিল ও মানব সমাজকে অধিকার করিল? তাহাও নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিজের স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া দেহাতীত আত্মাতে বিশ্বাস, তৎপরে প্রেতযোনিতে বিশ্বাস, তৎপরে পিতৃপুরুষ পূজা, তৎপরে দেব দেবী পুজা, তৎপরে একেশ্বরবাদ, এইরূপে কি ফুটিল? কিংবা প্রাকৃতিক শক্তি সকলে চৈতন্যের আরোপ, তৎপরে প্রাকৃতিক শক্তিপূজা, তৎপরে একেশ্বরবাদ, এই প্রণালীতে কি ফুটিল?—এই প্রশ্নদ্বয়ের বিচার করিতেছেন। এই কল্পিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে সকল দেশের সকল জাতির প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইতেছে; সকল ক্রিয়া কলাপকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইতেছে; সকল সাধুর সকল সদুপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইতেছে; অথচ কিছুই তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে না। কোনও উপদেশ যে তাঁহাকে কার্য্যে অবলম্বন করিতে হইবে সে চিন্তাও তাহার মনে নাই; বরং হয়ত তিনি নিজে ঘোর সংশয়ী, তিনি ঐ সমুদায় সাধু মহাজনকে একদেশদর্শী বাতুল

মাত্র জ্ঞানে মনে মনে অবজ্ঞা করিতেছেন। অন্ধ বলদ যেমন ঘাসের বোঝা বহিয়া যায়, অথচ আহার করিতে পারে না, তেমনি তিনি আজন্ম ধর্ম্মচিন্তার ভার বহিতেছেন অথচ তদ্দ্বারা নিজের আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না! বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী লোক বহুল পরিমাণে দেখা যাইতেছে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে আর এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাহা শিল্পের চক্ষে। কেবল যে জড়জগতেই সৌন্দর্য্য আছে, প্রকৃতির মধ্যেই শোভা আছে, তাহা নহে, মানুষের মানসিক চিন্তা ও ভাবের মধ্যেও এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে। একজন বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া যদি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়টী সুচারুরূপে বিভাগ করিয়া সুযুক্তি সহকারে সমুদায় বিভাগগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহাতে যে কেবল আমাদের জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহা নহে, কিন্তু অঙ্গ-অঙ্গীর সামঞ্জস্যজনিত এক প্রকার সৌন্দর্য্যবোধও হইয়া থাকে। যাঁহারা কখনও পাহাড়ে গিয়াছেন, তাঁহারা পথ-পার্শ্ববর্ত্তী তুঙ্গ-শৃঙ্গ গিরিদেহ দেখিয়া নিশ্চয় চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। পর্ব্বতের সেই উন্নতানত পাষাণময় দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে গাম্ভীর্য্য-রস-সম্বলিত এক প্রকার চমৎ-কারিত্বের আবির্ভাব হয়। মনে হয় সেই গিরি কত শতাব্দীর বর্ষা, ঝঞ্ঝাবাত, প্রভৃতি দৈব দুর্য্যোগ সহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি উন্নত-দেহ গিরিকে দেখিয়াই

মনে গাম্ভীর্য্যরস-সম্বলিত সৌন্দর্য্য-বোধ জন্মে ? মানব-ইতিবৃত্তে যে সকল উন্নতদেহ ধর্ম্মবীর দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে কি চমৎকার-সম্বলিত গাম্ভীর্য্য-রসের আবির্ভাব হয় না ? বুদ্ধের বৈরাগ্য, মহম্মদের দৃঢ়চিত্ততা, যীশুর আত্ম-সমর্পণ, এ সকলের মধ্যে কি এক প্রকার মনোমুগ্ধকারী সৌন্দর্য্য নাই ? যে কেহ নিবিষ্টচিত্তে এই সকল চরিত্রের অনুধ্যান করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিবেন, আছে। কিন্তু অনেক লোকে ঐ সৌন্দর্য্যটুকুর ভাব গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার অতিরিক্ত যে আর কিছু চাই তাহা তাঁহাদের মনে হয় না। বুদ্ধের বৈরাগ্যের বিষয়ে চিন্তা করিয়া যখন বলিতেছ, "ওঃ কি বৈরাগ্য" তখন তুমি যে তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য তাহা তুমি ভুলিয়া যাও। ঈশ্বর যেমন নীলাকাশ ও বৃক্ষলতার হরিদ্বর্ণ দেখিবার জন্য দিয়াছেন, তেমনি কি তোমরা দেখিয়া বাঃ বাঃ করিবে বলিয়াই সাধু মহাজনদিগকে অভ্যুত্থিত করিয়াছেন ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধু জনের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে কয় দিন লাগে ? ফুলের তোড়ার ন্যায়, চরিতাবলী সংগ্রহ করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক পরিতৃপ্তি সাধন করাই কি যথেষ্ট ? না সেই সকল দৃষ্টান্তের প্রভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিয়া মানুষের ধর্ম্মজীবনের পোষণ করা উদ্দেশ্য ? চিন্তা করিয়া দেখ আমরা অনেক সময় ফুলের তোড়ার ন্যায় সাধুচরিত সংগ্রহ করি কি না, ছবি দেখার ন্যায় সাধুজীবন দেখি কি না ? আজ পর্য্যন্ত যত সাধুচরিত আলো-

চনা করিয়াছি, যদি ছবি দেখার ন্যায় আলোচনা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকিত না।

সাধুচরিতকে শিল্পের চক্ষে দেখার ন্যায় ধর্ম্মের কোমল ও কমনীয় ভাব সকলকেও মানুষ শিল্পের চক্ষে দেখিতে পারে। মানুষ ভাগবত পাঠ করিয়া ভক্তির কমনীয়তা লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে, "বাঃ, ভক্তি কি কমনীয় জিনিষ।" অথচ প্রকৃত ভক্তির সহিত পরিচয় এই পর্য্যন্তই থাকিতে পারে, ইহার অধিক না যাইতে পারে। ধর্ম্মকে এভাবে ব্যবহার করা কি শোচনীয় নহে?

সাধারণ মানুষে ধর্ম্মকে আর এক ভাবে দেখিয়া থাকে; তাহা এই যে ইহা একটা শাসন। মানুষ কর্ম্মফল ভোগের জন্য সংসারপাশে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা আবশ্যক। ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিলে সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব দারুণ ভার স্বরূপ বোধ হইলেও সে সকল নিয়ম প্রতিপাল্য। জপ, তপ, ব্রত, উপবাস এ সকলে কার সুখ হয়? সুখ না হইলেও এ সকল আচরণীয়, কারণ তদ্ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায় নাই। বিধাতা মানবের মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ এই সকল শাসন রাখিয়াছেন। মনে কর, এক ব্যক্তির দুই বৎসর কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে; তৎপরে তাহাকে বলা গিয়াছে যে যদি সে প্রতিদিন দেড়মণ পাথর এক মাইল পথ বহিয়া দিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে ছয় মাস পরেই মুক্তি দেওয়া যাইবে; তাহা হইলে কি সে মরিয়া

কুটিয়া প্রতিদিন দেড়মণ পাথর বহিয়া দেয় না? সেইরূপ মানুষ যদি জানে যে ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম সকল পালন করিলে আর সংসারপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে না, তাহা হইলে কি মরিয়া কুটিয়া সে সকল নিয়ম পালন করে না? সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে প্রতিদিন তাহাই করিতেছে।

এক অর্থে ধর্ম্ম একটা শাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধুগণ সেই ভাবেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ও ইহাকে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে মানুষ এসংসারে সচরাচর যে সকল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে, তাহার উপরে অলক্ষিত ভাবে একটা শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অনিবার্য্যরূপে নিরন্তর মানবকে দণ্ড পুরস্কার দিতেছে। সেই শাসনের অধীন হওয়াই ধর্ম্ম। সেই গূঢ় আধ্যাত্মিক শাসনের দ্বারা মানবের উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে ও আশাসিত কার্য্য সকলকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য। এই অর্থে ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, মূলে আত্ম-সংযম, পশুজীবন হইতে দেবজীবনের দিকে গতি।

কিন্তু আমি অগ্রে যে শাসনের কথা বলিয়াছি, তাহা এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় শাসনকে মনে করিয়া বলি নাই, তাহা বাহ্য ক্রিয়া ও নিয়মের দুরন্ত পেষণ। যাহার ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণের সাধ্য নাই, তাহার পক্ষে এই বাহ্য ক্রিয়ার পেষণও ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ কেবল

ভোগসুখে রত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকা অপেক্ষা এটা কি ভাল নয়, যে মানুষ এক একবার ইহা মনেও করে যে এ জগতে তাহার ইচ্ছার উপরে আর একটা ইচ্ছা আছে, এবং অনিচ্ছাতেও তাহার শাসনাধীন থাকিতে হইবে? উদ্দাম প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র মানব-কুলের পক্ষে এ শিক্ষাও মহাশিক্ষা। এইমাত্র বক্তব্য যে, ধর্ম্মকে এইরূপ শাসন ও পেষণের যন্ত্ররূপে দেখিলে ইহার প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভব করা যায় না এবং ইহাকে প্রকৃত ভাবে দেখা হয় না।

সর্ব্বশেষে ধর্ম্মকে আর একভাবে দেখা যায়, তাহা জীবনের উৎসরূপে। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া যাহা করা যায় না, অনেক সময়ে প্রেম ভিতর হইতে কার্য্য করিয়া তাহা করিয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রীতি যখন জীবন্ত শক্তিরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে নবভাব দেয়, সেই নব-ভাব জীবনের সকল বিভাগেই প্রবেশ করে। সে মানুষের চিন্তা চিরদিনের অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার ভাব ও আকাঙ্ক্ষা নবীভূত হইয়া নূতন পথে বিচরণ করিতে থাকে, তাহার কার্য্য সকল নূতন প্রকার ভাব ধারণ করে। যে চিন্তা বা যে ভাব বা যে কার্য্যটী সে হৃদয় হইতে প্রসূত হয় সেইটীই অল্পাধিক পরিমাণে সেই হৃদয়বাসী প্রেমের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া আসে।

ধর্ম্ম যখন প্রাণে বাস করিয়া জীবনের উৎসরূপে কার্য্য করে, তখন পারমার্থিক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য এই উভ-

য়ের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায়; তখন সকল কার্য্য ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে; এবং সকল কার্য্যের মধ্যেই একটা মহৎ পারমার্থিক ভাব প্রবিষ্ট হয়। হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-প্রীতিকে এইজন্য উৎস বলা যাইতেছে, যে ইহা হইতে সাধুতার প্রতি প্রেম, সাধুদের প্রতি প্রেম, সকলি উৎসারিত হইতে থাকে। তখন আর কেবল মাত্র তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার উদ্দেশে ধর্ম্মের আলোচনা সম্ভব থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান প্রেমালোকে উজ্জ্বল হইয়া ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা সম্পাদন করে। হৃদয়ে প্রেমের উৎস একবার খুলিলে, ছবি দেখার ন্যায় সাধুচরিত আলোচনা করা সম্ভব থাকে না; তখন প্রত্যেক সাধুর চরিত্র জীবন্ত শক্তির ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুলতাকে উদ্দীপিত করে ও ধর্ম্মজীবনের পক্ষে সহায় হয়। ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম ও শাসন সকল তখন আর ভারস্বরূপ বোধ হয় না। আত্মা সে সকলের আচরণে আনন্দ লাভ করিতে থাকে; নীতি আর মানবের আইনে লিখিত নিয়ম থাকে না; কিন্তু অন্তর হইতে প্রসূত জীবনরূপে পরিণত হয়।

ধর্ম্ম কি ভাবে অন্তরে থাকিয়া কার্য্য করে তাহার ভাব দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রথম, ধর্ম্মকে মানব-দেহের রক্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রক্তস্রোত রক্তাধার হইতে উৎসারিত হইয়া সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হয়। ঐ রুধির দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য

করে ; চক্ষে জ্যোতি দেয়, হস্তে বল দেয়, মস্তিষ্কে তেজ দেয়। একই রক্ত সুস্থ মানব শরীরে বিবিধ আকারে প্রকাশ পায় এবং বিবিধ কার্য্যকে প্রকাশ করে, কিন্তু মূলে সেই একই রক্ত। অকপট ঈশ্বর-প্রীতি যখন মানব-হৃদয়ে বাস করে, তখন তাহারও কার্য্য কতকটা সেইরূপ। তখন আর মানুষের এক একটী কথা, বা এক একটী কাজকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সামলাইতে হয় না ; হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-প্রীতি বা ধর্ম্মই সকলকে সামলাইয়া লয়। সুস্থ ব্যক্তিকে অন্ন জল দিয়া যেমন আর পৃথক পৃথক রূপে ভাবিতে হয় না, ইহার চক্ষে জ্যোতি কিরূপে আসিবে, হস্তে বল কিরূপে পাইবে, মস্তিষ্কের চিন্তা-শক্তি কিরূপে বাড়িবে, সেই অন্ন জল রুধির রূপে পরিণত হইয়া সকল কার্য্যই সাধন করে ; তেমনি অকপট ঈশ্বর-প্রীতি হৃদয়ে থাকিলে আর পৃথক পৃথক রূপে ভাবিতে হয় না, এ মানুষ অমুক অবস্থায় কি করিবে ? সেই প্রীতিই আলোক-স্বরূপ হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয় ও পাপ প্রলোভনকে অতিক্রম করিবার শক্তি দেয়।

হৃদয়-নিহত ধর্ম্মকে যেমন রুধিরের স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, তেমনি ইহাকে জীবনের অন্তরালবর্ত্তী সূত্রও বলা যাইতে পারে। পুষ্প সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, সূত্র গাছি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগকে মালারূপে পরিণত করে ; শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়। তেমনি ধর্ম্ম যখন অদৃশ্য সূত্রের ন্যায় অন্তরালে থাকিয়া

আমাদের কর্ম্ম সকলকে নিয়মিত করে, তখন সেই সকল কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য থাকে। সূত্র যেমন গোপনে থাকে, তাহাকে কেহ দেখে না, তাহার কার্য্যই দেখে, তেমনি ধর্ম্মও গোপনে থাকেন, তাঁহার কার্য্যই সকলে দেখে।

এ জগতে সুখ দুঃখ সকলেই পায়, ভাল মন্দ সকলেই দেখে। মানবের অন্তরে এমন একটা কিছু থাকা উচিত যাহার গুণে মানুষ সর্ব্বদাই মন্দটাকে বর্জ্জন করিয়া ভালটাই পছন্দ করিবে। ভিতরকার এই জিনিসটাই ধর্ম্ম। শিক্ষারও এই উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন সন্তানদিগকে সংসারে মন্দটা দেখিতে দেওয়া হইবে না; তাহা হইলেই তাহারা ভাল থাকিবে। এজন্য তাঁহারা সন্তানদিগকে সর্ব্ববিধ সংস্রব হইতে দূরে রাখেন। বালক বালিকার এমন একটা বয়স আছে যখন সতর্কতার সহিত এইরূপে মন্দটা না দেখিতে দেওয়া ভাল; কিন্তু এরূপ শিক্ষা অধিক দিন চলে না। এমন দিন আসে যখন সকল মানুষকে সংসারে কাজ করিতে হয়, ভাল মন্দ দুই দেখিতে হয়। তখন যদি অন্তরে মন্দটা বর্জ্জন করিয়া ভালটা লইবার উপযুক্ত কিছু না থাকে তাহা হইলে কে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে? এজন্য অন্তরে সেই বস্তু যাহাতে জন্মে সে জন্য মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অগ্রেই বলিয়াছি এই বস্তুই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অন্তরে থাকিলে যেগুলি আপনায় সেইগুলি বাছিয়া লয়, এবং সেগুলিকে গ্রথিত করিয়া চরিত্রের সৌন্দর্য্যরূপে পরিণত করে।

যদি মানুষের এই ভিতরের সূত্রগাছি একবার ধরিতে পার তবে নির্ভর করিতে পার যে জীবনের বিবিধ ঘটনা ও বিবিধ অবস্থার মধ্যে সে মন্দকে বর্জ্জন করিয়া :ভালকে গ্রহণ করিবেই করিবে। ইহা হইতেই মানব-চরিত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অপরে একজনকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করে, তাহার কর্ম্মের প্রতি অবিচলিত আস্থা স্থাপন করে, কিন্তু তোমার প্রতি সেরূপ করে না, ইহাতে তুমি দুঃখ কর, দুঃখ কেন কর? অনুসন্ধান করিয়া দেখ ধর্ম্ম তোমার অন্তরে জীবনের সূত্ররূপে কাজ করিতেছে কি না? মানুষের বিশ্বাসটা জোর করিয়া হয় না, সেটা জিনিস দেখিলেই হয়। সে জিনিসটা তুমি যতই পাইবে ততই বিশ্বাস-ভাজন হইবে। তখন আর দুঃখ করিতে হইবে না, বিশ্বাস করুক বলিয়া ইচ্ছা করিতে হইবে না, বিশ্বাস করিল কি না চিন্তা করিতেও হইবে না, অগ্নি জ্বলিলে বায়ু যেমন স্বভাবতঃই আসে, তেমনি ধর্ম্ম দেখি-লেই মানবের বিশ্বাস আপনি আসিয়া যুটিবে। ঈশ্বর করুন এই বস্তু আমরা হৃদয়ে পাই।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের আলোক

এ ব্রহ্মাণ্ডকে কে প্রকৃত চক্ষে দেখিয়া থাকেন? যিনি ইহাকে খণ্ডভাবে দেখেন, যিনি মনে করেন ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কার্য্য করিতেছে, মূলে কোনও নিয়ামক শক্তি নাই, কোনও ঐক্য নাই, তিনি কি ইহাকে ঠিক দেখেন? অথবা যিনি মনে করেন ইহা একই শক্তির ক্রীড়াভূমি, একই জ্ঞান ও একই প্রেম ইহাকে আপনার মহা আবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তিনি ইহাকে ঠিক দেখেন?

এই এক গুরুতর বিষয়ে প্রাচীনে ও নবীনে ঘোর প্রভেদ ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালের মানুষ এ ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাবে দর্শন করিতেন, নবীন কালের মানুষ আর সে ভাবে দর্শন করেন না। বেদ-মন্ত্র সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, উক্ত মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ প্রকৃতির শক্তি সকলের পরস্পর হইতে পৃথক রূপে ধারণা করিয়া তাহাদের স্তুতি করিতেছেন। তাঁহারা দেখিতেন মেঘ বারিবর্ষণ করে, যদ্দ্বারা মেদিনী ফল-শস্যশালিনী হয়, ঊষা সূর্য্যালোককে আনয়ন করে, যদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও জীবের জীবন রক্ষা হয়, বায়ু মেঘকে বহন করে, যদ্দ্বারা নানা দেশে ও নানা ক্ষেত্রে বৃষ্টি ধারা পতিত হয়, সুতরাং তাঁহারা ভাবিতেন ইঁহারা সকলেই মানবের বন্ধু এবং

সকলের মধ্যে একপ্রকার সখ্যভাব আছে। আবার যখন দেখিতেন যে শক্তি এক সময়ে হিতকারী তাহাই অপর সময়ে ঘোর অনর্থকারী, যে বায়ু এক সময়ে মেঘকে বহন করে, প্রাণকে ধারণ করে, সেই বায়ুই প্রভঞ্জনরূপ ধারণ করিয়া অপর সময়ে ত্রিভুবনকে কম্পিত করে ; যে মেঘ এক সময়ে শান্তি ও উর্ব্বরতা বিস্তার করে, তাহাই অপর সময়ে দারুণ অশনি নিক্ষেপ করে ; যে অগ্নি এক সময়ে আহুতি বহন করে তাহাই অপর সময়ে দাবানলরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যানী দগ্ধ করে ; তখন মনে করিতেন দেবগণ নিশ্চয় কুপিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য স্তুতি আবশ্যক। আদিম কালের মানুষ যখন প্রথমে অনুভব করিল যে এ জীবনটা আমাদের হাতে নয়, ইহার সুখ দুঃখ, জরা মরণ ব্যাধি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তখন মনে করিল তবে ইহা ঐ সকল প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তী শক্তি সকলেরই ইচ্ছাধীন। এ কারণে জীবনের সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখে, জয় পরাজয়ে, উত্থান পতনে, দেবগণের অর্চ্চনার নিয়ম প্রচলিত হইল।

এ নিয়ম সর্ব্বদেশের পক্ষেই খাটিয়াছে, এখনও অনেক বর্ব্বর জাতি জগতে রহিয়াছে যাহারা এইরূপ খণ্ড ভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতেছে।

প্রাচীন পারসীদিগের ন্যায় কোন কোনও জাতি মানবের হিত ও অহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে দুই বিরোধী শক্তির রণক্ষেত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। আহুরা মাজদা

মানবের কল্যাণ করিতে চান, আহিরমান তাহার বিরোধী। সুতরাং সুখকর যাহা কিছু তাহা আহুরা মাজদার সৃষ্টি, দুঃখকর যাহা কিছু তাহা আহিরমানের কার্য্য। যিহুদী জাতি প্রাচীন পারসীকদিগের নিকট হইতে ঈশ্বর ও শয়তানের মত গ্রহণ করে। তাঁহাদের শাস্ত্র হইতে ইহা খ্রীস্টান ধর্ম্ম ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। আমার বোধ হয় প্রাচীন পারসীক সংস্রব হইতেই ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যে দেব অসুরের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, পুর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন ধর্ম্ম সকল ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ড ভাবেই দেখিতেন; একই জ্ঞান ও একই প্রেম যে জগতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে তাহা অনুভব করিতেন না। কেবল প্রাচীন ধর্ম্ম সকলেরই উল্লেখ করি কেন? প্রাচীন বিজ্ঞানও এ বিষয়ে অন্ধ ছিল। প্রাচীন বিজ্ঞানও মনে করিত যে ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। জগৎকে এইরূপ খণ্ড ও ক্ষুদ্র ভাবে দেখাতে জগৎ কারণের অনাদিত্ব ও অনন্ততার ভাব প্রাচীনদের নিকট সেরূপ প্রতিভাত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রবল হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ডভাবে দেখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রাকৃতিক শক্তি সকল প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন দেখাইলেও মূলে এক। সুতরাং শক্তির ক্রীড়াভূমি যে ব্রহ্মাণ্ড তাহাও এক; সর্ব্বত্র

একপ্রকার কার্য্যই চলিতেছে। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে ফলটী ধরাপৃষ্ঠে পড়িতেছে, সেই নিয়মেই গ্রহগণ সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহা কি পরমাশ্চর্য্যময় তত্ত্ব নয়? তৎ-পরে যদিও জ্ঞানিগণ বিচার কালে ব্রহ্মাণ্ডকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার করিতেছেন, তথাপি এ সকল বিভাগ পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, যে এক বিভাগকে পূর্ণ জানিতে গেলেই সকল বিভাগকে জানিতে হয়। একটী তৃণকণা হস্তে করিয়া যদি তাহার তত্ত্ব বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাও, দেখিবে তাহার রূপের বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই সূর্য্যালোকের তত্ত্ব জানা আবশ্যক, সূর্য্যালোককে বুঝিতে গেলে, ঈথর ও তাড়িতের তরঙ্গের তত্ত্ব বোঝা আবশ্যক, হয়। এই রূপে মানুষ যেমন খাল দিয়া যাইতে যাইতে নদীতে গিয়া পড়ে, নদী দিয়া যাইতে যাইতে মহানদীতে উপনীত হয়, এবং অবশেষে মহা সিন্ধুজলে গিয়া পড়ে, যেখানে আর কুল কিনারা দেখা যায় না, সেইরূপ সেই আশ্চর্য্যময় পুরুষের এই আশ্চর্য্যময় জগতে, একটা ক্ষুদ্র বিষয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে গেলেই কূল-কিনারা হীন জ্ঞানসিন্ধুতে মন নিমগ্ন হইয়া যায়। এই জন্যই বলি এ জগতে মানব-জীবন অনন্ততা ও অজ্ঞেয়তার দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যেমন সাগর মধ্যে দ্বীপ, তেমনি অপার জ্ঞানসিন্ধুর মধ্যে মানব-জীবন। ব্রহ্মাণ্ড বাহিরের রূপ মাত্র, অন্তরে একই শক্তির মহা-প্লাবন।

একথা কি বলা যায় না যে ব্রহ্মাণ্ডের এই একত্ব ও অখণ্ডত্বের জ্ঞান যাহার নাই তাহার চক্ষে এ জগতকে প্রকৃত-রূপে দেখিবার আলোকই নাই? যিনি দেখিতেছেন যে, সূত্র যেমন মণি সকলকে গ্রথিত করিয়া মালা করিয়া রাখে, তেমনি একই জ্ঞান, একই শক্তি খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে থাকিয়া বিভিন্ন অংশকে গাঁথিয়া এক করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকৃত ভাবে দেখিতেছেন। তেমনি মানব-জীবনের দেখিবারও একটী আলোক আছে। মানব-জীবনের বিষয়ে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, এই জীবনের ন্যায় গভীর রহস্য আর নাই। জীবন দেহে বাস করে বটে কিন্তু ইহা কি দৈহিক ধাতু সকলের সংমিশ্রণের ফল? যেমন চূণ ও হরিদ্রা মিলাইয়া লোহিত বর্ণ প্রস্তুত কর, অথবা পাঁচটী পদার্থ মিলাইয়া ঔষধ প্রস্তুত কর, এবং নিশ্চয় জান তাহার পিত্তঘ্নতা শক্তি জন্মিল, তেমনি কি বলিতে পার কতটা অস্থি, কতটা মাংস, কতটা মেদ, মিলিলে জীবনকে উৎপন্ন করে? যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া বট বৃক্ষটীর দেহ রচনা হইয়াছে, সে সকল উপাদান ত ঐ পৃথিবীতে ঐ বায়ুতে ও ঐ জলস্রোতে ছিল, এত দিন বটবৃক্ষের দেহ গঠিত হয় নাই কেন? জীবন্ত বীজটী পড়িল, অমনি বিক্ষিপ্ত উপাদানরাশি একত্রিত হইতে লাগিল। তবে দেখ; অগ্রে জীবন তৎপরে দেহ। মানব-জীবন কতদিকে কত বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ! প্রথম সম্বন্ধ এই দেহের সঙ্গে, যাহার উপচয় ও অপচয়ের দ্বারা জীবন রক্ষা হইতেছে; তৎপরে সম্বন্ধ

এই জগতের সঙ্গে; বাহিরে যদি অন্ন জল না থাকিত, দেহে ক্ষুধা পিপাসা থাকিয়া কি হইত? দেখিতেছি মানব-জীবন যাহা চায়, জগত তাহা ধারণ করিতেছে। দুইপাটী দাঁতের পরস্পর গঠন দেখিলেই যেমন বোধ হয় এক পাটী অপর পাটীর জন্য, তেমনি মানব-জীবন ও জগত উভয়কে একত্র বিচার করিলেই দেখা যায় যে এক অপরের জন্য। এ আশ্চয্য সম্বন্ধ ও এ অপূর্ব্ব নির্ভর কে স্থাপন করিল? মানুষ নিজে কি স্থাপন করিয়াছে?

তৎপরে ভাবিয়া দেখ কেবল এই জড় জগতের সহিত মানব-জীবনের সম্বন্ধ নয়, মানব সমাজের সঙ্গেও দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ। ব্যাঘ্রের শিশুটির যদি কেবল স্তন্য দান করিয়া পালন করিবার জন্য মাতা থাকে, তাহা হইলেই হইল, ব্যাঘ্র-সমাজ বলিয়া একটী সমাজ থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই কারণে ব্যাঘ্র-সমাজ বলিয়া সমাজও নাই। কিন্তু মানব-জীবনের অবস্থা অন্য প্রকার। মানব-সন্তানের প্রত্যেককে যদি জমি চষিয়া, বীজ বপন করিয়া, শস্য কর্ত্তন করিয়া, তবে ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয়, অথবা বনে বনে, ছুটিয়া পশুহত্যা করিয়া তাহাদের চর্ম্মের দ্বারা বা কার্পাসের চাষ করিয়া, তন্তু বুনিয়া, বস্ত্র করিয়া তদ্দ্বারা শীত নিবারণ করিতে হয় তবে আর কাহারও বাচিবার সম্ভাবনা থাকে না। এ জগতে মানব-জীবনের স্থিতি ও উন্নতির জন্য এই জড় জগতটার যেমন প্রয়োজন, মানব-সমাজেরও তেমনি প্রয়োজন। অতএব জড়রাজ্যের শক্তি

সকলই যে কেবল একীভূত তাহা নহে ; জড় জগত ও মানব-সমাজও একতাসূত্রে মানব-জীবনের সহিত গ্রথিত।

আরও অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কেবল যে এই জড়জগতের সঙ্গে ও মানব-সমাজের সঙ্গে মানব-জীরনের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা নহে ; সেই সম্বন্ধকে নিয়মিত ও সুফলপ্রদ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়মও রহিয়াছে। জড় জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মকে আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম বলি ; মানব-সমাজের সমন্ধ বিষয়ক নিয়মকে নৈতিক নিয়ম বলি। ইহা কি সহজেই অনুমান করা যায় না, যে যিনি মানব-জীবনের সহিত জগতের ও জন-সমাজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই উক্ত উভয় প্রকার নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। তবে ত মানব-জীবন প্রবং মানব-জীবনের সমুদায় সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য এক মহা জ্ঞানের মহা বিধানের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। এ কথা কি বলা যায় না, এই পরমতত্ত্ব বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ, মানব-জীবনকে দেখিবার উপযুক্ত আলোক তাহার নিকট নাই ?

এই মহা বিধান লক্ষ্য করাই ধর্ম্ম। অতএব কেবল জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ধর্ম্মই জীবনের আলোক। কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়াই যে আমরা এই কথার সত্যতা অনুতব করি, তাহা নহে ; প্রেমের দিক দিয়া দেখিলেও এ কথা অতীব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

প্রেম যে মানুষের চক্ষের আলোক হইয়া কার্য্য করে,

তাহার নিদর্শন আমরা প্রতি দিন প্রাপ্ত হইতেছি। যেখানে প্রেমহীন মানুষ কাণা, প্রেমিক সেখানে চক্ষুষ্মান। একবার কতকগুলি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ইউরোপীয় দস্যু, আমেরিকার কোনও জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সে দেশের আদিম অধিবাসীদের গ্রামে পড়িয়া, মারিয়া, কাটিয়া, কতকগুলি হতভাগ্য নরনারীকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার জন্য বন্দী করিয়া লইয়া গেল। ঐ হতভাগ্য বন্দীদিগের মধ্যে এক হতভাগিনী নারী ছিল; তাহার পতি তখন বনে কাট কাটিতে গিয়াছিল; নর-রাক্ষসগণ তাহার অসাহায় শিশুসন্তানগুলিকে একস্থানে পাঠাইল ও তাহার হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া, নৌকাতে ফেলিয়া, তাহাকে আর এক স্থানে লইয়া গেল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত; তাহার সন্তানগণ যে স্থানে রহিল, রমণী তাহা জানিত বটে, কিন্তু মধ্যে পনর যোল মাইল ঘোর অরণ্য ব্যবধান। রাত্রিকালে তন্মধ্যে পথ নির্ণয় করা দূরে থাকুক, দিনের বেলাই সে পথে গমন করা দুর্ঘট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই রাত্রি প্রভাত হইবার সময়ে দেখা গেল, শিশুগুলি যে গৃহে বন্দী আছে, মাতা তাহার চতুঃস্পার্শে ঘুরিতেছে। কে তাহাকে সেই রাত্রে যোল মাইল ঘোরারণ্য পার হইয়া আসিতে সমর্থ করিল? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল? কে তাহাকে দুর্ভেদ্য সাহস-বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিল? মাতৃস্নেহ কি নয়?

আর একটী ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহাও এই প্রকার

হৃদয়াদ্র্কারী। সুপ্রসিদ্ধ ক্রমওয়েল যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন কোনও অপরাধে একজন সৈনিকের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা হয়। তখন সন্ধ্যার সময় ইংলণ্ডের নানা স্থানে "কারফিউ" ঘণ্টা নামে একপ্রকার ঘণ্টা বাজিত। ভজনালয়ের উচ্চ-শৃঙ্গ স্তম্ভোপরি এক একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা লম্বমান থাকিত; ঠিক সন্ধ্যার সময় সেগুলি বাজান হইত। ঐ হতভাগ্য সৈনিকের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, যে "কারফিউ" ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইলেই তাহাকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু সে দিন আর "কারফিউ" ঘণ্টা বাজিল না। যে বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রতি উহা বাজাইবার ভার ছিল, সে প্রাণপণে বাজাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না। সে ব্যক্তি অন্ধ ও বধির, ভাল বুঝিতে পারিল না বাজিল কি না। এদিকে ক্রমওয়েল বধ-স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া "কারফিউ" ঘণ্টার ধ্বনির অপেক্ষা করিতেছেন, কেন বাজে না? বাজিবে কি! একটী যুবতী স্ত্রীলোক সেই তুঙ্গশৃঙ্গ স্তম্ভোপরি আশ্চর্য্য উপারে উঠিয়া ঘণ্টাতে জড়াইয়া আছে। সে শৃঙ্গে মানুষ উঠিতে পারে না। কিরূপে যে সে নারী সেখানে উঠিল, কেহ জানে না। ঐ রমণী কে? ও এই সৈনিকের প্রণয়াবদ্ধা ভাবী পত্নী। আর কিছুদিন পরেই তাহাদের বিবাহ হইবার কথা। দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইলে, ঐ রমণী স্বীয় প্রণয়ীকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়ে নাই; অনুনয় বিনয়, আবেদন, প্রার্থনা, কাতরোক্তিতে যাহা হয় সমুদায় করিয়াছে। কিছুতেই কিছু হয় নাই। তখন গত্যন্তর

না দেখিয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। বৃদ্ধ ভৃত্য জোরে ঘণ্টা নাড়িলে, রমণীর হস্তে ও মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে; তাহাতে শরীর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে; তথাপি সে ঘণ্টা ছাড়ে নাই। অবশেষে ক্রমওয়েল যখন "কারফিউ" না বাজিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ রমণী নামিয়া আসিয়া তাঁহার সমক্ষে জানু পাতিয়া, যেরূপে সে সেই স্তম্ভে আরোহণ করিয়াছিল, যে রূপে ঘণ্টা আলিঙ্গন করিয়া ছিল, ও তন্নিবন্ধন আঘাত পাইয়াছে, সমুদায় নিবেদন করিল। ক্রম-ওয়েল যখন সেই স্তম্ভে আরোহণের বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! প্রেমের খাতিরে তোমার প্রণয়ীর প্রাণ দান করিলাম; আজ আর "কারফিউ" বাজিবেনা।" তদবধি 'আজ আর "কারফিউ" বাজিবেনা' এই উক্তিটী ইংলণ্ডের প্রজাকুলের মধ্যে একটী পবিত্র পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করি কে ঐ রমণীকে তুঙ্গশৃঙ্গ আরোহণের পথ দেখাইয়া দিল? প্রেম কি নয়? তুমি আমি কলিকাতার ন্যায় একটা মহা সহরে প্রতিদিন কত লোকের সঙ্গে মিশি; সকলেই কি আমাদিগকে চেনে? তোমরা সকলেই কি আমাকে চেন? হয়ত বলিবে কেন চিনিব না, আপনার নাম অমুক, অমুক গ্রামে আপনার বাস, আপনি অমুক ব্যক্তির পুত্র, আপনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। এই হইলেই কি আমাকে চেনা হইল? যাঁহারা সর্ব্বদা এক পাড়ায় আমার সঙ্গে বাস করিতেছেন, সর্ব্বদা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা কি আমাকে চেনেন?

মানুষে মানুষ চেনাটা কি এত সহজ কথা ? যে আমাকে ভাল বাসে না, সে আমাকে চেনেনা ; আমাতে যা ভাল আছে তাহা দেখিবার চক্ষু তার নাই। সে হয়ত সর্ব্বদাই আমার কার্য্যে একট মলিন অভিসন্ধির আরোপ করিবে, আমার গুণাবলীকে লঘু করিয়া দেখিবে, লঘুদোষকে গুরুতর করিবে। ইহা ইহলে কি মানুষকে চেনা যায় ? যে দুই চারিজন আমাকে অকপটে ভাল বাসেন, তাঁহারাই আমাকে চেনেন ; আমার অভিসন্ধি প্রভৃতি তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

প্রীতি থাকিলে যেমন মানুষ মানুষকে চেনে, তেমনি হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-প্রীতির চক্ষে এই জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, ইহার গূঢ় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমহীন নাস্তিক-তার চক্ষে মানব-জীবনকে দেখ, ইহাতে মনোমুগ্ধকারী কিছুই নাই। ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকার মধ্যে মানব কারারুদ্ধ ; দুর্জ্জয় শক্তি সকল নিরন্তর তাহাকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে ; মান-বের ইচ্ছাকে দলন করিতেছে ; শক্তিকে পরাভূত করিতেছে ; সমুদয় চেষ্টাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে ; মানব নিরুপায় হইয়া ঘোর অন্ধকারে জুওলজিকাল গার্ডেনের ব্যাঘ্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় প্রাচীরে আঘাত করিতেছে; যাতনায় চীৎকার করিতেছে ; সাড়া শব্দ দিবার বা উদ্ধার করিবার কেহ নাই ; লৌহময় প্রাচীরে আঘাত করিয়া শক্তিক্ষয় ভিন্ন অন্য ফল নাই। এরূপ জীবন্ যাপন অপেক্ষা আত্মহত্যাই কি শ্রেয় নয় ? এই নাস্তিকের মানব-জীবনকে প্রেমের চক্ষে দেখ, দেখিবে ইহা

মহাজ্ঞান ও অসীম প্রেমের ক্রোড়ে রক্ষিত। সেই জ্ঞান ও সেই প্রেম জগৎ ও মানব-সমাজকে মানব-জীবনের অনুকূল করিয়া দিয়াছে; সেই জ্ঞান ও সেই প্রেম মানব-জ্ঞানের জন্য সত্যকে, মানব হৃদয়ের জন্য সৌন্দর্য্যকে, ও মানব আত্মার জন্য ধর্ম্মকে রাখিয়াছে। দুই দৃষ্টিতে কত প্রভেদ! মন্দ ও ভালর মধ্যে যে দৃষ্টি ভালটাকে অধিক দেখে, নিরাশা ও আশার মধ্যে আশার কারণ অধিক পায়, সেই দৃষ্টিই কি প্রার্থনীয় নয়? যাহা অন্ধকারে মনকে নিমগ্ন করে, হৃদয়কে তিক্তভাবে পূর্ণ করে, জগত ও মানবকে কুৎসিত সাজে সজ্জিত করে, এবং হৃদয়কে বিরস ও বিষাদময় করে, তাহাই কি প্রার্থনীয়? অনেকে বিজ্ঞতার অভিমান করিয়া মনে করেন মানুষের মন্দটা অপেক্ষা ভালটা দেখা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। সর্ব্বদাই এরূপ উক্তি শুনিতে পাই, যে অমুক নিজে সাধু পুরুষ বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন না, অসৎকে সৎ বলিয়া মনে করেন ও শেষে প্রতারিত হন; আমাতে সে নির্ব্বুদ্ধিতা নাই; আমি শুঁকিয়া লোকের দুষ্টামি বাহির করিতে পারি; পাছে কেহ ঠকায় এই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকি; আমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করি, এজগতে অপরকে ঠকান অপেক্ষা নিজে ঠকা কি ভাল নয়? অপরকে মন্দ ভাবিয়া হৃদয়কে সন্দিগ্ধ ও বিষাক্ত করিয়া রাখা অপেক্ষা, সাধুতাতে বিশ্বাস রাখিয়া হৃদয়টা সরস রাখা কি ভাল নয়? পরের দোষ চিন্তন দ্বারা তাহার প্রতি ঘৃণা ও নিজের প্রতি আত্মশ্লাঘা বাড়ান অপেক্ষা, পরের গুণ চিন্তাদ্বারা তাহার

প্রতি প্রেম ও নিজ হৃদয়ে বিনয় বাড়ান কি ভাল নয়? অপরের ভালটা অপেক্ষা মন্দটা অধিক দেখা প্রেমহীন নাস্তিকতার একটা ব্যাধি বিশেষ; এ ব্যাধিতে ঈশ্বরবিশ্বাসীদিগকে যেন ধরে না। একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন;—

যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

অর্থাৎ যে চাতুরীদ্বারা মানুষের ইহলোক পরলোক উভয় লোকের কল্যাণ সাধিত হয় সেই চাতুরীই চাতুরী। যে চাতুরী কেবল এ পৃথিবীর স্বার্থ-সাধনে ও স্বার্থরক্ষাতে সমর্থ করে, কিন্তু হৃদয়কে বিষাক্ত ও তিক্ত করিয়া আত্মার অধোগতি করে, তাহা চাতুরী নহে, ঘোর মূর্খতা।

ঈশ্বর-প্রীতি হৃদয়ে বাস করিলে যে কেবল মানুষকে চিনিবার সাহায্য হয় তাহা নহে; সেই প্রীতি আলোকস্বরূপ হইয়া সাধু, শাস্ত্র, প্রভৃতি সমুদয়ের গূঢ় সৌন্দর্য্যবোধ বিষয়ে সহায়তা করে। এই জগতের শাস্ত্র সকল এক একটী সিন্দুকের ন্যায়; যাহার হাতে ঈশ্বর-প্রীতি নাই, তাহার হস্তে ঐ সিন্দুকের চাবি নাই, যদ্দ্বারা সে খুলিয়া মূল্যবান জিনিসগুলি দেখিতে পারে। ঈশ্বর-প্রীতির অঞ্জনে আত্মার চক্ষু অনুরঞ্জিত হইলেই, আমরা আপনার লোক, ভাই, বন্ধু, গুরু, আচার্য্য সমুদয় চিনিয়া লইতে পারি; তদভাবে আমরা কাণা; রাতকাণার ন্যায় পথ থাকিতে বিপথে ঘুরিয়া মরি।

ধর্ম্ম মানব-জীবনের শক্তি

দেখিতে পাই, এই তর্ক সর্ব্বদাই উঠে যে নীতির সহিত ধর্ম্মের কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে কি না? এক শ্রেণীর লোক ইহা পতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নীতি ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে; এবং জগতের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, যে ধর্ম্মভাবের উন্নতির দ্বারা নীতির উন্নতি না হইয়া জ্ঞান বিস্তারের দ্বারাই সেই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মের ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যযুগের ও অপরাপর ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে দেখি, যে সকল যুগে ধর্ম্মভাবের খুব প্রবলতা দেখা গিয়াছে, সেই সকল যুগেই বিবিধ দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে। অপর শ্রেণী বলেন, যে ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে সম্বন্ধ এরূপ অকাট্য ও এরূপ ঘনিষ্ঠ যে, ধর্ম্ম যদি না থাকে, তাহা হইলে নীতিও থাকিবে না; যেন মানুষ মানুষকে ধরিয়া থাকিবে না, এবং গৃহ পরিবার, সমাজ এ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎসন্ন যাইবে। আমরা বলি, মানব-হৃদয়ে ধর্ম্ম-বিশ্বাস, অর্থাৎ জগত ও মানবাত্মার পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলেই যে সামান্য নীতিও থাকিবে না, এরূপ ভাবা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেটা স্বাভাবিক সেটা কে অতিক্রম করিতে পারে? বায়ুর ভার আছে একথা যে না জানে, সে কি পৃথিবীতে

চলিতে পারে না, বা তাহার হৃৎপিণ্ডে বায়ু যায় না? প্রেমে মানুষকে নিঃস্বার্থ করে একথা যে জানে না, সে কি দাম্পত্য প্রেমে আবদ্ধ হইবে না, বা স্ত্রীপুত্রকে প্রীতি করিবে না? দাম্পত্য প্রেমটা মানব-হৃদয়ে যেমন স্বাভাবিক, সদ্‌সদ্বিচারটাও তেমনি স্বাভাবিক। যেমন না জানিয়া প্রেমে আবদ্ধ হইবে, তেমনি না জানিয়া সদ্‌সদ্বিচার করিবে; সুতরাং সাধারণ নীতি থাকিবেই। বিশেষতঃ আবার ইহাও জানা উচিত, যে তুমি আমি যে এই এখানে বসিয়াছি, দোষে গুণে জড়িত যাহা কিছু দাঁড়াইয়াছি, তাহার পশ্চাতে দেশের ও জাতির কত শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কার রহিয়াছে! কোনও কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন, যাহা এক সময়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত, ভ্রান্তি ও পতনের মধ্যে উপার্জ্জিত, তাহাই পরবংশীয়দিগের দেহ মনের গঠনের মধ্যে নিহিত হয়; এক সময়কার শিক্ষা-লব্ধ জিনিস আর এক সময়ে স্বাভাবিক সংস্কাররূপে পরিণত হয়; এ মত অনেক পরিমাণে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। তাহা হইলে আজি যদি ধর্ম্মসংস্কার উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও বহুকাল ধরিয়া সাধারণ নীতির স্বাভাবিক গতি আমাদের মধ্যে থাকিতে পারে। যাঁহারা দুই একজন প্রতিভাশালী নীতিমান নাস্তিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, দেখ ধর্ম্ম-বিশ্বাস মূলে নাই অথচ কেমন উজ্জ্বল নীতি; পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব তাঁহাদের আলোচ্য। তাঁহাদের মনে করা উচিত ঐ সকল ব্যক্তি কিরূপ সমাজে জন্মিয়াছেন, কিরূপ হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত

হইয়াছেন, জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে কিরূপ ভাব ও মানসিক গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, নীতি ধর্ম্ম বিনা থাকিতে পারে কি না, এই তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াও একথা বলা যাইতে পারে, যে মূলে এমন একটী স্থান আছে যেখানে পাষাণময় ভুমির উপরে নীতির ভিত্তি স্থাপিত। অথবা এই কথা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়, যে সেখানে নীতি ও ধর্ম্ম এক। যখন কোনও রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু দুর্ব্বল থাকে, তখন চিকিৎসক বলিয়া যান "আর কিছু করিতে হইবে না ; ভাল করিয়া খাইতে দেও, তাহা হইলে সারিয়া উঠিবে।" এখানে চিকিৎসকের আশা ও বিশ্বাসের মূল কোথায় ? তাঁহার আশা ও বিশ্বাসের মূল মানবের দৈহিক প্রকৃতির মধ্যে। তিনি যদি না জানিতেন যে অন্নপান দেহমধ্যে গেলেই পাকস্থলী স্বীয় কার্য্য করিবে ; ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র সকল যাহার যাহা দেয় তাহা দিবে ; এবং সেই অন্নপান অচিরে রক্তাধারে রক্ত, সর্ব্বাঙ্গে অস্থিমাংস রূপে পরিণত হইবে ; তাহা হইলে কি এরূপ আশাও বিশ্বাস করিতে পারিতেন ? প্রকৃতি সহায় ইহা জানেন বলিয়াই তাঁহার আশা। ভাঙ্গা হাত খানিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ডাক্তার নিশ্চিন্ত থাকেন. যে সময়ে যোড়া লাগিবে ; কারণ জানেন প্রকৃতি সহায়। তেমনি তত্ত্বদর্শী সাধু সত্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ধর্ম্মের আচরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন যে তাহার জয় হইবেই হইবে ; কারণ জানেন যে প্রকৃতি সহায়। ঋষিগণ যখন বলিয়া-

ছিলেন—“সমুলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি” যে মিথ্যাকে আশ্রয় করে, সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। সেকথার অর্থ কি? সেকথার অর্থ এই যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে যেমন মূল-বিহীন বৃক্ষের বাঁচিবার বন্দোবস্ত নাই, তেমনি মিথ্যারও বাঁচিবার বন্দোবস্ত নাই। মূল-বিহীন বৃক্ষ যেমন দুই দিন হরিদ্বর্ণ থাকিতে পারে, পুষ্প ফল ধারণ করিতে পারে, কিন্তু চরমে শুষ্ক হওয়া অনিবার্য্য; তেমনি মিথ্যা বা অসাধুতা দুইদিন চাকচিক্য প্রকাশ করিতে পারে, আপনাকে জয়ী বলিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহার বিনাশ অপরিহার্য্য। যে ব্যক্তি সত্য বা ন্যায় বা সাধুতার উপরে দাঁড়াইতে যাইতেছে, সে যদি অনুভব করে যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তাহার পশ্চাতে সহায়রূপে রহিয়াছে, তবে তাহার কত বড় বল, কত বড় সাহস হয়!! একবার শুনিয়াছিলাম, যে এক রাজ্যের একদল সৈনিক না জানিয়া প্রান্তবর্ত্তী অপর এক রাজার রাজ্যের সীমার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। যখন সৈন্যদল সমরসজ্জাতে যাইতেছে, তখন অপর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী থানার একজন রক্ষীপুরুষ স্বীয় রাজ্যের নিশান হস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং সাহসের সহিত সেই সৈন্যদলকে বলিল,—“তোমরা সংবাদ না দিয়া সশস্ত্রে সদলে আমাদের রাজ্যে আসিয়াছ, অতএব তোমরা সামরিক আইন অনুসারে বন্দী হইলে; তোমাদের অস্ত্র শস্ত্র এখনি আমার হস্তে অর্পণ কর; আমাদের রাজ্যাধিপতির হুকুম না আসা পর্য্যন্ত তোমরা বন্দী।” আততায়ী সৈন্যদল আপ-

নাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উক্ত সামান্য প্রহরীর হস্তে আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র দিয়া বন্দী হইয়া গেল। তাহারা ত মনে করিলে সেই একজন মাত্র প্রহরীকে হত্যা করিতে পারিত; কেন পারিল না? আর উক্ত প্রহরীই বা কোন্ সাহসে সেই সৈন্যদলকে বন্দী করিতে প্রবৃত্ত হইল? উত্তর এই, তাহারা জানিত, এবং সেও জানিত, যে তাহার পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড রাজ্য ও তাহার সমগ্র রাজশক্তি রহিয়াছে; সে স্বকর্ত্তব্য সাধনে যাহা করিতেছে, তাহার বিরোধী হইলে, দুই রাজ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া যাইবে; এবং হয়ত বিরোধী-দিগকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইবে। এই সংস্কারই তাহার বলের কারণ ও সৈন্যদলের বাধ্যতার কারণ। মানুষটী ছোট দেখিলে কি হয়, তাহার পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহাত আর ছোট নয়। সেই শক্তির বল বিক্রমেই ঐ ক্ষুদ্র মানুষের বলবিক্রম। চক্ষে দেখিতে একটা ছোট লোহার তার দেখিতেছ, ঐ লোহার তারগাছি লাগাইয়া একজন বিজ্ঞানবিৎ একটী প্রকাণ্ড পাষাণকে উল্‌টাইয়া দিতে যাইতে-ছেন, দেখিয়া লোকে হাসিতেছে, ঐ সামান্য তারের সাধ্য কি যে অতবড় পাষাণকে উল্‌টায়? কিন্তু সে শক্তিত সে তারের নয়; তাহার পশ্চাতে যে ব্যাটারি বা তাড়িতাধার রহিয়াছে তাহার। পাষাণটী যখন বিপর্য্যস্ত হইল, তখন অজ্ঞ লোকে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি ব্যাপার! তেমনি এক একজন মহাপুরুষ যখন সামান্য সূত্র ধরিয়া জগতকে কাঁপা-

ইয়া দিয়াছেন, জন সমাজকে উলট পালট করিয়াছেন, তখন জগতের লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিয়াছে, বাপ্‌রে একজন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের, বা একজন বণিক সন্তানের, বা একজন উষ্ট্রচালক বণিক পুত্রের, বা একজন সূত্রধর-তনয়ের, এত শক্তি! আগে জানিতাম যাহাদের সৈন্য আছে, কামান, বারুদ গোলা-গুলি আছে, তাহারাই মানুষকে পরাধীন করিয়া রাজা হয়; এখন দেখি দরিদ্রের সন্তানেরা মানব-হৃদয়কে হরণ করিয়া রাজা হয়। যেমন লোহার তারটী দিয়া যে শক্তি ক্রীড়া করে, তাহা ব্যাটারির শক্তি, তারটীর নয়, তেমনি সাধুদের মধ্য দিয়া যে দুর্জ্জয় শক্তি জগতকে জয় করিয়াছে, সে শক্তি তাঁহাদের নয়, তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী অনন্ত শক্তিসমুদ্র হইতেই উত্থিত। তুমি আমি যে নীতি ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার সময়ে পশ্চাতে এই শক্তি সমুদ্র দেখিতে পাইনা, এবং আপনাদিগকে সেই মহা-শক্তির হস্তে ক্ষুদ্র তারটীর ন্যায় অনুভব করি না, ইহাতেই তোমার আমার ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা; আর সাধুরা যে অনুভব করিয়াছিলেন—"যে কার্য্য করিব তাহা তাঁর, যে শক্তিতে জিতিব তাহা তাঁর"; এই স্থানেই তাঁহাদের মহত্ত্ব ও সবলতা। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব মানবকে এই শক্তির মহা-সমুদ্রের সহিত একীভূত করে বলিয়াই ইহা নীতির প্রকৃত ভিত্তি। এই সত্য প্রতীতি করিলেই আমরা মহাত্মা যীশুর একটী উক্তির তাৎপর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হই। তিনি বলিতেন "যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন অন্য ভূমির উপরে আপনা-

দের চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে, তাহারা সমুদ্রের বেলা ভূমির উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঝড় আসে, বৃষ্টি হয়, বাণ ডাকে, বালিরাশির উপরে নির্ম্মিত সে গৃহের ভিত্তি আর থাকে না ; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ ভূমির উপরে চরিত্রের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁহারা পাষাণময় ভূমির উপরে গৃহনির্ম্মাণ করেন।" দৃঢ়তা, সবলতা ও স্থায়িত্বের নিদর্শন দিতে হইলেই মানুষ পাষাণের দৃষ্টান্ত দেয়। এতএব পাষাণময় ভূমি বলিলে দৃঢ় ও অবিনশ্বর ভূমি বুঝায়। বাস্তবিক ধর্ম্মানুপ্রাণিত নীতির ভূমি এইরূপ দৃঢ় ও অবিনশ্বর। যে ব্যক্তি আপনার পদদ্বয়ের নিম্নে এই দৃঢ়তা ও অবিনশ্বরতা না দেখিতে পায়, সে নীতিতে স্থির থাকিতে পারে না ; যে পায় সেই দাঁড়ায়। এই কারণেই বলি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস মানবজীবনের মহা শক্তি।

কেবল বিশ্বাসের দিক দিয়াই যে ধর্ম্মকে মানবজীবনের শক্তি বলিতেছি তাহা নহে; প্রেমের দিক দিয়া দেখিলেও সেই কথা। ঐ যে মানব-হৃদয়ে একটী খনি আছে, যাহাকে তোমরা বল প্রেম, উহার মধ্যে যে কত শক্তি আছে তাহা কি কেহ বলিতে পারে ? মানুষ এ জগতে অনেক অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে ; অনেক মহত্ত্ব, অনেক বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছে ; কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব ও বীরত্ব-কীর্ত্তি কি পর্য্যবসিত হইয়াছে ? কে তাহা বলিবে ! ঐ প্রেমের খনি হইতে এখনও যে কত মহত্ত্ব ও বীরত্ব উঠিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে ? জগতে আমরা যত আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়াছি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জিনিষ মানুষ, যাহার

ভবিষ্যৎ অনন্ত, যাহার শক্তি অসীম। ঐ যে ক্ষীণাঙ্গী কোমলা নারীকে দেখিতেছ, দেখিলে বোধ হয় কোনও গুরুতর ভার পড়িলেই ঐ অঙ্গ-যষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইবে; অপেক্ষা কর, সংসারের বিপদ আসিতে দেও, পতি বা পুত্রের পীড়া হইতে দেও, দেখিবে ঐ হৃদয়-নিহিত প্রেম হইতে কত শক্তি উঠিবে! কত সহিবার শক্তি ও খাটিবার শক্তি দুই উঠিবে! প্রেমে সহিবার শক্তি ও খাটিবার শক্তি, উভয় শক্তি যোগাইয়া থাকে। দাম্পত্য-প্রেম, স্ববর্গ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশ-প্রেম সকল প্রেমেই উক্ত উভয়বিধ শক্তি যোগাইয়াছে। ইতিহাস তাহার প্রমাণ। যে প্রেম সকল প্রেমের খনি, যে প্রেম সকল প্রেমের আলোক, যে প্রেম সকল প্রেমের পোষক, সেই ঈশ্বর-প্রেম যে মানবজীবনকে বল দিবে ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি? ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মাদের জীবন প্রেমের শক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ। সহা ও খাটা, এই উভয়বিধ শক্তিই তাঁহাদের জীবনে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। সংসারের লোক বিবেচনা করিয়াছে যে সাধারণ মানুষকে যেমন ভয়ে ভীত করা যায়, নির্য্যাতনে বশবর্ত্তী করা যায়, প্রলোভনে প্রলুব্ধ করা যায়, তাঁহাদিগকেও বোধ হয় সেইরূপ করা যাইবে; এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ লৌকিক বল প্রয়োগ করিয়াছে; দণ্ডভয়, রাজভয়, হত্যাভয়, নানা ভয় প্রদর্শন করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহা-দিগকে নত করিতে পারে নাই; তাঁহারা অপরাজিত চিত্তে সমুদায় সহিয়াছেন। এক দিকে যেমন সহিবার শক্তি অপর দিকে

তেমনি কাজ করিবার শক্তি। যখন শিষ্যগণের সকলে শ্রান্ত, সকলে সংশয়াপন্ন, সকলে অবসন্ন, ও রণে ভঙ্গ দিতে উন্মুখ, তখন তাঁহাদের মুখে একই কথা, স্বর্গরাজ্য সন্মুখে, ভয় পাইও না; অবিশ্রান্ত সংগ্রাম কর। এই নৈরাশ্য বিহীন আশা যে মানব-চরিত্রের কি গূঢ় শক্তিকে প্রকাশ করে, তাহা ভাষাতে বর্ণন করা যায় না। এভাবেও ধর্ম্ম মানব-জীবনের শক্তি।

আর এক ভাবে একথা সত্য। ধর্ম্ম যে কেবল ধার্ম্মিকের অন্তরেই শক্তি আনিয়া দেয় তাহা নহে, অপর হৃদয়ের উপরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। একবার একজন চীন দেশীর রাজা জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সাধো! রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের জন্য কি কখন কখনও বিদ্রোহী-দিগকে হত্যা করা আবশ্যক হয় না?" কংফুচ উত্তর করিলেন "হে রাজন! কেন আপনি হত্যার বিষয় ভাবিবেন? আপনি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করুন, দেখিবেন বায়ুর অগ্রে শস্যক্ষেত্র যেমন স্বভাবতঃ অবনত হয়, তেমনি আপনার অগ্রে প্রজাকুল স্বভাবতঃ নত হইবে।" ধর্ম্ম যখন এক চরিত্রে বাস করে, তখন তাহা স্বভাবতঃ অপর চরিত্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিযা থাকে। ইহাও মানুষের এক প্রকার শক্তি। আমাদের প্রাচীন নীতি শাস্ত্রে আছে ঃ—

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং।"

অর্থ—"যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে স্বীয় বশে আনিয়াছে

সে ত্রিভুবনকে জয় করিয়াছে।” অর্থাৎ আত্ম-সংযমে যে বীর, সে অপর হৃদয়কে স্বীয় বশে আনিতেও সমর্থ। দশটা হৃদয়কে হাতে পাওয়া কত বড় একটা শক্তি! একজন ধনী বার লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া বসিয়া ভাবে আমি ধনী, আমার বার লক্ষ টাকা আছে, অথবা একজন রাজা নিজ হস্তে ষাটি হাজার সৈন্য রাখিয়া মনে মনে গর্ব্ব করেন, যে আমার ভাবনা কি, আমার হাতে ষাটি হাজার সৈন্য আছে; কিন্তু সত্য সত্য বল, বার লক্ষ টাকা বা ষাটি হাজার সৈন্য অপেক্ষা যীশুর বার জন অন্তরঙ্গ শিষ্য অধিক মূল্যবান ছিলেন কি না? দেখ সেই বার জনের সাহায্যে যীশু সমগ্র জগতের কত কোটী নর নারীকে জয় করিয়াছেন! রাজার ষাটি হাজার সৈন্যকে বেতন না দিলে থাকে না; কিন্তু যীশু সেই বার জনকে কি বেতন দিতেন? অনাহার, নিগ্রহ, তাড়না, এই সকল পাইয়াই তাঁহারা কাজ করিতেন। বল দেখি কোন্ শক্তিতে তবে যীশু তাঁহাদিগকে শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন? তাহা কি ধর্ম্মের প্রদত্ত শক্তি নয়? সেই শক্তিই তাঁহাদের হৃদয়ে দশ গুণ হইয়া নব বলে উত্থিত হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে ধর্ম্ম আর এক কারণে মানবজীবনের শক্তিরূপে কার্য্য করে। মানুষ পবিত্রচিত্ত হইলে তাহার এমনি একটী অবস্থা উপস্থিত হয়, যে তখন ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করা তাহার পক্ষে সহজ হয়। আমরা চিত্তকে কলুষিত রাখি বলিয়াই আমরা এই সাক্ষাৎযোগে তাঁহাকে প্রাপ্ত হই না।

যেমন গৃহের সন্নিহিত স্থানে যদি একটি পচা, পঙ্কিল পুষ্করিণী থাকে, যাহা হইতে প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা রাশি উত্থিত হয়, তাহা হইলে আকাশে সূর্য্য উদিত থাকিলেও সেই কুজ্ঝটিকা-রাশি তাহাকে দেখিতে দেয় না। তেমনি আমাদের কাম ক্রোধাদি রিপুসকল হইতে, এবং দূষিত কামনা হইতে, যে সকল মলিন ভাব উত্থিত হয়, তাহাই বাষ্পের ন্যায় আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে আবরণ করিয়া রাখে। ভগবদ্গীতাতে আছে ;—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।
মহাননো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেনচ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ব্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥

অর্থ—এই যে কাম, এই যে ক্রোধ, ইহারা রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, এই কাম বা ক্রোধ মহানল সমান, মহাপাপের আকর, ইহাকে বৈরী বলিয়া জান। ধূম যেরূপ অগ্নিকে আবরণ করিয়া থাকে, মল যেমন দর্পণকে আচ্ছন্ন করে, এবং জরায়ুযন্ত্র যেমন ভ্রূণদেহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তেমনি কাম বা ক্রোধ জ্ঞানকে আবৃত করে।

ইহা অতীব সত্য কথা। এই কারণেই আমরা পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ যোগ স্থাপন করিতে পারি না। একবার সেই যোগ স্থাপন করিতে পারিলে, আমাদের আত্মা তাঁহার প্রেরণার অধীন হইতে থাকে। আমরা যখন তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, তখন আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া

অসাধারণ প্রণালীতে সত্য সকল দর্শন করিতে থাকে ; আমাদের প্রীতি বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হয় ; আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে বীরত্ব প্রদান করে ; এবং আমাদের ইচ্ছা সেই মহতী ইচ্ছার সমাগমে বলবতী হইয়া অসাধ্য সাধনে সাহসী হয়।

এ জগতে যে স্বার্থপর সেই সংকুচিত ; যে মলিনচেতা সেই ভীরু ; যে ব্যক্তি কলুষিত চিত্ত, যে পাপ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে, সে অতি কৃপাপাত্র ; জোরে বায়ু বহিলে, সে মনে করে পশ্চাতে বুঝি কে আসিতেছে।

"দ্বয়োর্দৃষ্টালাপং কলয়তি কথা মাত্মবিষয়াং।

দুজনে গোপনে আলাপ করিতেছে দেখিলে সে মনে করে বুঝিবা আমার বিষয়ে কথা কহিতেছে। কিন্তু পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে বাস করে ও নিশ্চিন্ত মনে বিহার করে ; সে কাহারও সমক্ষে দাঁড়াইতে ভয় পায় না ; তাহাকে কেহই ভয় প্রদর্শন দ্বারা নত করিতে পারে না ; সেই পবিত্র চিত্তে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হয়। এজন্যও ধর্ম্ম মানব-জীবনে শক্তিরূপে কার্য্য করিতে থাকে।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের মুক্তি।

যেখানেই অজ্ঞতা সেইখানেই ভয়, সেইখানেই পরাধীনতা; যেখানে জ্ঞান সেইখানেই স্বাধীনতা। আমরা ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, মানব-সমাজের অজ্ঞতার অবস্থাতেই নানাপ্রকার কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহার এক মাত্র কারণ এই, মানুষ তখন ভয়ের চক্ষে জগতকে দেখে। প্রকৃতির শক্তি সকলের স্বরূপ ও কার্য্য জানা না থাকাতে, আপনাদের কল্পনাদ্বারা সে স্থান পূর্ণ করিতে থাকে; এবং পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে, মানবের অনিষ্টকারী নানা প্রকার শক্তি দেখিতে পায়। এখনও এই বঙ্গদেশে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ স্থলে, অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে, কোনও স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়া হইলে, গ্রামের লোক মনে করে তাহাকে পঞ্চানন নামক দেবতা বিশেষে ধরিয়াছে, বা কোন বিশেষ প্রেত তাহাকে অধিকার করিয়াছে; সুতরাং তখন তাহারা রোগের চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া ওঝা ডাকিয়া ঝাড়াইতে আরম্ভ করে। এখনও দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে গেলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, ভুটিয়া প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা বনে, জঙ্গলে, নানা স্থানে নানা রঙ্গের ও নানা আকৃতির নিশানের মালা ঝুলাইয়াছে; কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, যে তাহারা ভূত

তাড়াইবার জন্য ঐ প্রকার করিয়াছে। আজও প্রাচ্য-পর্ব্বত-বাসী খাসী জাতির মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে, যাহা-দিগকে অপর সকলে ডরায় ; এবং তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকে ; কারণ তাহারা মনে করে যে তাহাদের বংশে কেহ কেহ প্রেত বিশেষের শক্তির অধীন হইয়াছে। এই জন্য খাসী পর্ব্বতে আমাদের যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, তাহাতে মানুষ সংগ্রহ করা কখন কখনও কঠিন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোনও পরিবারের দুই চারিজন যদি আসে, অপরেরা আসিতে বা তাহাদের নিকট এক বেঞ্চে বসিতে ভয় পায় ; মনে ভাবে যদি কাপড় কাটিয়া লয়। কাপড়ের কিয়দংশ কাটিয়া লওয়া, প্রেত শক্তির অধীন করিবার একটা প্রধান উপায়। এই জন্যই বলি যেখানেই অজ্ঞতা, সেই খানেই ভয় ; এবং ভয় হইতেই কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি।

আবার ভয়ের একটা স্বভাব এই যে, ইহা নূতন বিভীষিকা সৃষ্টি করে। কোনও গ্রামে, কোনও পাড়ায়, একটী স্ত্রীলোক গলে রজ্জু দিয়া মরিয়াছিল। লোকে বলে সে প্রেতিনী হইয়া আছে। একদিন একজন লোক সন্ধ্যার পর সেই পথ দিয়া যাইতেছে, সে প্রতিপদে মনে করিতেছে, বুঝিবা সেই প্রেতিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এদিকে আম্রবনের ভিতর দিয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া একটী বৃক্ষের গুঁড়িকে আলোকিত করিয়াছে ; হঠাৎ তাহার মনে হইল কে যেন সাদা কাপড়খানি পরিয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। আর যায় কোথায় !

অমনি সে একেবারে চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া গিয়া এক গৃহস্থের দ্বারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এই সংবাদে গ্রামের লোকের পূর্ব্ব-সংস্কার দশগুণ দৃঢ় হইয়া গেল।

এইরূপে জগতের উপধর্ম্ম সকল নানাপ্রকার কুসংস্কার ও বিভীষিকা-মূলক আখ্যায়িকাতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞ মানুষ নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেখিয়াই প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তী শক্তি সকলের কল্পনা করিয়াছে। দেখিয়াছে নিজেদের যখন ক্রোধ হয়, তখন তাহারা প্রহার করে; যখন সাজা-প্রাপ্ত ব্যক্তি স্তুতি করে তখন ক্রোধ যায়; যখন কেহ অনিষ্ট করে, তখন প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগ্রত হয়; এবং তাহার অনিষ্ট সাধনে সুখ হয়; এই সকল দেখিয়া ভাবিয়াছে প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তী শক্তি সকলও ঐরূপ; তাহারা কেন রুষ্ট হয়, কেন তুষ্ট হয়, তাহাব কোনও নিয়ম নাই; কিন্তু রুষ্ট হইলেই কষ্ট দেয়; তুষ্ট হইলেই সুখী করে।

অজ্ঞতা মানুষের মনকে যেমন একদিকে ভয়ের অধীন রাখে, তেমনি অপর দিকে মানুষের অধীন রাখে। ভয় নিবারণের জন্য যে যাহা বলে, তাহাতেই প্রত্যয় হয়। এইরূপে এখনও এদেশে শত শত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে।

এইরূপে প্রায় সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যেই পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য মানুষ কত প্রকার মন্ত্র সৃষ্টি

করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে মন বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। হায়। মানবাত্মার এত নিগ্রহ কেন? মানব সমাজের স্থিতি ও উন্নতির জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু সেই রাজ-শক্তি কত প্রকারে মানবকে পীড়ন করিয়াছে, ও অদ্যাপি করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। রাজশক্তির অত্যাচার, সামাজিক অত্যাচার, এই সকলের মধ্যে যুড়াইবার স্থান ধর্ম্ম। কিন্তু সেই ধর্ম্ম ও মানবাত্মার স্বাধীনতা হরণের কারণ হইয়াছে। শাস্ত্রকার, ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মযাজকগণ, মানবাত্মার জন্য নানা রজ্জুর সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবের ভয়ের উপরে আপনাদের শক্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়া, তদুপরি আপনাদের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি কিরূপে হইল, তাহা চিন্তা করিলেই এ কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে ভয় হইতে ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতি প্রচলিত হইয়াছিল। আদি কবিগণ ঐ সকল স্তুতি রচনা করিতেন, অপরেরা মুখে মুখে শিখিত। এই সকল মন্ত্রকর্ত্তার মধ্যে আমরা স্ত্রীলোকেরও নাম দেখিতে পাই। দুর্ভিক্ষাদি বিপদ ঘটিলে, বা পারিবারিক পীড়াদি উপস্থিত হইলে, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহাদি বাঁধিলে, দেবগণের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য, ভয় নিবারণের জন্য, ঐ সকল স্তুতির প্রয়োজন হইত। কিন্তু লিখন প্রণালী আবিষ্কৃত না হওয়াতে, ঐ সকল স্তুতি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার জন্য এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইত। ইহাঁরা বংশপরম্পরাক্রমে স্বীয় সন্তানগণকে ঐ শিক্ষা দিতেন; সুতরাং

উহা ক্রমে কুলগত হইয়া পড়িল। ইহাঁরাই কালে ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। পরে সংসারে বিপদাপদ উপস্থিত হইলেই, বা যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিলেই,ব্রাহ্মণের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। ব্রাহ্মণগণ ইহারই উপরে আপনাদের শক্তিকে স্থাপন করিলেন: এবং শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা হইয়া প্রবল প্রতাপে ভারত-সমাজকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপরাপর দেশেও এই প্রকার ভিত্তির উপরে পৌরহিত্যের শক্তি স্থাপিত। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, পৌরহিত্য-শক্তি মানব উন্নতির সহায়তা না করিয়া, অধিকাংশস্থলে উন্নতির পথে অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছে। মানবের ভয়ের উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মানবাত্মার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে।

এই সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের প্রধান উপায় জ্ঞান, —জগত সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান জগতে যতই বিস্তার হইতেছে, ততই তিনটি সত্য মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। প্রথম সত্য এই—মানুষ বুঝিতে পারিতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে দুই, দশ বা ততোধিক শক্তি নাই; একই জ্ঞান ও একই শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। "যো দেবোগ্নৌ যোপ্সু," "যে দেবতা অগ্নিতে তিনিই জলে।" যে জ্ঞান ও যে শক্তি এই ধরাপৃষ্ঠে কার্য্য করিতেছে, সেই জ্ঞান ও সেই শক্তি দূর হইতে সুদূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রে কার্য্য করিতেছে। দ্বিতীয় সত্য এই—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালবর্ত্তী জ্ঞান ও শক্তি দুর্ব্বল, চঞ্চল, ও প্রবৃত্তিপরতন্ত্র মানবের ন্যায় খামখেয়ালী নহে;

যে আজ ক্রোধ করিল, সে কল্য প্রসন্ন হইল; যে আজ সাজা দিতে যাইতেছিল, সে কাল স্তুতিবাদে মার্জ্জনা করিল, এরূপ নহে; বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যিনি আছেন, তাঁহার ন্যায় আত্ম-সংযম কাহারও নাই। তিনি আপনাকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; দেখিলে বোধ হয় তাঁহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। পরে যদি বাঁধে তাহা দাসত্ব, নিজে যদি আপনাকে বাঁধা যায় তাহা স্বাধীনতা। সেই অর্থেই তিনি স্বাধীন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহা হইতে আমরা এই উপদেশ লইতে পারি, যে প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ও ধার্ম্মিক মানুষের জীবনও এই আদর্শে গঠিত,—তাহাও আত্মসংযম, নিয়ম ও শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। প্রত্যেকে এই সত্যের দ্বারা স্বীয় স্বীয় জীবনকে বিচার করুন।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান-চর্চ্চাতে তৃতীয় এই সত্য উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে,যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যে জ্ঞান ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা অনিষ্টকারী নহে; পরন্তু হিত-সাধনই ব্রহ্মাণ্ডের সকল বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য। যুগের পর যুগ যেমন যাইতেছে, এক মহা বিবর্ত্তন প্রক্রিয়াতে কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, জীবের দুঃখের মধ্যে সুখ ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্ষিত্যপ্তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতগণ আমাদের বিনাশের জন্য নিযুক্ত হয় নাই; আমাদের পালন ও পরিপোষণের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা এ জগতে শত্রুগৃহে, কারাগারে, বন্দী হই নাই; কিন্তু পিতৃগৃহে ধাত্রীর ক্রোড়ে বাস করিতেছি।

তবে দেখ, এই নব জ্ঞানলোক মানব-চিত্তকে কত প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতেছে। কিন্তু কেবল যে জ্ঞানই মানবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে তাহা নহে, জীবন্ত ধর্ম্ম মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহাও মানব-হৃদয়কে স্বাধীনতা দেয়। মহাত্মা যীশু একবার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"সত্যকে জান, সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" সত্যকে জান অর্থাৎ ধর্ম্মকে জান্। ধর্ম্মের অর্থ বিমল ঈশ্বর-প্রীতি। এই প্রীতি হৃদয়ে বাস করিলে, মানুষ তাজা ধর্ম্ম আপনার প্রাণে আস্বাদন করে। তখন সকল প্রকার বন্ধন আপনাপনি ঘুচিয়া যায়।

প্রথম বন্ধন ভয়ের বন্ধন। যতদিন ঈশ্বরে মানবের প্রীতি না জন্মে, ততদিন তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক রূপে দেখিতে থাকে; ততক্ষণ তাঁহার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা সমর্পণ অপেক্ষা, তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন অধিক লক্ষ্য হয়। এই অবস্থাতে মানুষ শাস্ত্র, গুরু, বাহিরের ক্রিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রেমিকের অন্য ব্যবহার, অন্য ভাষা। তিনি বলেন ;—

"আমি সুখে রয়েছি, পিতার কাছে আছি
এখন আমার কিসের ভয়!"

তিনি বলেন—"মন তুমি নির্ভয়ে বাস কর, নিশ্চিন্তমনে সত্যের ও ধর্ম্মের অনুসরণ কর, ধর্ম্মের রক্ষক ও সহায় একজন আছেন। তুমি কখনও উঠিবে, কখনও পড়িবে, সব কাজ গুছাইয়া করিতে পারিবে না, দশগুণ করিবে ভাবিয়া দুগুণ

মাত্র করিবে; তুমি দুর্ব্বল' তোমার পক্ষে এ সকল সম্ভবত ঘটিবে; কিন্তু তুমি নিরাশ হইও না, নির্ভর ছাড়িও না, অবিশ্বাসীদের দলে নাম লিখাইও না, তোমার পরিত্রাতা তোমার সঙ্গেই আছেন।" আহা, এই আশ্বাসের কথা কিরূপ সান্ত্বনা-প্রদ! ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এরূপ বাণী স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বদাই শুনিতে পান, এবং শুনিয়া ঈশ্বরাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করেন!

ভয়ের বন্ধন খসিয়া গেলেই শাস্ত্র ও গুরুর বন্ধন খসিয়া যায়। শাস্ত্র ও গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলে ধর্ম্মজীবন গড়ে না। শাস্ত্র ও গুরু ঈশ্বরের বিধানের অন্তর্গত, ইহা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাঁহারা সহায় ও ধর্ম্মজীবনের পরিপোষক না হইয়া যখন ধর্ম্মজীবনের সংকীর্ণতার কারণ হন, তখনি বন্ধন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান; সুতরাং যখন মানুষ ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মের সেবা না করিয়া, গুরুপদেশের খাতিরে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করে, তখনি বুঝিতে হইবে যে তাহার ধর্ম্মজীবনের মৃত্যুর দিন নিকটে আসিয়াছে। মার্কিন সাধু এমারসন এক-স্থানে বলিয়াছেন—"মানুষ যখন ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া অপরের দোহাই দেয়, একজনের দোহাই দিক আর বহু জনেরই দোহাই দিক, বুঝিবে সেখানে ধর্ম্মজীবনের মৃত্যু হইয়াছে।" আর ইহার যুক্তিও হাতের নিকটেই আছে। যে ব্যক্তি নিজের হাতে দুইটী গ্যাস মিলাইয়া জল করিয়া দেখিয়াছেন এবং জলকে বিশ্লেষণ করিয়া দুইটী গ্যাস বাহির করিয়াছেন, তিনি

কি আর বলেন—দুইটী গ্যাস মিলিয়া জল. হয়, কারণ অমূক বলিয়াছেন? যাহার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তাহাকে কাজেই অপরের দোহাই দিতে হয়। তেমনি জীবন্ত তাজা ধর্ম্ম, জীবন্ত তাজা ঈশ্বর-প্রীতি যাহার হৃদয়ে নাই, তাহাকেই ভাবিতে হয় ধর্ম্ম বুঝি গ্রন্থে আছে, বা সাধুর মুখে আছে। গ্রন্থে ও সাধুর মুখে ধর্ম্ম আছে বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহার জন্য আছে? যাহার হৃদয়ে তাজা জীবন্ত ধর্ম্ম আছে, তাহার জন্যই আছে। যাহার অন্তরে সে জিনিষ নাই, তাহার জন্য ধর্ম্ম কোথাও নাই। তুমি প্রাণে ঈশ্বর আগে না পাইলে বাহিরে ঈশ্বর পাইবে না, এটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ঈশ্বর আগে প্রাণে লাগিবেন, তারপর ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে বাছিয়া লইবেন, শাস্ত্রকে আদর করিবেন, সাধুকে বুকে ধরিবেন, ইহা অধ্যাত্মিক উন্নতির নিয়ম। ঈশ্বর হৃদয়ে যখন জাগিয়া উঠেন, তখনি ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়।

শাস্ত্র ও গুরুর বন্ধনের ন্যায় আর একটী বন্ধন আছে, যাহা অনেক মানুষকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাহা ক্রিয়ার বন্ধন। ধর্ম্মসাধনার্থ বিবিধধর্ম্মে বিবিধ প্রকার ক্রিয়ার নির্দ্দেশ আছে। অনেক লোকে মনে করে, ঐগুলির মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে, যাহাতে ধর্ম্মকে আনিয়া দিতে পারে। ব্যাধ যেমন জালে জড়াইয়া পাখীকে ধরে, তেমনি যেন ক্রিয়ার জালে জড়াইয়া ঈশ্বরকে ধরা যায়। প্রাণে জীবন্ত তাজা ধর্ম্ম, জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি না থাকিলেই মানুষ

এ প্রকার ভ্রমে পতিত হয়। ধর্ম্মসাধনের প্রণালীতে যে আবশ্যকতা নাই তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এই বলাই উদ্দেশ্য, যে প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে ধর্ম্মকে দিতে পারে। ধর্ম্ম ঈশ্বরের আবির্ভাবের সহিত হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ধর্ম্ম-সাধকদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ ক্রিয়াকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে; ক্রিয়ার অতিরিক্ত আর কিছু জানে না; সেই কারণেই ক্রিয়াকে একটী বন্ধন স্বরূপ মনে করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে আর এক প্রকার বন্ধন আছে, জীবন্ত ধর্ম্ম যাহা হইতে মানুষকে মুক্ত করে। সেটী প্রবৃত্তির বন্ধন। অগ্রেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ন্যায় আত্ম-সংযত কেহ নাই। তাঁহার অনুকরণ করিয়া প্রবৃত্তি সকলকে ঈশ্বরাদেশের অধীন করাই ধর্ম্ম। আমাদের দেশে একপ্রকার ধর্ম্মসাধনের ভাব আছে, যাহাতে পূর্ণ স্বেচ্ছাচার শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মের ষাঁড় যেমন, স্বচ্ছন্দে খাইয়া শুইয়া, গ্রামের মধ্যে বেড়ায়, কেহ তাহার গলে রজ্জু দেয় না, তেমনি যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিহার করেন, যখন যাহা ইচ্ছা আচরণ করেন, খাইবার শুইবার, কাজ করিবার কোনও নিয়ম নাই, সংসারে কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই, তিনিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক। এক প্রকার গূঢ় স্বসুখপরতা ও স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা আছে, যাহাকে মানুষ ধর্ম্মের নাম দিয়া সেবা করে, ইহা তাহাই। এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। মনে কর

একজন বহু সন্তান-ভার-পীড়িত, তাঁহার আয় অল্প, ঘোর দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্যে দিন কাটে; কিছুদিন দারিদ্র্য ভোগ করিয়া তিনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া গেলেন। কে তোমার, তুমি কার, কেবা কার, এই জ্ঞান জন্মিল। তিনি গৈরিক বসন পরিয়া গৃহত্যাগী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে গেলেন; স্বাধীন ও প্রমুক্তভাবে দেশ বিদেশে বেড়াইতে লাগিলেন; আর এদিকে তাঁহার অসহায়া পত্নী নিরাশ্রয় হইয়া সংসার ভারে পিসিয়া যাইতে লাগিলেন। ভাগ্যে স্ত্রীলোকটীরও উচ্চ ধর্ম্মের ভাব উদয় হয় নাই, তাহা হইলে শিশুগুলির রক্ষা ছিল না। জগদীশ্বর স্বভাবতঃ নারীদিগকে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানে পুরুষ অপেক্ষা অধিক উন্নত করিয়াছেন বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইল। এই কল্পিত সন্ন্যাসীটীর কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, তাঁহার ধর্ম্মসাধন কেবল নিজের ভার অপরের স্কন্ধে ফেলিয়া, অপরকে দুঃখে রাখিয়া, নিজে আলস্যে ও আরামে থাকিবার চেষ্টা মাত্র। ইহা যদি ধর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম শব্দে কাহাকে সম্বোধন করা যাইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও স্বসুখপরতা সাধুতার আকারেই আসুক, আর অসাধুতার আকারেই আসুক, সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ঈশ্বরপ্রীতি প্রাণে প্রবল হইলে স্বসুখপরতা থাকে না; তখন পরার্থে স্বীয় সুখ বিসর্জ্জন করিতেই আনন্দ হয়।

স্বীয় প্রবৃত্তি সকলকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন করা, বা স্বীয়

কার্য্য সকলকে ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত করা, অল্পায়াস-সাধ্য নয়। যথেচ্ছাচার যাঁহাদের পক্ষে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুরন্ত পরিশ্রম, প্রবল সংগ্রাম ও বহুকালের সাধনা সাপেক্ষ। যেমন কণ্টক দিয়া কণ্টক তোলে, তেমনি অভ্যাস দিয়া অভ্যাসকে দমন করিতে হয়; ধীরে ধীরে সমগ্র প্রকৃতিকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিতে হয়। অনেক সময়ে আমরা এতটা শাসনাধীন থাকিতে ভাল বাসি না, কিংবা এতটা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি না, সে জন্য স্বেচ্ছানুসারে চলিতে থাকি। কিন্তু জানা উচিত সে প্রকার জীবন ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের আদর্শের অনুরূপ নহে। আমাদের প্রবৃত্তিকুলই যদি আমাদের উপরে আধিপত্য করিতে থাকে, আমরা যদি স্বীয় স্বীয় ইচ্ছার অনুসারেই চলি, তবে আর আমরা ঈশ্বরের দাস কিসে? যখন আমরা প্রবৃত্তিকুলের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দাসত স্বীকার করি, তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা অনুভব করিয়া থাকি। সেই জন্যই বলি, ধর্ম্মই মানব-জীবনের মুক্তি।

সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলং নামক গ্রন্থে একটী সুন্দর দৃশ্য আছে; যেখানে শকুন্তলা পতিগৃহে নীত হইতেছেন। কণ্ব ঋষির দুইজন শিষ্য, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত, তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। ইঁহারা উভয়ে চিরদিন অরণ্য মধ্যে ঋষির আশ্রমে বাস করিয়াছেন; তরু লতা ও পশু পক্ষীর সহিত বর্দ্ধিত হইয়াছেন; তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন; বহুজনাকীর্ণ রাজধানীতে ইহাদের এই প্রথম আগমন; সকলেই অনুমান করিতে পারেন, ইঁহাদের অন্তরে কি প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। ইঁহারা যাহা কিছু দেখিতেছেন, যাহা কিছু শুনিতেছেন, সকলি নূতন ও সকলি বিস্ময়জনক। কিন্তু কেবল যে বিস্ময়-রসেরই আবির্ভাব হইতেছে তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ঘৃণারও সঞ্চার হইতেছে। কারণ তাঁহারা ঋষির শিষ্য, ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনই তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য, এতটা বিলাস বিভব তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না; মনে বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শজনিত এক প্রকার সংকোচের ভাব আসিতেছে। কালিদাসের নিরুপম উপমা-প্রয়োগের শক্তির গুণে দেখুন সে ভাবটী কেমন ফুটিয়াছে! কালিদাস শারদ্বতের মুখে যে বাক্য দিয়াছেন তাহা এই ;—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব স্বপ্তং।
বদ্ধমিব স্বৈরগতি র্জনমিহ স্বখসঙ্গিন মবৈমি॥

অর্থাৎ—স্নাত বক্তি তৈলাক্তকে, শুচি অশুচিকে, জাগ্রত নিদ্রিতকে, স্বাধীন বদ্ধকে, যে ভাবে দেখে, সেইভাবে বিষয়-স্বখাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিতেছি।

যে ব্যক্তি তৈলাক্ত হইয়া স্নান করিতে যাইতেছে, আর যে স্নান করিয়া উঠিতেছে, এ দুইএ কি প্রভেদ নাই? যে স্নান করিতে যাইতেছে, তাহার শরীর হয়ত গুরুতর শ্রমে ক্লান্ত, মস্তকের ঘর্ম্ম হয় ত এখনও মরে নাই, সর্ব্বাঙ্গের ধুলা হয় ত এখনও সমুদয় যায় নাই, তদুপরি তৈল পড়িয়া প্যাচ প্যাচ করিতেছে, মনে হইতেছে কতক্ষণে জলে নামিব, এ ক্লেদ, এ অপরিচ্ছন্নতা, এ গলদঘর্ম্ম ভাব, গেলেই যেন বাঁচি; এই এক জনের ভাব; অপর জনের ভাব কিরূপ? সে অনুভব করিতেছে সকল ক্লান্তি চলিয়া গিয়াছে, শরীরের ক্লেদ ধৌত হইয়াছে, শরীর স্নিগ্ধ ও চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে। এই উভয় ভাবে কত প্রভেদ! ঋষিদ্বয়ের পক্ষে বিষয়ীর সংস্পর্শে যে অশুচি-সংস্পর্শের ন্যায় চিত্তে এক প্রকার সঙ্কোচ আসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোনও স্নাত ব্যক্তিকে যদি তৈলাক্ত ব্যক্তির সহিত কোলাকুলি করিতে বলা যায়, তাহা হইলে কিরূপ হয়? সে কি সহজে তাহা করিতে চায়?

আমি প্রশ্ন করিতেছি, যেমন কৃতস্নান ব্যক্তি ও তৈলাক্ত

ব্যক্তির মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, তেমনি যে ব্যক্তি সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে এবং যে তাহা করে না, এই উভয়ের মধ্যে কি একটা প্রভেদ থাকিবে না? যে ব্যক্তি স্নান করিয়া উঠিতেছে সে যেমন বলিতে পারে—আমার শরীরের ক্লেদ গিয়াছে; উত্তাপ নিবারিত হইয়াছে; ক্লান্তি দূর হইয়াছে; চিত্ত সুপ্রসন্ন হইয়াছে; তেমনি যিনি ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া উঠিতেছেন তিনি কি বলিতে পারিবেন না, আমার আত্মার মলা ধৌত হইয়াছে; পাপ তাপ গিয়াছে; প্রাণে শান্তি আসিয়াছে? যদি আত্মাতে এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সত্যস্বরূপের প্রকৃত অর্চ্চনা হইতেছে না।

এখানে আমরা একটী গুরুতর সত্যে উপনীত হইতেছি, তাহা এই—প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা মানব-জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবেই করিবে। ঈশ্বর যদি জীবন্ত শক্তি হন, এবং উপাসনা-সূত্রে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হই, একথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার পূজা জীবনে নব শক্তি আনয়ন করিবে ইহাও অনিবার্য্য। যদি কেহ কতকগুলি আদ্র্র তণ্ডুল দেখাইয়া বলে, দেখ এই তণ্ডুলগুলি চুল্লীতে আগুনের উপরে দুই ঘণ্টা ছিল, তথাপি এইরূপই আছে; তাহা হইলে কেহ কি সে কথাতে প্রত্যয় করেন? সকলেই বলিয়া উঠে—"এমন কথা শুনিতে চাই না, এই তণ্ডুল যদি দুই ঘণ্টা আগুনের উপরে থাকিত তাহা হইলে ভাত হইয়া নামিয়া আসিত, তণ্ডুল আর থাকিত না।" তণ্ডুল জলের সহিত আগুনের উপরে থাকিলে

অথচ পরিবর্ত্তিত হইল না, ইহা কি সম্ভব ? যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে ইহা কেন সম্ভব হইবে যে, মানুষ সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিবে অথচ তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না ?

অথচ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে, আমরা বহু বহু স্থলে এরূপ দেখিতেছি, যে মানুষ নিয়মপূর্ব্বক ঈশ্বরার্চ্চনা করিতেছে, অথচ জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। যে কৃপণ-স্বভাব সে কৃপণ-স্বভাব থাকিতেছে ; যে পরশ্রীকাতর সে তাহাই রহিয়াছে; যে বিষয়-সুখ লোলুপ,বা ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রয়াসী, সে তাহাই থাকিতেছে। অপরদিকে মানুষের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না ; প্রাচীন কুরীতি সকলই থাকিয়া যাইতেছে। বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, ঐ ঈশ্বরার্চ্চনার মধ্যে কোনও স্থানে ত্রুটি রহিয়াছে। সে ত্রুটীটি কি এবং কোথায় রহিয়াছে ?

এখানে ধর্ম্মসাধনের পথের দুইটী বিপদ স্মরণ করাইয়া দিতেছি, সাধক মাত্রেরই সেই দুইটীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম বিপদ এই, আমরা প্রাচীন সমাজে অনেক লোক দেখিতেছি, যাঁহারা ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত রহিয়াছেন, জপ, তপ, শৌচ, সদাচার যে কোনও বিধান শাস্ত্রে আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আচরণ করিতেছেন, অথচ সে সকলে তাঁহাদিগকে চিত্তশুদ্ধি দিতেছে না। প্রাতে গঙ্গাতীরে গিয়া দুই চারি দণ্ডকাল দণ্ডায়মান হও, হয় ত দেখিতে পাইবে

সহরের বহুসংখ্যক বারবনিতা ধর্ম্মার্থে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছে, কেবল তাহা নহে, দিবা দ্বিপ্রহরে তাহাদের ভবনে পদার্পণ করিলে হয় ত দেখিতে পাইবে যে, তাহারা জপ পূজা প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের ক্রিয়ার আচরণ করিতেছে, অথচ এই সকল ক্রিয়া তাহাদের জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন আনিতে পারিতেছে না। অভদ্র আলাপ, অভদ্র আচরণে, তাহারা নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছে। তাহারা যে সকল ক্রিয়ার আচরণ করিতেছে, তাহা কলের পুতুলের কার্য্য, তাহা তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

সাকার উপাসনা ও তৎসংস্পৃষ্ট ক্রিয়া কলাপ যাহারা অবলম্বন করিয়া থাকে, কেবল তাহাদেরই যে এই বিপদ আছে তাহা নহে, আমাদের ন্যায় যাহারা ঈশ্বরকে শব্দময় অর্চ্চনা করে তাহারাও এ বিপদের অতীত নয়। মানুষ তোতাপাখীর ন্যায় কতকগুলি অভ্যস্ত শব্দ ব্যবহার করিতে পারে, অথবা কতকগুলি শব্দ কাণে শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এই শব্দময় পূজা সাকার দেবতার চরণে আনীত ফল মূল নৈবেদ্যময় পূজা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে। আমরা অলস ও অনবহিত হইয়া সাধন করিতে গেলেই সকলে এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারি।

দ্বিতীয় বিপদটী আরও সূক্ষ্ম। সেটী এই, সংসারে এমন অনেক বিষয় আছে, এমন অনেক কাজ আছে, যাহাতে আমরা

ভাবের চরিতার্থতার অধিক আর কিছু অন্বেষণ করি না। যখন দার্জিলিঙ্গ পাহাড়ে যাই, ও সেখানকার সুরম্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিচরণ করি, বা কোনও চিত্রশালিকাতে পদার্পণ করি, তখন কি চাই? সুন্দর ছবি দেখিয়া চক্ষু ও মনের যে একপ্রকার পরিতৃপ্তি হয় তাহার অধিক আর কিছুই চাই না। কিছু যে ঘরে লইয়া যাইতে হইবে, কিছু যে কাজ করিতে হইবে, কিছু পুরাতন ছাড়িতে বা কিছু নূতন যে ধরিতে হইবে. এরূপ মনে হয় না। সুরম্য দৃশ্য দর্শনে অন্তরে চমৎকার সম্বলিত যে আনন্দ রস উথলিতে থাকে, তাহাতেই আপ্যায়িত হইয়া থাকি। এই জগতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মকে এই ভাবেই সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার নিকট ভাবের চরিতার্থতা ভিন্ন আর কিছুরই প্রত্যাশা করেন না। ইঁহাদিগকে mystic বা ভাবুক বলে। ইঁহারা কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উত্থিত হইয়া থাকেন। যেমন অহিফেনসেবী অহিফেনের ধূমের প্রভাবে,ছিন্ন মাদুরে বসিয়া বসিয়া, মনে করে এই আমার বাড়ী গাড়ি জুড়ী প্রভৃতি হইতেছে, তেমনি এই ভাবুকগণও বসিয়া বসিয়া ভাবেন এই আমার আত্মা সহস্রা ভেদ করিয়া বিরজার পর-পারে, গোলোকধামে উঠিতেছে। এই গোলোকধামে উঠিতে ব্যয় কিছুই নাই; ছাড়িবার বা ধরিবার কিছুই নাই; লৌকিক বা সামাজিক ব্যবহারের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক এরূপ ভাবুক সম্প্রদায়

আছে, এবং এখনও নূতন নূতন সম্প্রদায় দেখা দিতেছে। ইঁহাদের কার্য্যের সমালোচনার অগ্রেই বলা আবশ্যক যে ভাব ধর্ম্মজীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। কেবল তাহা নহে, ধর্ম্মজীবন গঠনে কল্পনারও মহৎ কার্য্য আছে। যে ব্যক্তি পাপের পতিত হইতেছে, সে যদি কল্পনার সাহায্যে আপনার পাপে ফলটা আপনার নিকটে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিতে না পারে, তবে পাপের প্রতি তাহার সমুচিত ঘৃণার উদয় হয় না; অথবা সাধুর সাধুতার ছবি যদি আপনার চক্ষের নিকটে ভাল করিয়া অঙ্কিত করিতে না পারে, সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হয় না। অধিক কি, অনেক সাধু সাধ্বীকে যে অনেক সময় অপরের পাপ তাপের প্রতি উদাসীন দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের কল্পনার শক্তি অল্প, তাঁহারা অপরের অবস্থাটা সমুচিত উজ্জ্বলরূপে আপনাদের নিকট চিত্রিত করিতে পারেন না। আর ধর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মসাধনে ভাবেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। ভাবের ন্যায় কোমল স্পৃহণীয় ও হৃদয়স্নিগ্ধকারী পদার্থ অল্পই আছে। যদি মানব-হৃদয়ে ভাব না থাকিত, মানব-জীবন কি শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় হইত! পিতা মাতার স্নেহালিঙ্গন পাইয়া, বা প্রণয়িণীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, বা শিশু সন্তানকে বুকে ধরিয়া, বা বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, বা পরের দুঃখের অশ্রু মুছাইয়া, যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়, যে ভাবোচ্ছাস অনুভব করা যায়, তাহা মানব-

জীবন হইতে অন্তরিত কর, মানব-জীবনের স্পৃহণীয়তা অর্দ্ধেকের অধিক হ্রাস হইয়া যাইবে। তেমনি যাঁহাকে পিতাদিগের মধ্যে পিতৃতম, জননীর জননী ও সখাদিগের মধ্যে পরমসখা মনে করিতেছি, তাঁহাকে হৃদয়ে পাইলে ভাবোচ্ছ্বাস হইবে তাহা কি স্বাভাবিক নহে? বরং এ কথা কি বলা যায় না যে, তাঁহার শ্রবণ মননে যাহার চিত্ত বিগলিত হয় না, ভাবরসে নিমগ্ন হয় না, সে হৃদয় স্বাভাবিক অবস্থাতে নাই? অতএব ভাবের মূল্য হ্রাস করা দূরে থাকুক, বরং বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুরাগ-বহুল শিক্ষাপ্রণালীর এই দোষ দেখিয়া শোক করিতেছি যে, ইহাতে ভাবকে হীন চক্ষে দেখিতে শিখাইতেছে। কবিতা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ভাবাত্মক বিষয় সকলের চর্চ্চাকে হীন করিয়া ফেলিতেছে।

কিন্তু ধর্ম্মভাব এক কথা আর ধর্ম্মে ভাবুকতা আর এক কথা। ধর্ম্মকে কেবল ভাবের চরিতার্থতার মধ্যে বদ্ধ রাখিলে দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে। যেমন এক প্রকার মানুষ দেখি যাহাদিগকে দেখিলে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্তরে মেদবৃদ্ধি রোগ, সেই স্থূল বর্ত্তুল দেহ অন্তঃসার শূন্য, তাহাতে চারি কড়ারও বল নাই, ভাবুকতার দ্বারা যাঁহাদের আধ্যাত্মিক দেহ গঠিত হয় তাঁহাদের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ। তাঁহাদের আত্মাও মেদবৃদ্ধি রোগে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রতিজ্ঞার বল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, পাপের প্রতি সতেজ ঘৃণা, পুণ্যের প্রতি সতেজ

প্রেম, পরের প্রিয়চীকির্ষা, প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ তাঁহাদের চরিত্রে বিকাশ পায় না। ইহার একটী গূঢ় কারণ আছে। যেমন যে বৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তি রাশি রাশি নব পল্লবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহাতে আর ফল ধরেনা, তেমনি যে চরিত্রের আধ্যাত্মিক শক্তি কল্পনা ও ভাবের প্রাচুর্য্যে পর্য্যবসিত হয়, তাহাতে মনুষ্যত্বের ফল দেখা দেয় না। এইরূপ প্রকৃতি—সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভাবের উত্তেজনা সম্ভোগ করিয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর ও মানব সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনেকটা করা হইল, অতএব অন্য আদর্শের প্রতি আর তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। এজন্য কোনও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এতদূর মনে করিয়াছেন যে জগতে ধর্ম্মভাবের প্রবলতা হইলে নীতির দুর্গতি অনিবার্য্য। অর্থাৎ মানুষ ধর্ম্মভাবের চালনাকে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা জানিয়া পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিবে। যাহা হউক, এরূপ আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ যুক্তি-যুক্ত মনে করা যাউক আর না যাউক, ভাবুকতার আতিশয্য দ্বারা যে মানব-চরিত্রের দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ভাবপ্রধান ধর্ম্মজীবন সর্ব্বদাই জোয়ার ভাঁটার অধীন, তাহাতে স্থিরতা নাই।

জগদীশ্বর যে এ জগতে মানুষকে রাখিয়া শিক্ষিত ও উন্নত করিতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে তিনি সর্ব্ব বিভাগেই সত্যের সহিত

সংঘর্ষণের দ্বারা মানবের শক্তিকে ফুটাইতেছেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন এ পৃথিবীতে চক্ষু মেলিল, তখন তাহার দর্শন শক্তিকে ফুটাইবার জন্য আলোক প্রস্তুত। সেই আলোক তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ে পড়িয়া সে ইন্দ্রিয়কে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, আমরা বলিলাম সে চাহিয়া দেখিল। তৎপরে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার শিক্ষা চলিল। জগতের বিবিধ বর্ণের, বিবিধ আকৃতির পদার্থের সহিত তাহার দশনেন্দ্রিয়ের পরিচয় হইতে লাগিল; তাহার দৃষ্টি ঐ সকল পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করিতে লাগিল; তাহার মন সদৃশ বস্তু সকলকে অজ্ঞাতসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে লাগিল; পদার্থ সকলের স্বভাব রীতি ও গতি নির্ণয় করিতে লাগিল;—ইহাকেই বলে জ্ঞান-পরম্পরা। সত্যের সংস্রব ভিন্ন জ্ঞান সম্ভব নয়; সত্যের সহিত সংঘর্ষণ ভিন্ন জ্ঞান ফোটে না! মানব যে শিক্ষার গুণে বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতাতে আরোহণ করিয়াছে, তাহার প্রণালীর বিষয়ে চিন্তা করিলে কি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় না? মূলেত মানবের পঞ্চেন্দ্রিয়-যুক্ত মন ও পঞ্চভূতাত্মক জগত ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। জগদীশ্বর মানবসন্তানকে ধরাতে আনিয়া এই মেদিনীরূপ ধাত্রীর কোলে দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—"দেখ, শোন, ঠক, শিখ, মানুষ হও।" তৎপরে এই ধাত্রী কি স্বীয় পালিত পুত্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছে? কখনই না; মানুষকে মাটী খুঁড়িয়া জল বাহির

করিতে হইয়াছে; ভূমি চষিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইয়াছে; মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দৈনিক অভাব পূরণ করিতে হইয়াছে। তৎপরে প্রাকৃতিক শক্তিসকল মানুষের শক্তিকে বার বার পরাভব করিয়াছে; মানবের কীর্ত্তি লোপ করিয়াছে; গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে; মানুষকে পাষাণ শিলায় ফেলিয়া পিষিয়াছে। জগদীশ্বরের এইরূপ বিধান ছিল, ইহাতেই মানুষ চতুর, বুদ্ধিমান, দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে। দেখ, ঈশ্বরের শিক্ষা-প্রণালী কেমন সুন্দর! মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে খাইতে হয়, ইহাকে প্রাচীনেরা দুঃখের কারণ মনে করিতেন, আমরা তাহা করি না; আমরা বলি ইহা ঈশ্বরের মঙ্গল বিধি। আমি একবার আগরা সহরে তাজমহলে যাইবার সময় পথে দেখিলাম একজন ইংরাজ আপনার পালিত কুকুরটীর ঠেঙে ধরিয়া সজোরে যমুনার জলে ফেলিয়া দিতেছেন ও তৎসঙ্গে দূরে একগাছি যষ্টি ফেলিয়া দিতেছেন, দিয়া কুকুরটীকে ঐ যষ্টিগাছি ধরিয়া আনিতে বলিতেছেন; কুকুরটী প্রবল স্রোতে হাঁপাইয়া অতিকষ্টে যষ্টিগাছি ধরিয়া তীরে উঠিতেছে; তাহার প্রভু আবার তাহাকে ধরিয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; মনে করিলাম, এমন নির্দ্দয় ক্রীড়া কেন? পার্শ্বের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম ইংরাজটী এমন কেন করিতেছেন? একজন বলিল "কুকুরকে চালাক ও মজবুদ করিয়া লইতেছে।" সে কথাটী আর এ জীবনে ভুলিব না। মনে করিলাম, ঠিক ঠিক, ঈশ্বরও

এইরূপ মানব সন্তানকে কখন কখনও ঠেঙে ধরিয়া ছুড়িয়া বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেন; উদ্দেশ্য তাহাকে চালাক ও মজবুদ করিয়া লওয়া। অমনি যেন মানবের উন্নতি ও সভ্যতার প্রণালী বুঝিবার একটা চাবি হাতে পাইলাম। ইহাতে আর একটা বিষয়েও আলোক পাইলাম। মানুষকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। সত্যের সংস্রব ভিন্ন শিক্ষা হয় না,—যতটা সম্ভব সত্যের সঙ্গে ও মানব চিত্তের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়ার নাম শিক্ষা। "আফ্রিকার মরু-প্রান্তে একপ্রকার প্রাণী আছে, তাহাকে বলে সিংহ, তাহা দীর্ঘে ৭।৮ হাত ও উচ্চে তিন হাত হয়, তাহার ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম হয়, তাহাকে কেশর বলে"—ইত্যাদি বিবরণ দ্বারা শিশুর স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া, তাহাকে একদিন পশুশালাতে লইয়া গিয়া সিংহ দেখাও, সেটা তাহার পক্ষে শিক্ষা ও একটা জ্ঞান-সম্পত্তি হইবে। মানুষ কল্পনার রাজ্যে বাস করিয়া যাহা কিছু ধারণা করে, তাহা তাহার জ্ঞান সম্পত্তি নহে; তাহা জ্ঞানের ছায়া মাত্র। জ্ঞানের শিক্ষা যেমন সত্যের সংঘর্ষণে হয়, হৃদয় নিহিত ভাবের বিকাশও সেই রীতিতে হইয়া থাকে। আমরা মানব-সমাজে যে পর-স্পরের সহিত মিশিতেছি, পরস্পরের নিকট বসিতেছি, ইহাতে অজ্ঞাতসারে যে পরস্পরকে কতটা শিক্ষিত করিতেছি তাহা ভুলিয়া যাই। মানুষ মানুষের কাছে দাঁড়াইলেই একজন অপর জনের প্রকৃতিকে কোনও না কোনও ভাবে ফুটায়।

আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, একজন নিকটে আসিলে তোমার প্রকৃতির মধ্যে সৎ যাহা, উচ্চ যাহা, তাহাই ফুটে; তুমি সে ব্যক্তির আবির্ভাবে একটা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হও; আবার কেহ কেহবা নিকটে আসিলে তোমাতে দুর্ব্বলতা যাহা কিছু আছে তাহা ফুটিয়া উঠে। যাঁহাদের নিকটে বসিলে, কাছে দাঁড়াইলে, সৎভাব জাগ্রত হয়, সাধুতা ফুটিয়া উঠে তাঁহারাই সাধু। বৈষ্ণবদিগের ভক্তিশাস্ত্রে বৈষ্ণবের লক্ষণ এই দিয়াছে যে, যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে সেই বৈষ্ণব। অর্থাৎ যে নিকটে বসিলে বা কাছে দাড়াইলে ভগবানকে স্মরণ হয় সেই ভক্ত;—ইহা সেই একই কথা।

তবে দেখিতেছি, মানুষের সংঘর্ষণে মানুষের শিক্ষা হয়। আমরা মনে করি প্রণয়িনীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, শিশু সন্তানকে বুকে ধরিয়া, বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, মানুষের সুখই হয়, কিন্তু সুখের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষাও হয়, তাহা ভূলিয়া যাই। ঐ যে প্রণয়ী-যুগলকে দেখিতেছ, যাহারা পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইতেছে, উহারা প্রত্যেক আলিঙ্গনে যে পরস্পরকে কিছু দিবে, কিছু ফুটাইবে, কিছু গড়িবে তাহা জানে না। ঐ যে নব প্রসূতা জননী শিশুটীকে বুকে ধরিতেছে, ও নারী জানেনা যে ঐ শিশু মহাশিক্ষক হইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রকৃতিতে এমন কিছু ফুটাইবে যাহা চিরদিনের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। ঈশ্বর যদি এই সকল পবিত্র পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে কি মানব চরিত্রে, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, দায়িত্ব-

জ্ঞান, নিঃস্বার্থতা, কোমলতা, স্নেহ মমতা প্রভৃতি বিকাশ পাইত ? ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিও, সুখী সুস্থ ও ধর্ম্মানুগত পরিবারের ন্যায় মানব-চরিত্রের সদ্‌গুণ রাশির শিক্ষা-ভূমি দ্বিতীয় নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি সমুদয় ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

যাহা হউক যে জন্য এত কথা বলা যাইতেছে, তাহা এই, মানব-জীবনের সকল বিভাগেই দেখিতেছি, সত্যের সহিত সংস্পর্শ ভিন্ন মানবের শিক্ষা হয় না। ধর্ম্মজীবনের শিক্ষা কি কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে ? কল্পনাতে অবস্থা সৃষ্টি করিয়া, তন্মধ্যে পড়িয়া, ভাবোচ্ছ্বাস সম্ভোগ করিয়া, কি মানুষ গড়িতে পারে ? মানুষ গড়ার অর্থ কি ? জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, ভাব প্রবল হইবে, ধর্ম্মবুদ্ধি প্রখর হইবে, ইচ্ছা দৃঢ় হইবে, কার্য্যশক্তি বাড়িবে, তবে মানুষ গড়িবে। ইহার জন্য সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনার প্রয়োজন। ঈশ্বরকে ভাবরাজ্যে বদ্ধ রাখিয়া আমি পত্নী তিনি পতি, আমি বন্ধু তিনি সখা, ইত্যাদি প্রকারে ভাবসম্ভোগ করিলেই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না। তাঁহাকে সত্যভাবে ধারণা করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান তাহাকে সত্যভাবে ধরিবে, প্রেম তাঁহাকে প্রেমাস্পদরূপে বরণ করিবে, ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে প্রেরকরূপে গ্রহণ করিবে, ইচ্ছা তাঁহাকে অধিপতিরূপে লইবে, তবে সমগ্র প্রকৃতির দ্বারা তাঁহাকে সত্যরূপে লওয়া হইবে। যতক্ষণ তিনি উজ্জ্বল সত্যরূপে আত্মার নিকট প্রতিভাত না হন, ততক্ষণ

তাঁহার অর্চ্চনা অর্চ্চনাই নয়। এই জন্যই বোধ হয় সকল সাধ-
নের মূলে তাঁহার সত্যতাতে বিশ্বাস। তিনি সত্য এবং তিনি
প্রাণ, এই বিশ্বাস উজ্জ্বল না হইলে, কোনও সাধনের প্রকৃত
ফল ফলিবে না। আর এটী অনুমানের বা কল্পনার জিনিষ
নয়। আন্তর-প্রত্যক্ষের বিষয়। এই আন্তর-প্রত্যক্ষই প্রকৃত
অর্চ্চনার ভিত্তি। সেই অর্চ্চনাই সমগ্র প্রকৃতিকে উন্নত করে
ও ধর্ম্মজীবনকে গঠন করে।

নব-জীবন।

প্রকৃতিরাজ্যে যেখানেই জীবন বা উন্নতি দেখি, সেখানেই ক্রমবিকাশ। কুত্রাপি আকস্মিক ও গুরুতর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু হইতে প্রকাণ্ডকায় মহীরূহ পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সৃষ্টির রাজা মানব পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে শক্তি ও তৎসাধ্য কার্য্য সকল বিকশিত হইয়াছে। সৃষ্টি-কর্ত্তার সহিষ্ণুতা অসীম! তিনি কত যুগ ধরিয়া কদর্য্যতার মধ্যে সৌন্দর্য্যকেও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলাকে ফুটাইতেছেন। কোনও বিভাগেই তাঁহার ব্যস্ততার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না! মানব নিজ অসহিষ্ণুতা বশতঃ বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না। শিশুরা যেমন সন্ধ্যাকালে আমের আঁঠিটী পুতিয়া প্রাতে ফলযুক্ত বৃক্ষ দেখিতে চায়, তেমনি অসহিষ্ণু মানব ত্বরিত জগৎকে আপনার ইচ্ছার মত দেখিতে চায়। কিন্তু বিধাতা এই ব্যস্ততা ও উদ্বেগের ভাবে কার্য্য করেন না; তিনি যাহা করিবার ধীরে ধীরে করিতেছেন, রহিয়া বসিয়া ফুটাইতেছেন, অল্পে অল্পে বর্জ্জন ও অল্পে অল্পে গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রক্রিয়াকে বলে বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সর্ব্ব বিভাগেই চলিয়াছে; কেবল যে প্রকৃতিরাজ্যে, যেখানে ভৌতিক শক্তি সকল অনুল্লঙ্ঘ-নীয় নিয়মে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, কেবল যে সেই

রাজ্যেই এই প্রক্রিয়া দেখা যায়, তাহা নহে; মানবসমাজের সভ্যতা ও উন্নতির মধ্যেও এই প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আদিম বর্ব্বর অবস্থা হইতে মানব ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়াছে। অরণ্যবাসী নগ্নদেহ বর্ব্বর মানুষ কালে উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন সভ্য মানুষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সভ্য হইতে যে কতটা পথ চলিতে হইয়াছে, কত ঠকিতে ও শিখিতে হইয়াছে, কত বর্জ্জন ও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা কল্পনাতেও আনা যায় না! কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই এক বিবর্ত্তন প্রক্রিয়া। বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ভিতরকার কথাটা এই, ইহাতে নবীন যাহা কিছু আসে, তাহা রূপান্তরিত প্রাচীন মাত্র; ফল স্বরূপ যে পরবর্ত্তী অবস্থা আসে, তন্মধ্যে কারণ স্বরূপ পূর্ব্বাবস্থা সূক্ষ্মভাবে থাকে। বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে আকস্মিক, গুরুতর ও আমূল পরিবর্ত্তন নাই। প্রকৃতির এই বিবর্ত্তন প্রক্রিয়াতে যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কোনও বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তনের বিষয় স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সন্দিহান।

কিন্তু মানবের ধর্ম্মজীবনের বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, এবং সে বিভাগে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা মানবের চিন্তার গতিকে বায়ুর ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন;—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

অর্থ—হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, ও অতিশয় অশাসিত, তাহাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে নিগ্রহ করার ন্যায় কঠিন বলিয়া মনে করি।

কেবল যে গীতাতেই এই প্রকার উপমা দৃষ্ট হয় তাহা নহে, বাইবেল গ্রন্থে যীশুর উক্তির মধ্যে একস্থানে আছে।

"বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, তুমি কেবল তাহার শব্দই শ্রবণ কর, বলিতে পার না কোথা হইতে আসিতেছে, বা কোথায় যাইতেছে, পরমাত্মজাত প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ।"

মানব-মনকে বায়ুর সহিত তুলনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার গতিবিধিকে নিয়মাধীন রাখা, বা তৎসম্বন্ধে কিছু সুনিশ্চিতরূপে বলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যেমন বায়ুর পক্ষে অকস্মাৎ দিক পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, তেমনি মানব মনের পক্ষেও হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম আকাশ প্রসন্ন, দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু বহিতেছিল, মেঘ বা ঝড় বৃষ্টির নাম মাত্র ছিল না;' রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দক্ষিণের বায়ু পূর্ব্বে বা পূর্ব্বোত্তর কোণে গিয়াছে, এবং প্রচণ্ড বাত্যার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছে। বায়ু কেমন শীঘ্র ফেরে ও কেমন অতর্কিত ভাবে ফেরে! মানব মনও যেন কতকটা সেই প্রকার। যাহাকে আজ এক ভাবে কাজ করিতে দেখিতেছ, এক বিশেষ পথে যাইতে দেখিতেছ, কল্য সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারে; তাহার প্রকৃতিতে আকস্মিক ও গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

ধর্ম্মজগতে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ সকল সংস্কারপ্রয়াসী সম্প্রদায়ের মধ্যে, এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে রাজর্ষি অশোক, খ্রীষ্টধর্ম্মে সেণ্ট পল, চৈতন্যধর্ম্মে জগাই মাধাই প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বিস্ময়জনক। পূর্ব্ব জীবনের সহিত ইঁহাদের পরজীবনের কিছুই সাদৃশ্য ছিল না। দুই একটী ভাব বা কার্য্যের পরিবর্ত্তন নহে, একেবারে সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্ত্তন। বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের মীমাংসা করা যায় না। ইহাতে প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না।

একারণেও বায়ুর সহিত মানব মনের তুলনা হয় যে, বায়ু-সাগরে যেমন কত প্রকার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তি কার্য্য করে, তাহা লক্ষ্য করা যায় না; তেমনি মানব-মনের উপরেও যে কত প্রকার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তি কার্য্য করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই যে আকাশ বা ঈথরপূর্ণ অন্তরীক্ষ রহিয়াছে, ইহাতে অবিশ্রান্ত কত তাড়িত তরঙ্গ বহিতেছে, তাহা কে লক্ষ্য করিতে পারে! কত গতি ও কত শব্দ উত্থিত হইতেছে, ও লয় পাইতেছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে! আলোক, তাড়িত, তাপ প্রভৃতি এই অন্তরীক্ষে কার্য্য করিতেছে। তেমনি মানব মনের উপরে কত দিক দিয়া কত শক্তি খাটিতেছে, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। দেহ ও দৈহিক ধাতু সকলের শক্তি, বাহিরের প্রকৃতির বিবিধ অবস্থার শক্তি, শক্তিশালী ও

প্রতিভাশালী মানুষের শক্তি, মানব-সমাজের শিক্ষা ও শাসনের সম্মিলিত শক্তি, সর্ব্বোপরি সেই হৃদয়বাসী পরম পুরুষের শক্তি, কত শক্তিই কার্য্য করিতেছে। অতএব মানব-মন কখন কোন্‌ভাবে থাকিবে, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

মানব-মনে সময়ে সময়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে আমরা দুই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। প্রথম পরিবর্ত্তন সাময়িক ও আংশিক, দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন স্থায়ী ও আমূল। প্রথমতঃ, ঘটনা ও অবস্থার সমাবেশে, হঠাৎ এক ব্যক্তির বা বহুসংখ্যক ব্যক্তির মনে, কিছুকালের জন্য একটী ভাব প্রবল হইয়া উঠিতে পারে; তখন যেন সেই ভাবের প্রবল হাওয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ের জন্য অপরাপর চিন্তা ও অপরাপর ভাব পশ্চাতে পড়িয়া যায়; মানুষ প্রেতগ্রস্তের ন্যায় সেই বিশেষভাবগ্রস্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু সে ভাব অধিক দিন থাকে না। যে বিশেষ কারণে সে ভাবটীর আবির্ভাব হইয়াছিল, সে কারণটী যখন চলিয়া যায়, তখন পুর্ব্বোক্ত ভাবটীও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। যাহারা এক সময়ে একপথে চলিতেছিল, তাহারা তখন অপর পথে চলিতে আরম্ভ করে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিবৃত্তেই পাওয়া যায়। সকল দেশেই জনমণ্ডলীর মধ্যে সময়ে সময়ে এক একটা বিশেষ ভাব অবতীর্ণ হইয়াছে ও কিছুদিন ধরিয়া কার্য্য করিয়াছে। বিদেশীয়েরা আক্রমণ করিলে জাতিমধ্যে স্বদেশপ্রিয়তা জাগিয়াছে; বীরগণ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। যাগযজ্ঞের নৃশংস হত্যা-

কাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অভ্যুদিত হইবামাত্র সমাজ-মধ্যে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই উক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে; এবং কিছুকাল সহস্র সহস্র লোকের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; আবার সে ধ্বনি কালে তান্ত্রিক বীভৎসাচারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের মধ্যেও আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে, ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সাহায্যে, সহমরণ প্রথা নিবারিত হইল, ও তৎপরেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহ নির্ম্মিত ও তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন কলিকাতার প্রাচীন সমাজমধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। রামমোহন রায়ের দলের জয় দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা বোধ হইল। দলে দলে প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইলেন। এরূপ উৎসাহ ও চিত্তের একাগ্রতা কেহ কখনও দেখে নাই। তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা তুলিলেন; প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিলেন; সংবাদ পত্র বাহির করিলেন; উপদেশক নিযুক্ত করিলেন; কিছুই বাকী রাখিলেন না। সকলের মুখে এক কথা, সকলের এক ভাব। ধর্ম্মসভা ব্রহ্মসভাকে হত্যা করিবে সকলের এই আশা। কিন্তু সে ভাব কতদিন রহিল? যতদিন রামমোহন রায় এদেশে ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলেন; ব্রহ্মসভা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; সেই সঙ্গে ধর্ম্মসভাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আমার বোধ হয়, আজ যদি ব্রহ্মসমাজ উঠিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক হরিসভা, অনেক হিন্দু-

ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী দল উঠিয়া যাইবে। এই সকল সাময়িক উৎসাহ ধর্ম্মভাব নহে। যাহার মূলে বিদ্বেষ তাহা কি ধর্ম্মভাব হইতে পারে?

অতএব আমার বোধ হয়, যাঁহারা ঘটনা বা অবস্থার গুণে, আপনাদের হৃদয়ে উৎসাহ দেখিয়া, তাহাকে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মোৎসাহ মনে করিতেছেন, তাঁহারা হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহা এই প্রকার সাময়িক উৎসাহ কি স্থায়ী ধর্ম্মভাব।

মানব-হৃদয়ে যে দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা স্থায়ী ও আমূলক তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কখন কখনও সাধু সমাগমে ঈশ্বর-কৃপাতে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা আর কিছুই নহে জীবনের লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন। যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত ছিল, বিষয়কেই অন্বেষণ করিতেছিল, বিষয়ের অভিমুখেই চলিতেছিল, সে হঠাৎ এমন সংস্রবে আসিল, এমন কিছু দেখিল, বা শুনিল, যাহাতে তাহার চিত্ত হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হইল, ধর্ম্মই যে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য ইহা সে অনুভব করিল। এই ভাবের আবির্ভাব হইবামাত্র হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তখন সে ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। যতই সে নির্ম্মলচিত্তে ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, ততই তাহার আত্মা ভগবৎ কৃপার অধীন হইতে লাগিল; তাহার হৃদয়ে নবশক্তি ও নবভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

জীবনের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা যখন বদলিয়া যায়, তখন মানুষের সমগ্র চিন্তা ও ভাব বদলিয়া যাইতে থাকে। যেটা

মানব-চিত্তের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যরূপে থাকে, তাহার প্রভাব জীবনের সকল বিভাগেই ব্যাপ্ত হয়। তখন বিষয় বাণিজ্য, গৃহধর্ম্ম, মিত্রতা শত্রুতা, সমুদয় সেই ভাবাপন্ন হইতে থাকে। ইহার প্রভাবে জীবনের সমুদয় সম্বন্ধ একে একে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যাহারা দূরে ছিল, তাহারা নিকটে আসে; যাহারা নিকটে ছিল তাহারা হয়ত দূরে যায়; পুরাতন বিষয়ের ও পাপের সঙ্গীগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; পর আপনার হয়, আপনার হয়ত পর হয়; এই সুমহৎ পরিবর্ত্তন যখন জীবনে ঘটে, তখন তাহাকে বলে নবজীবন।

এই জীবন একদিনে সঞ্চার হইতে পারে; একদিনে নূতন লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে পারে; একদিনে হৃদয়ে নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে; কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিকে ও সমগ্র চরিত্রকে সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী করা একদিনের কর্ম্ম নহে। এই বিষয়ে স্বাভাবিক বিবর্ত্তন প্রক্রিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মানুষ জন্ম হইতে, এবং সামাজিক শিক্ষা হইতে,দেহ মনের মধ্যে যে কিছু দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা এখন তাহার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় ও তাহার গতি-রোধ করিতে থাকে। জন্মলব্ধ ও শিক্ষালব্ধ দুর্ব্বলতাকে অতি-ক্রম করা সহজ নহে। মানুষ যতই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করুক না কেন, তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার দ্বারা সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হইবেই হইবে। যেমন যদি কেহ মনে করে "আমি চাঁদে ঢিল মারিব", এই বলিয়া যদি ঢিল ছোড়ে, তবে

কি সত্য সত্যই চাঁদে ঢিল মারিতে পারে? তাহার হস্তে যতটুকু শক্তি আছে ঢিলটী ততদূরই উঠে; হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে থাকিয়া যায়। তেমনি তুমি একজন মানুষ যে জন্ম ও শিক্ষা হইতে স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তি বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা পাইয়াছে, তুমি যদি আজ আকাঙ্ক্ষা কর, আমি বুদ্ধের ন্যায় বৈরাগী, যীশুর ন্যায় বিশ্বাসী, ও চৈতন্যের ন্যায় প্রেমিক হইব, তুমি কি তাহা হইতে পার? তোমার গূঢ় ইন্দ্রিয়াসক্তি ও স্বার্থপরতা তোমাকে বাধা দিবে। তুমি ভাবের উত্তেজনাতে এক মুহূর্ত্তে যে স্বার্থ দক্ষিণ হস্ত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিবে, আর এক মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে বাম হস্ত দিয়া তাহা টানিয়া কোলের দিকে আনিবে। তোমার ধর্ম্ম উচ্চ উদার ও আধ্যাত্মিক হইলেও, তাহা তোমার বা তোমাদের জীবনের দুর্ব্বলতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিবে। অনেক সময় দেখিতে পাই ধর্ম্মের গতি যেন নদীর গতির ন্যায়; নদী যেমন গৈরিক জমির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইলে গৈরিকরূপ ধারণ করে, কয়লার খনির ভিতর দিয়া বহিলে, কৃষ্ণবর্ণ হয়, তেমনি একই ধর্ম্ম অনেক সময় সভ্যজাতির ভিতর দিয়া বহিলে,উন্নত আকার ধারণ করে; অসভ্য বর্ব্বর নীচ সুখাসক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বহিলে নীচ সুখের রং প্রাপ্ত হয়। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম সভ্য দেশে উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখাইতেছে, তাহাই মর্ম্মনদিগের মধ্যে বহু-বিবাহকে প্রশ্রয় দিতেছে। এরূপ শোনা যায় তাহারা বিশ্বাস করে স্বর্গে

ঈশ্বরের স্ত্রী আছে; কারণ সংসারে যিনি নর নারী সৃষ্টি করিলেন, তিনি স্ত্রী ভিন্ন কিরূপে থাকিবেন ?

মানুষের দেহ মনের মধ্যে যাহা আছে, তাহা দ্বারাই তাহার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হয়; 'একথা যে কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই সত্য তাহা নহে, সামাজিক ভাবেও সত্য। ইহা সকলেই জানেন সাম্য ও স্বাধীনতার মূল মন্ত্র লইয়াই ফরাশি বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্য ও স্বাধীনতার পক্ষীয়গণ অল্প কালের জন্য প্রভুত্ব পাইয়া, স্বাধীনতার নামে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; তাহাদের অন্তরের সাম্য স্বাধীনতা কার্য্যকালে কোথায় গেল ?—এই বৈষম্যের কারণ এই, তাহারা জ্ঞানে সাম্য স্বাধীনতার আদর্শ ধরিয়াছিল, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা ও পরেচ্ছা-দলন-স্পৃহা প্রবল ছিল। যাহা প্রকৃতিতে নিহিত ছিল, যাহা স্বভাব, তাহাই কার্য্য কালে আপনাকে প্রকাশ করিল। ইহা দেখিয়াই আমাদের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,

> ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
> নচাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
> স্বভাব এ বাত্র তথাতিরিচ্যতে
> যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

অর্থ—যাহার প্রকৃতি অসৎ সে যদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, বা বেদাধ্যয়ন করে, তাহাতেই যে সে সৎ হইবে তাহা নহে,

এ বিষয়ে দেখিতে পাই,গাভীর দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ মিষ্ট, তেমনি স্বভাবই কার্য্য করিয়া থাকে।

স্বভাবটা বড় কথা! মানুষ পিতা মাতার কাছে যেটা পায়, বংশপরম্পরাক্রমে সমাজ হইতে যে শিক্ষা আসে, সেটাকে অতিক্রম করা অনেক দিনের, অনেক সাধনশ্রমের কর্ম্ম। বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়াসক্ত পিতামাতার চিন্তা করা কর্ত্তব্য, যে তাঁহাদের প্রকৃতির ও কার্য্যের ফল তাঁহাদের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে না; তাঁহারা সন্তানদিগকে এমন প্রকৃতি দিয়া যাইবেন, যাহা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের প্রতিকূল।

জন্ম ও শিক্ষালব্ধ প্রকৃতিটাকে এত বড় করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, ধর্ম্ম-সাধনের পথে যিনি অগ্রসর হইতেছেন, তিনি যেন জানেন যে তাঁহার সম্মুখে গুরুতর শ্রম ও তপস্যা রহিয়াছে। তিনি যদি নিজ দেহ মনের দুর্ব্বলতার দ্বারা বার বার অভিভূত হন, তথাপি যেন নিরাশ না হন। সর্ব্বদাই যেন স্মরণ রাখেন, যে বহু বহু যুগে যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা দুই দিনে কেন পূর্ণ হইব? তবে আদর্শটাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে উজ্জ্বল রাখিতে হইবে; এবং ধর্ম্মজীবন রক্ষার উপায় বিধান করিতে হইবে।

ধর্ম্মজীবন রক্ষার উপায় কি? দেহের জীবন রক্ষার যে উপায়, ধর্ম্মজীবন রক্ষার সেই উপায়। দেহের জীবন রক্ষার উপায় দুইটি প্রক্রিয়া—গ্রহণ ও বর্জ্জন। পুষ্টিকর অন্ন পান গ্রহণ করা, এবং বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিজনক যাহা কিছু

সমুদয়কে বর্জ্জন করা। ধর্ম্মজীবনের রক্ষার নিমিত্ত কি গ্রহণ করিতে হইবে ও কি বর্জ্জন করিতে হইবে ? গ্রহণ করিতে হইবে ধর্ম্মজীবনের অন্নপান স্বরূপ যিনি তাঁহাকে, বর্জ্জন করিতে হইবে তাঁহার আদেশবিরুদ্ধ যাহা তাহাকে,—অর্থাৎ পাপকে। ধর্ম্ম-জীবনে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই মনে করিতে হইবে যে ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তাঁহার উপাসনার ন্যায় ধর্ম্মজীবনের পোষক কিছু নাই। প্রত্যেকের এই উপাসনাতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর শিক্ষক

বেদে নিম্নলিখিত বচনটী পাওয়া যায় ;—

ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি—

"তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেও।"

পিতার কার্য্য জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া। পিতা মাতা উভয়েই পালন করেন এবং উভয়েই শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞান-শিক্ষা দিবার ভার যেন অধিকাংশ পিতারই উপরে। জগতের অধিকাংশ সমাজে এখনও এই রীতি রহিয়াছে। যে ঋষি উক্ত বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই মানব ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। দেখিয়াছেন, ঈশ্বর মানবের হৃদয়ে সন্নিহিত থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছেন ; যুগে যুগে মানবের জ্ঞান-দৃষ্টির নিকটে জ্ঞানের তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া মানবকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইতেছেন ; সেই জন্যই বলিয়াছেন, "তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেও।"

সংসারে পিতা কি প্রকারে সন্তানকে জ্ঞানশিক্ষা দিয়া থাকেন? অল্পে অল্পে সন্তানের ধারণা শক্তির যেমন উন্মেষ

হয়, অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিকটে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল প্রকাশ করিতে থাকেন। বিষয় সম্পত্তি কোথায় কি আছে, ব্যবসা বাণিজ্য কোথায় কি চলিতেছে, জমিদারীর কোথায় কি বন্দোবস্ত আছে, কোন্ কর্ম্মচারীর প্রতি কোন্ ভার আছে, এ সমুদয় ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত করিতে থাকেন। সন্তানকে নিজের কাজের সহায় করিয়া লইয়া, কিরূপে সংসার চালাইতে হয় তাহার শিক্ষা দেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে, অনেক ধনী গৃহস্থের ভবনে এরূপ নিয়ম আছে, যে তাঁহারা বাড়ীর যে ছেলেকে যে কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অগ্রে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মনে কর লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ রথচাইলড্ নামক পরিবারের একটী কেতাববাঁধা দপ্তরীর কারখানা আছে, তাহাতে অনেক টাকা লাভ হয়। গৃহস্বামী মনে করিলেন পুত্রদিগের একজনকে সেই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক করিবেন। অগ্রে তাহাকে লেখা পড়া শিখাইয়া, সর্ব্ব প্রথমে একটা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, তাহাকে একটা পুস্তকবাঁধা কাজে নিযুক্ত করিলেন। সে দপ্তরীদের সঙ্গে বসিয়া নিজ হাতে কেতাব বাঁধিতে লাগিল। সে কাজটা শিখিয়া ও বুঝিয়া লইলে, আর একটু উন্নত কাজে দিলেন, সেটা বুঝিয়া লইলে, হিসাব পত্রের খাতায় বসাইলেন, সেটা শিখিলে আর এক স্থানে দিলেন। এইরূপে সে নিজ চক্ষে দেখিয়া, ও নিজ হাতে করিয়া, সমুদয় শিখিয়া ও বুঝিয়া লইল। তৎপরে সে যখন তত্ত্বাবধায়ক হইয়া বসিল, তখন তাহাকে

প্রবঞ্চনা করা কাহারও সাধ্যে থাকিল না। ইহাকে চলিত ভাষায় বলে, হাতে কলমে শিখান।

জগদীশ্বর এইরূপে মানব-জাতিকে হাতে কলমে শিখাইতে-ছেন। সমগ্র মানব-জাতিকে যদি একটী মানুষের মত মনে করা যায়, এবং ঈশ্বরকে তাহার পিতা ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, যুগ যুগ ধরিয়া যেন এই ব্যাপার চলিতেছে। আদিম মানুষ নগ্ন ও পশু অপেক্ষাও হীন অবস্থাতে এ জগতে আসিয়াছিল; এখনও মানব-সন্তান সেই অবস্থাতেই জগতে আসিতেছে। পশু অপেক্ষা হীন অবস্থা এইজন্য বলিতেছি, যে পশুর শাবকেরা মানব-শিশুর ন্যায় অসহায় নয়। গো মেষের শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়া দুই দণ্ডের মধ্যেই উঠিয়া দাঁড়ায়, এবং তাহার শরীর চর্ম্মাবৃত থাকে, যদ্দারা সে শীতাতপ সহ্য করিতে পারে। মানব-শিশু যখন জগতে আসে, তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কিন্তু সেই নগ্নদেহ, অসহায় ও অসমর্থ মানবই জগতকে বর্ত্তমান অবস্থাতে আনিয়াছে। যে সকল শক্তি এক সময়ে মানবকে বিনাশ করিত, ও যাহাদের ভয়ে মানব সর্ব্বদা ভীত থাকিত, ও কত স্তুতি বন্দনা করিত, এক্ষণে তাহারাই মানবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া রহিয়াছে। আমরা বালক কালে পুরাণে পড়িয়াছি, রাবণ রাজা ইন্দ্রকে ছত্রধর করিয়াছিলেন, যমকে দ্বারী করিয়াছিলেন, ও বরুণকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। আজ দেখিতেছি মনুষ্যজাতিই সেই রাবণ রাজা, যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলকে শৃঙ্খলিত

করিয়া স্বীয় কার্য্যে লাগাইতেছে। এক সময়ে জলধি উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মানবকে ভীত ও কম্পিত করিত, আজ মানব সেই তরঙ্গোপরি নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে ? এক সময়ে অগ্নি প্রবল জ্বালা বিস্তার করিয়া, মানবের ধন ধান্য ভস্মসাৎ করিত, আজ মানব সেই অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় নিজ শকটে যুতিয়া টানাইয়া লইতেছে! এক সময়ে গগনবিহারী তাড়িত বজ্র নিনাদে মানবকে কম্পিত করিয়া তাহাকে হতচেতন ও ধরাশায়ী করিত, আজ মানব সেই তাড়িতের ডানা বাঁধিয়া আপনার গৃহ আলোকিত করিয়া লইতেছে! সেই নগ্ন অসহায় ও বন্যাবস্থার মানব এতটা করিয়াছে! দেখ ঈশ্বরের হাতে কলমে শিক্ষা দিবার কত গুণ। তিনি কি স্বীয় পুত্রকে স্বীয় বিষয় বিভব শক্তি সামর্থ্য সমুদয় বুঝাইয়া দিতেছেন না ?

সকল জ্ঞানই ত অভিব্যক্তিমাত্র—অর্থাৎ যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা ও বুঝাইয়া দেওয়া মাত্র। কোনও জ্ঞানই নূতন সৃষ্টি নহে। মানুষের যে এত বিষয় বিভব, শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, তাহার এক কণাও বৃষ্টিধারার ন্যায় উপর হইতে বর্ষে নাই ; অথবা অপর কোনও জগত হইতে আসে নাই। জগৎ ও মানবাত্মা এই যে দুই খানি গ্রন্থ চিরদিন মানবের হাতের কাছে রহিয়াছে, ঐ সমুদয় কথাই এই দুইএর মধ্যে ছিল, কালে অভিব্যক্ত হইয়াছে এইমাত্র। পিতা যেমন প্রাতে উঠিয়া পুত্রকে কেতাবের সম্মুখে "তুই পড়" বলিয়া বসাইয়া দেন, তেমনি যেন জগৎ-পিতা সৃষ্টির প্রাতঃকালে মানব-জাতিকে "তুই পড়"

বলিয়া এই দুইখানি গ্রন্থের সম্মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। আমাদের অধ্যয়ন আর শেষ হইতেছে না। একটা পড়িয়া শেষ করিতে না করিতে আর একটা নূতন কথা জাগিয়া উঠে; আর একটা নূতন তত্ত্ব প্রকাশ পায়; আমাদের পড়া আর ফুরায় না। অনন্তকালে ফুরাইবে কিনা জানিনা।

বর্ত্তমান যুগে পদার্থবিদ্যার অদ্ভুত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যে জড়জগতের এত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, যে তৎপূর্ব্ব শতাব্দীর জ্ঞানিগণ তাহা স্বপ্নেও সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, এতটা গবেষণা, এতটা আবিষ্কার ও এতটা উন্নতি সত্বেও কি আমরা এ ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছি? এই মহা রঙ্গভুমির সাজ ঘরের খবর কি কিছু পাইয়াছি? সে আশা সদূরপরাহত। বিজ্ঞান যদি বিংশতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে, দশটা সমস্যার মীমাংসা করিয়া থাকে, তবে দুইশত এরূপ সমস্যা তুলিয়া দিয়াছে, যাহার আর জবার পাওয়া যাইতেছে না। হায়, আমরা বাঁশবনে ডোম কাণাব ন্যায়, ব্রহ্মাতের মহারণ্যে তত্ত্বান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সত্য সত্যই এ জগতটা ও এ জীবনটা মহারঙ্গভূমির ন্যায়; আমরা বাহিরে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি; ছায়াবাজীর ছবি সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছি; ঘটনা ও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের ধাক্কা সামলাইতেছি, ভিতর-কার কথা কিছু জানিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যিনি আছেন, তিনি কি প্রণালীতে ও কেন এই ছায়াবাজীর

পুতুল সাজাইয়া আনিতেছেন, তাহা জানিতে পারিতেছি না। জগতে কোনও একটা সত্য যদি ঠিক করিয়া ধরিাত পারা যায়, তাহা মানবের অজ্ঞতা ও শক্তি-হীনতা।

তবে দেখিতেছি আমাদের শিক্ষাটী যুগ যুগ চলিয়াছে এবং চিরদিন চলিবে। ইতিবৃত্ত আর কিছুই নহে, জগদীশ্বর মানবজাতিকে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার বিবরণ মাত্র। জগৎ গ্রন্থ, মানবাত্মা রূপ গ্রন্থ ও তাঁহার নিজ স্বরূপ রূপ গ্রন্থ, এই ত্রিবিধ গ্রন্থ মানবের সমক্ষে খুলিয়া দিয়া তিনি কি দূরে রহিয়াছেন? তিনি নিজে শিক্ষক, গুরু ও আচার্য্যরূপে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। মানবের একাগ্র ও তন্ময় দৃষ্টির নিকটে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাঁহারই দেওয়া। তিনি মানবের ব্যাকুল দৃষ্টির নিকটে কি জগতের তত্ত্ব, কি আত্মতত্ত্ব কিছুই প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই। যেখানেই ব্যাকুলতা, একাগ্রতা, ও তন্ময়তা, এই ত্রিবিধ গুণের সমাবেশ হইয়াছে, সেই খানেই তিনি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে হাতে কলমে দেখিয়াছেন, বিদ্যালোকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঋষি বা সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধি বা ঋষিত্ব কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ নহে। পদার্থজ্ঞান সম্বন্ধেও ঋষিত্ব আছে। যাঁহারা প্রকৃতির যবনিকা উত্তোলন করিয়া পদার্থবিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। এইরূপে নিউটন, গ্যালিলিও, ডারউইন, ফ্যারাডে প্রভৃতিও এক রাজ্যের

ঋষি। ইঁহারা যে জ্ঞানদ্বারা জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, এবং মানবীয় সভ্যতাকে উচ্চতর মঞ্চে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাও ব্যাকুলতা একাগ্রতা ও তন্ময়তা ভিন্ন লাভ করেন নাই। চিত্তশুদ্ধি যে কেবল ধর্ম্মসাধনেই আবশ্যক তাহা নহে, এ জ্ঞানও পবিত্রচিত্ততা ভিন্ন লাভ হয় নাই। গীতাকার বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

শ্রদ্ধা ও সংযম ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। পরম জ্ঞান সম্বন্ধেই যে একথা সত্য তাহা নহে, পদার্থ জ্ঞানে ঋষিত্ব লাভের পক্ষেও ইহা সত্য।

তৎপরে আমাদের দেশে শঙ্কর প্রভৃতি ও পাশ্চাত্য জগতে ক্যাণ্ট প্রভৃতি মনীষিগণ আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সেই ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও তন্ময়তা প্রভৃতি গুণ-ত্রয়ের সমাবেশে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর তাঁহা-দের দিব্যালোক-সম্পন্ন দৃষ্টির নিকটে মানবাত্মার গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সকল জ্ঞানী পুরুষ জগৎ সম্বন্ধে ও মানবাত্মা সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহা যেন শ্রুতি, আর তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল যে বংশপরম্পরাতে নামিয়া আসিয়াছে, তোমার আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহা যেন স্মৃতি। শ্রুতি যেমন জগদীশ্বরের বিধান, স্মৃতিও তেমনি তাঁহারই বিধান। যিনি মানবের শিক্ষার জন্য এই

সকল মহাজনকে অভ্যুদিত করিয়াছেন, তিনিই মানবের শিক্ষার জন্য মানবের ভক্তি শ্রদ্ধাতে ইহাদের কার্য্যের ফলকে স্মৃতিরূপে রক্ষা করিয়াছেন। পিতা বিষয় রাখিয়া গেলে সন্তানে যদি না পায়, তবে বংশপরম্পরাতে ধনী হইতে পারে না; তেমনি সাধুগণ তাঁহাদের গবেষণার ফল রাখিয়া গেলে, তাহা যদি স্মৃতিরূপে মানবের ভক্তি শ্রদ্ধাতে না থাকে, তবে আর মানব-সমাজের উন্নতি হয় না। এই জন্যই বলি, যে ভক্তি শ্রদ্ধাতে প্রাচীনকে রক্ষা করিতেছে, মানব-সভ্যতাকে উচ্চতর মঞ্চে লইয়া যাইতেছে, তাহাও তাঁহার বিধান।

কিন্তু তাঁহার এরূপ বিধি নহে যে জগতের কতিপয় লোক ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং অপর সকলে কেবল স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবে। তোমাতে যদি ঋষিত্ব না থাকে, তুমি কোন্ আলোকে তত্ত্ব সকলকে দেখিবে? যে নিজে সংগীতের তত্ত্ব জানেনা, তাহার রসজ্ঞ নহে, সে কি গায়ক-দিগের গুণাগুণ বিচার করিতে পারে? তেমনি যে নিজে কিয়ৎ-পরিমাণে সত্যের সাক্ষাৎকার করে নাই, সে কি ঋষিগণের মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে? এই জন্য জগদীশ্বর মানব-সমাজে ঋষিত্ব প্রবাহ প্রবহমান রাখিতেছেন। স্মৃতি ও শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুপরম্পরা রহিয়াছে। ঋষিগণ শিষ্যমণ্ড-লীকে জ্ঞানের তত্ত্ব সকল ও আপনাদের গবেষণার প্রণালী শিখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অপরদিগকে বাচনিক উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অপরদিগকে তাহা দেখা-

ইয়া দিয়া গিয়াছেন, এইরূপে এক একটী শাখা নামিয়া আসিতেছে।

তবেই দেখিতেছি ঋষিত্ব, স্মৃতি বা শাস্ত্র ও গুরুপরম্পরা তিনটীই মানবের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত—সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার বিধান।

অপরাবিদ্যা সম্বন্ধে যে কথা খাটে, পরবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পরমাত্মার স্বরূপ ও মানবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিষয়ে যাঁহারা সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এ জগতের ঋষি। তাঁহারাই জগতকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মানবের ধর্ম্মচিন্তাকে উচ্চতর মঞ্চে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ জগতেও, যাহারা অন্ততঃ কিছুপরিমাণে ঋষিত্ব লাভ না করে, তাহারা কিছু দিতে পারে না। যাহারা কেবল স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা "অন্ধেন নীয়-মানা যথান্ধাঃ ;" অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায় গতানু-গতিকেই অনুসরণ করে।

ঋষি, শাস্ত্র ও গুরুপরম্পরা অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধেও বহমান রহিয়াছে। ইহা মানবের শিক্ষার প্রণালীর অন্তর্গত। প্রথমে বিচার করা যাউক, এ রাজ্যে ঋষি কাহারা? যাঁহারা ব্যাকুলতা একাগ্রতা, ও তন্ময়তার গুণে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এক এক বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রতীতি করিয়া-ছেন, তাঁহারাই এ জগতের ঋষি। ভগবদ্গীতাতে ভগবানের উক্তি বলিয়া একটী উক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেটী এই—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন, "আমাকে যে যে ভাবে প্রাপ্ত হয় আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি।"

ইহার অর্থ অনেকে এই ভাবে করিয়াছেন, ভগবানকে যে যে ভাবে ধ্যান করে' ভগবান তাহার নিকটে সেই ভাবেই দেখা দিয়া থাকেন;—যে তাঁহাকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় ধ্যান করে, তাহার নিকট কাষ্ঠ লোষ্ট্র হইয়াই প্রকাশ পান ইত্যাদি। আমি ইহার আব এক প্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকি। সেই অনন্ত-স্বরূপ পরম পুরুষের অনন্ত দিকে অনন্ত ভাব: তাঁগার স্বরূপের যে ভাব যে ভক্তের হৃদয়ে জাগে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া সেই ভক্ত যদি ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও তন্ময়তার সহিত সাধন করেন, তবে সেই ভাবেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, ভগবানের দেখা পান। বলিতে গেলে পিতা, মাতা, সখা, গুরু প্রভৃতি কোনও শব্দই তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তিনি ক্ষুদ্র মানবীয় পিতা হইতে অনন্তগুণে পিতা। হায়! পিতা মাতা শব্দের দ্বারা তাঁহায় কি ভাব ব্যক্ত হইবে! ইহা অনুভব করিয়াই ভক্তিভাজন ঋষিগণ বলিয়াছেন, "পিতৃতমঃ পিতৃণাং", তিনি পিতাদিগের মধ্যে পিতৃতম। অথচ তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা, গুরু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। তাঁহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাঁহাকে আমরা যে ভাবে লক্ষ্য করি, তাহার উপরেই এ সকল সম্বোধন নির্ভর করে। বহুপ্রসারিত নদীর বারিকে

যেমন ক্ষুদ্র পাইপ বা প্রণালী দিয়া গৃহস্থের ঘরে আনিতে হয়, তেমনি সেই অনন্ত পুরুষের অনন্তমুখীন স্বরূপকে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে প্রকাশিত ভাবের দ্বারাই সাধন করিতে হয়। অতএব তিনি পিতাও বটে, মাতাও বটে, সখাও বটে গুরুও বটে,—ইহার কোনও শব্দই তাহাতে খাটে না, অথচ সকলি তাঁহাতে খাটে। আমরা জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, তাঁহার স্বরূপের এক একটা দিক অবলম্বন করিয়া কেহ পিতৃ ভাবে, কেহ মাতৃ ভাবে, কেহ প্রভু ভাবে, কেহ সখা ভাবে, সাধন করিয়াছিলেন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে সাধনার দ্বারা যাহা লাভ করিলেন, তাহাই সময়ান্তরে স্মৃতির আকারে নিবদ্ধ হইয়া মানবের ধর্ম্মসম্পত্তি-রূপে পরিণত হইল। আজ যে তুমি আমি উন্নত ধর্ম্মজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইয়াছি, তাহা ইহাঁদেরই সাধনা ও সিদ্ধিলাভের ফল।

এ জগতের ঋষি, শাস্ত্র ও গুরুগণ মানবের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত, এক মহাবিধানের অঙ্গস্বরূপ। এই চক্ষে মানব-ইতি-বৃত্তকে দেখিলে কি এক মহাভাব আমাদের হৃদয়ে জাগে! তখন বাস্তবিকই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের সহিত একবাক্য হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি"

"তুমি আমাদের পিতা, আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দেও।" আবার বলি, সমগ্র মানবজাতিকে একটী

মানুষরূপে এবং মানবের অভ্যুদয় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এই সকল যুগকে সেই মানুষের জীবনকালরূপে কল্পনা করিয়া দেখ, দেখ, ঈশ্বর কিরূপে নিজ সন্তানকে হাতে কলমে শিখাইতেছেন, দেখ তাহার জন্য কিরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু ও আচার্য্য নিয়োগ করিতেছেন, কেমন তাহার জন্য ঋষিদিগকে অভ্যুদিত করিতেছেন, তাঁহাদের উক্তিকে শাস্ত্রে রক্ষা করিতেছেন, এবং মানবের জ্ঞানসম্পত্তিকে বাড়াইতেছেন। এমন পিতার হস্তে আমরা যখন রহিয়াছি, তখন আমাদের ভাবনা কি ?

এখানে একটী বিষয়ের জন্য কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে। জগদীশ্বর মানবের শিক্ষার জন্য ঋষি, শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য, মানবকে উচ্চ হইতে উচ্চতর মঞ্চে লইয়া যাওয়া, কিন্তু যাঁহারা শিক্ষকরূপে আসিলেন, মানুষ তাঁহাদিগকে অনেকস্থলে ব্যবস্থাপক বা অভ্রান্ত বিধি নিষেধের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইহা কি পরিতাপের বিষয় ! ধর্ম্ম ও মানবকে স্বাধীনতা আনিয়া না দিয়া বন্ধন আনিয়া দিল।

উন্নতির অর্থ যাহা আজ পাইলে তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়া ; উন্নতির অর্থ ভ্রমবর্জ্জন ও নবসত্য গ্রহণ ; যদি এক যুগের প্রকাশিত তত্ত্বে মানুষ দশযুগ আবদ্ধ থাকে, তবে উন্নতি কোথায় ? ঈশ্বর ঋষিদিগকে ব্যবস্থাপকরূপে নিয়োগ করেন নাই, শিক্ষকরূপে নিয়োগ করিয়াছেন ইহা মনে রাখিলেই শাস্ত্র ও আচার্য্যকে কি ভাবে দেখিতে হয় তাহা

আমরা বুঝিতে পারি। তিনি সৃষ্টিলীলাতে আপনাকেই অভি-ব্যক্ত করিতেছেন সত্য, কিন্তু সে অভিব্যক্তি কি একেবারে, এক দিনে, এক যুগে, পূর্ণমাত্রায় হইতেছে? কখনই নহে। মানবকে নিরন্তর বর্জ্জন ও গ্রহণ করিতে করিতে যাইতে হইতেছে। মান-বীয় মন অপূর্ণতার দোষে দূষিত থাকিতেছে। আবার পরযুগে তদপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব সকল অভিব্যক্ত হইয়া মানুষকে উচ্চতর মঞ্চে লইয়া যাইতেছে। ইহা কখনই বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মানবের কর্ত্তব্য কেবল নিজ হৃদয়স্থিত আলোকের অনু-সরণ করা, সে আলোককে ক্ষীণালোক বলিতে চাও বল,—কিন্তু এই ক্ষীণালোক ভিন্ন অপর আলোক মানুষের হস্তে নাই। এই ক্ষীণালোকেই শাস্ত্র ও গুরু সকলকে দেখিতে হইবে; এই ক্ষীণালোকের সাহায্যেই উঠিয়া, পড়িয়া, হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আফ্রিকাদেশীয় উটপক্ষীর ন্যায় জ্ঞানচক্ষু মুদিয়া, শাস্ত্র বা গুরুরূপ বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া, আপনাকে নিরাপদ ভাবিলে কি হইবে, সে নিরাপদ ভাব মুক্তিকে আনয়ন করে না; মুক্তি কেবল ব্যাকুলতা, একাগ্রতা ও তন্ময়তার দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্ম-জীবনের উৎস।

একটী শিশুর রক্ষণ ও প্রতিপালন কিরূপ পরিশ্রম ও তৎপরতার কর্ম্ম তাহা আমরা সকলেই জানি অথবা অনুভব করিতে পারি। দিনের মধ্যে দশ বার যাহারা আহার করে এবং দিনের মধ্যে দশবার যাহাদের শয্যা ও পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, শীতাতপের বৈষম্য যাহাদের নবজাত স্নায়ুমণ্ডলে অতি সহজে কাজ করে, তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করা কতটা মনোযোগের কার্য্য! যাহারা আপনাদের অভাব জ্ঞাত করিতে পারে না, তাহাদের অভাব বুঝিয়া তাহার প্রতিবিধান করা কতটা চতুরতার কার্য্য! অথচ দেশেযে লক্ষ লক্ষ এ প্রকার শিশু বাস করিতেছে, সে জন্য, না দেশের রাজা, না আমরা কেহই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হই। কারণ আমরা জানি ঐ লক্ষ লক্ষ শিশুর পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ মাতাও রহিয়াছে। শিশুর যে কিছু অভাব তাহা নিবারণের পক্ষে মাতৃ-স্নেহই যথেষ্ট। ইহা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নয়, যে সকল মাতাই সকল সময়েই শিশুর সকল অভাব পূরণ করিতে পারে। তাহা যদি হইবে তাহা হইলে এত শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে কেন? সমুচিত শিক্ষার অভাবে অনেক মাতা শিশুর রক্ষা করিতে পারে না; তাহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয়, হয়ত অনেক সময় জন্মের মত শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু তথাপি

একথা বলিতেই হইবে যে মাতৃ-স্নেহই শিশুর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। আজ অজ্ঞতাবশতঃ জননী যেটা ধরিতে পারিতেছে না, কাল যখন ধরিবে তখনই তার প্রতীকার করিবে। আজ যে পরিমাণে মনোযোগ ও যে পরিমাণে শ্রম দিতেছে কাল যদি তাহার দশগুণ দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা দিবে। ঐ মাতৃস্নেহে যেন অসীম স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে! অসীম সহ্য-শক্তি ও অসীম কার্য্য-শক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে! সেই জন্যই আমরা মনে করি শিশুর রক্ষা ও পরিপালনের জন্য মাতৃ-স্নেহই যথেষ্ট।

যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে সেইরূপ সামাজিক ভাবে। যদি আমরা দেখিতে পাই কোনও দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে স্বদেশপ্রিয়তা আছে, তাহা হইলে আমরা অনেকটা নির্ভর করিতে পারি যে রাজনীতি সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। অর্থাৎ ইহা মনে করিতে পারি যে ঐ স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাই তাহাদের সর্ব্ববিধ রাজ-নীতি বিষয়ক অভাব পূরণ করিবে ও উন্নতি সাধন করিবে। তাহারা যে সকল সময়ে সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবে, সমুদয় আইন গুলি যে উৎকৃষ্ট ও প্রজাপুঞ্জের সুখবর্দ্ধক হইবে, রাজ-শাসনার্থ উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিধিই যে কল্যাণ ফল প্রসব করিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। মানুষের কার্য্যে সর্ব্বদাই যেরূপ ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যেরূপ অকল্যাণ ভোগ করিতে হয়, তাহাদেরও হয়ত বার বার

তেমনি ঘটিবে ; আজ যাহা করিল, দশ বৎসর পরে হয়ত তাহার সংশোধন করিতে হইবে ; কিন্তু গড়ের উপরে একথা বলা যায়, তাহাদের স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাহাদিগকে সজাগ রাখিবে, স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তাতে নিযুক্ত করিবে, ভ্রমপ্রমাদ যাহা কিছু ঘটিবে সমুদয় সংশোধন করিয়া লইবে। কেবল তাহা নহে, মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছি ইহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অসীম ; সেইরূপ এ প্রেমও নব নব বিপদের সহিত নব নব ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে। আজ দেখিতেছি কয়েক সহস্র যোদ্ধা স্বদেশ রক্ষার জন্য সশস্ত্র হইয়াছে, সমরক্ষেত্রে গিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে. কিন্তু উহাদের সহ্যশক্তি ও কার্য্যশক্তির কি অবসান হইয়াছে ? ঐ স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা রূপ উৎস হইতে আরও কত বীরত্ব যে উৎসারিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে ? এখন সমরক্ষেত্রে পুরুষদিগকে দেখিতেছ, পশ্চাতে নারীরা ও তাহাদের গর্ভজাত বালকেরা রহিয়াছে, যখন প্রত্যেক দ্বাদশ বর্ষীয় বালক ও দলে দলে রমণী সমরসজ্জায় সাজিবে, তখন বুঝিবে ঐ স্বদেশ-প্রিয়তার শক্তি কত। ইতিহাসে প্রবাদ আছে, একবার কার্থেজ-বাসিনী নারীগণ দড়াদড়ি করিবার জন্য আপনাদের দীর্ঘ কেশ কাটিয়া দিয়াছিলেন ; এবং গোলাগুলি নির্ম্মাণের জন্য আপনাদের দেহের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও রাজপুত বীরাঙ্গনাদিগের বীরত্ব জগতের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

এইত গেল সমর কালের বীরত্ব। জগতের স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি সকল স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার গুণে শান্তির সময়ে আপনাদের রাজনীতির যে প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় দেখি তাহাদের কার্য্য সকল ভ্রম প্রমাদে পূর্ণ। তাহারা যেমন অগ্রসর হইতেছে, প্রতি পদেই এক সময়ের শাসন-প্রণালী ও এক সময়ের রাজ বিধি অপর সময়ে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছে। এ কারণে তাহাদের মধ্যে বার বার অন্তর্বিদ্রোহ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব ঘটিয়াছে। পশ্চাতে রহিয়াছে স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, তাহাতেই সমুদয় সামলাইয়া লইতেছে; সেই উৎস হইতেই সমুদয় শক্তি উঠিতেছে, সমুদয় বিধি ব্যবস্থা আসিতেছে। এই জন্যই বলা যায়, যে জাতীয় হৃদয়ে যদি স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা থাকে, তবে তাহা সে জাতির সর্ব্ববিধ রাজনীতির উন্নতি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট।

মানব-চরিত্রের উন্নতি-বিষয়েও এরূপ একটী উৎস আছে; সেটী ঈশ্বর-প্রীতি। যে ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি জাগিয়াছে, সে যথার্থ নব-জীবন পাইয়াছে। তাহার পক্ষে একথা বলা যায় যে তাহার হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মই তাহার রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। সে মানুষ যে কখনও ভ্রম-প্রমাদে পড়িবে না, বা জীবনপথে চলিতে চলিতে পদস্খলিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং ইহাই আশা করা উচিত যে দুর্ব্বলতা বশতঃ যে প্রবৃত্তি

কুলের দ্বারা বার বার অভিভূত হইবে; আপনার সমগ্র প্রকৃতিকে ধর্ম্মের অধীনে আনিতে এক একবার সংগ্রামে পরাস্ত হইবে; হয়ত এমন কাজ করিয়া ফেলিবে যে জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে; কিন্তু গড়ের উপরে একথা বলিতে পারা যায়, যে ঐ হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর-প্রীতিই তাহাকে সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেস্ট।

বার বার এ কথা বলা হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, মানবের হৃদয়টা একদিনে ফিরিতে পারে, নব জীবনটা একদিনে জাগিতে পারে, কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিটা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হওয়া একদিনের কর্ম্ম নহে। তাহা দূরন্ত পরিশ্রম-সাধ্য। যদি জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বর-প্রীতিটা হৃদয়ে থাকে, তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে ঐ প্রীতি-রূপ উৎস হইতে সেই শক্তি উঠিবে, যাহা সমুদয় দুর্ব্বলতাকে সামলাইয়া লইবে। সে মানুষ মরিয়াও মরিবে না।

একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা সত্য, একটী ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ধর্ম্ম-সমাজটী যদি এরূপ হয় যে তদন্তর্গত অধিকাংশ নরনারী নব-জীবন-প্রাপ্ত অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি উৎসস্বরূপ বাস করিতেছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে ঐ হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মভাব তাহাদের সর্ব্ববিধ অকল্যাণ নিবারণ ও কল্যাণ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ কেহ বলিতে পারিবে না যে, সে সমাজের লোকের কার্য্যে বা আচরণে কখনও ভ্রম প্রমাদ হইবে না, বা তাহাদের মধ্যে

গুরুতর দুর্নীতি কখনও দেখা দিবে না, অথবা সর্ব্বদাই এবং সকল স্থলেই তাহারা গুছাইয়া কাজ করিতে পারিবে, অথবা তাহাদের সামাজিক কার্য্য-নির্ব্বাহ-প্রণালী সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ ও সুবিচার-সঙ্গত হইবে, কিন্তু গড়ের উপরে এটা বলিতে পারা যায়, তাহাদের যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ঘটুক না কেন, ঐ হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মভাব সমুদয় সামলাইয়া লইবে।

এখানে দুইটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই, ধর্ম্ম-সমাজকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে ও কি প্রকারে উন্নতির অভিমুখে লইয়া যাইতে হইবে, এ চিন্তাতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে ইহা জানা আবশ্যক যে ধর্ম্ম-সমাজকে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় তাহার অঙ্গীভূত নর-নারীর অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতিকে জাগ্রত করা অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করা। যদি এ জিনিসটী না থাকে, তাহা হইলে রক্ষা ও উন্নতির জন্য যে কিছু বাহিরের উপায় অবলম্বিত হউক না কেন, কিছুতেই তদ্দ্বারা সে সমাজ সুরক্ষিত হইবে না। যেমন দেশের লোকের হৃদয় হইতে নীতির প্রতি অনুরাগ বিলুপ্ত হইলে, আইন আদালত প্রভৃতির দ্বারা তাহা-দিগকে কখনই সুনীতির মধ্যে রক্ষা করা যায় না, তাহারা এমন সকল পাপে লিপ্ত হয়, আইন আদালত যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি একটী মণ্ডলী হইতে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইলে, কোনও সামাজিক শাসন দ্বারা তাহাদিগকে সুপথে

রক্ষা করা যায় না। তাহারা ঘোর বিষয়ী হইয়া বিবিধ কদাচারে নিমগ্ন হয়।

দ্বিতীয় কথা এই, এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মসমাজ নামে আমরা যত মণ্ডলী দেখিতেছি, সে সমুদয়ই যে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ তাহা নহে; অথবা ধর্ম্মসমাজ মধ্যে যত পুরুষ বা রমণীকে দেখিতেছি তাহারা সকলেই যে প্রকৃত ধর্ম্মসমাজ-ভুক্ত মানুষ তাহাও নহে। ধর্ম্ম মতে বদ্ধ না থাকিয়া যখন একটী মণ্ডলীর আকার পরিগ্রহ করে, তখন নানা শ্রেণী লোক নানা ভাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। সকলেই নব-জীবন প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত ঈশ্বরপ্রীতির অধীন হইয়া আসে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে আমরা যত পুরুষ ও রমণী দেখিতেছি, সকলেই কি ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়াছেন? তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত এরূপ অনেক লোক আসিয়াছেন, যাঁহারা কোনও বিশেষ কারণে প্রাচীন সমাজ হইতে বর্জ্জিত হইয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া একটা সমাজ দাঁড়াইয়াছে, যাহারা জাতিভেদ মানেনা, সেখানে গেলে আশ্রয় ও সামাজিক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাই আসিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মার্থে আসেন নাই, ধর্ম্মও চাহিতেছেন না; চাহিয়াছিলেন সামাজিক আশ্রয় ও সামাজিক সাহায্য, তাহা পাইয়াছেন ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। হয়ত এভাবে অনেকে আসিয়াছেন যে,

ইহাদের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা আছে, বাল্যবিবাহ নাই, সুসভ্য ও উন্নত রীতিতে গৃহধর্ম্ম এখানে করা যায়। তাঁহারা বর বা কন্যা অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট আছেন। বহু সংখ্যক এরূপ রমণী আসিয়াছেন যাঁহারা নবজীবন পাইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া আসেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের পতিগণ আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ও আসিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। হয়ত বহুসংখ্যক বালক বালিকা এরূপ রহিয়াছে, যাহারা এখনও নবজীবন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের অন্তরে ঈশ্বরপ্রীতি জাগ্রত হয় নাই, তাহারা ব্রাহ্মসমাজে ভূমিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছে। একটা সমাজ বাঁধিলেই নানা ভাবের ও নানা অভিসন্ধির লোক তাহার সহিত সম্মিলিত হইবে তাহা অনিবার্য্য; কিন্তু সেই সমাজ মধ্যে যদি এরূপ শক্তি থাকে, এরূপ সতেজ ধর্ম্মভাব থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্র অভিসন্ধি লইয়া কেহ আসিলেও তাহার অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি জ্বালিয়া দেয়, যে নবজীবন লইয়া আসে নাই তাহাকে নব-জীবনে দীক্ষিত করিয়া ছাড়ে, তাহা হইলে সে সমাজ ধর্ম্মসমাজ থাকে ও তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশার সম্পূর্ণ কারণ থাকে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি এরূপ হয় যে, যে ক্ষুদ্র পার্থিব অভিসন্ধি লইয়া আসিল, বা যে গৃহে জন্মিল, তাহাকে নব-জীবন দিতে পারা গেল না, বরং সে নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তরে বিষয়াসক্তির সংক্রামক ব্যাধি প্রবিষ্ট করিয়া দিল,

এবং সমাজ মধ্যে যে কিছু ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা নিবাইবার পক্ষেই সহায়তা করিল, তাহা হইলে জানা যায় যে, সে সমাজ উত্তরকালে ধর্ম্মসমাজ থাকিবে না, সে উৎস শুকাইয়া যাইবে, যাহা তাহাকে সর্ব্ববিধ বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ।

তএব আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির ও ধর্ম্ম-সমাজের ধর্ম্মজীবনকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি। ইহা যাহার হৃদয়ে না জাগিয়াছে, সে মানুষ এখনও ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে নাই। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি জাগা কাহাকে বলে? অনেকে হয়ত স্বীয় স্বীয় হৃদয় পরীক্ষা করিয়া বলিবেন, বাঃ আমরা কি ঈশ্বরকে প্রীতি করি না? আমরা কি তাঁহাকে সত্য বলিয়া জানি না? আমরা কি তাঁর উপাসনাতে বসি না? আমরা কি তাঁর অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান করি না? ইহার অতিরিক্ত জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি বলিয়া আবার কি পদার্থ আছে? মনে রাখা উচিত জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতির কতকগুলি লক্ষণ আছে, প্রত্যেক নব-জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল লক্ষণ, গুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। প্রধান রূপে তিনটী লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম লক্ষণ এরূপ জীবনে ধর্ম্ম লক্ষ্য, ঈশ্বর লক্ষ্য এবং সংসার উপলক্ষ্য হইয়া থাকে। সেরূপ ব্যক্তি সংসারে বাস করেন, সংসারে কাজ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরে অর্পিত থাকে।

তিনি "আত্মঃ-ক্রীড়ঃ আত্ম-রতি" হন অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রবণ মননে সুখী হইয়া থাকেন, এবং সকল কাজ ও সকল চিন্তার মধ্যে প্রধানরূপে তাঁহার সহিত যোগ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র থাকেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ, তাঁহার আত্মাতে গ্রহণ ও বর্জ্জন, জীবনের এই দুইটী ক্রিয়া প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি অসৎ যাহা তাহাকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন, অপর দিকে সৎ যাহা, পবিত্র যাহা, তাহাকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। এরূপ প্রকৃতিতে একদিকে ধর্ম্মভীরুতা অপর দিকে সাধু-ভক্তি উভয়ই প্রবল দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় লক্ষণ, এরূপ প্রকৃতির ঈশ্বরানুরাগ স্বতঃই নানা প্রকার সাধুতার অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-প্রেমিক আপনাকে জগতের সেবার্থে দিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি নিঃস্বার্থতার আকারে উচ্ছলিত হইতে থাকে। ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনের জন্য তিনি কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। এমন কাজ নাই যাহা তিনি প্রভু পরমেশ্বরের জন্য করিতে পারেন না, এমন ক্লেশ নাই যাহা বহিতে পারেন না।

যে ঈশ্বর-প্রীতি এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে তাহাই ধর্ম্মজীবনের উৎস। যতক্ষণ এই উৎস হৃদয়ে না খোলে ততক্ষণ মনে করা উচিত সে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত!

ঈশ্বর-প্রীতি যখন হৃদয়ে জাগে, তখন মানুষ জীবনের সকল

অবস্থার জন্য তাজা ধর্ম্ম পায়। তখন আর তাহার ধর্ম্ম গ্রন্থে বা মানুষের মুখে থাকে না। এ জগতে মানুষ এক প্রকার সাধুতা দেখায়, যাহার মূলে জনসমাজের শিক্ষা ও শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সকলেই বলে "লোকটী ভাল", "লোকটী ভাল" তাহার অর্থ এই, সে লোকটী তাদের মনের অনুরূপ; তারা যাহা চায়, সে লোকটী তাই, তারা যাহা চায় না, সে লোকটী তাহা করে না। প্রশংসা-প্রিয়তা আমাদের অন্তরের এমনি সূক্ষ্ম ব্যাধি এবং লোক-প্রশংসার মাদকতা শক্তি এমনি অপ্রতর্কিত ভাবে আমাদের মনে কাজ করে, যে আমাদের সাধুতা অনেক সময়ে লোকের দৃষ্টি ও লোকের রসনা দ্বারা গঠিত হয়; তাহার অতিরিক্ত বড় অধিক সারবান পদার্থ তাহার মধ্যে থাকে না।

এইরূপ ভিত্তির উপরে যে সাধুতা দণ্ডায়মান থাকে, তাহা সংসারের সহিত সংঘর্ষণে টেঁকে না; তাহা পাপ প্রলোভনকে বাধা দিতে পারে না; তাহার মূলে আত্মদৃষ্টি থাকে না; সুতরাং তাহা আত্মার অধোগতিকে ধরিতেও পারে না; অজ্ঞাতসারে নামিয়া যায়; অজ্ঞাতসারে বিষয়জালে আবদ্ধ হয়; অজ্ঞাতসারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে; এবং অজ্ঞাতসারে স্বার্থপর ও সুখপ্রিয় হইয়া পড়ে। আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখিতেছি। কত মানুষ এরূপ দেখিতেছি, যাহারা দুই চারি বৎসর ব্রাহ্ম-দিগের সঙ্গে ঘুরিতেছে, দুই চারি বৎসর উচ্চ উচ্চ কথা বলি-তেছে, সদনুষ্ঠানে উৎসাহ দেখাইতেছে, তৎপরে অল্পে অল্পে

গা ঢাকা দিতেছে, স্বার্থ ও সুখের অন্বেষণে ডুবিয়া যাইতেছে। কত বালিকা আমাদের ঘরে জন্মিল, উচ্চশিক্ষা পাইল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, কৌমার দশায় পবিত্রতা, কোমলতা, ও সদাশয়তা প্রভৃতি গুণে সকলকে মুগ্ধ করিল; কিন্তু পরিণীত হইয়া যেই গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিল, যেই সুখ সৌভাগ্যের মুখ দেখিল, আর তাহাদের উদ্দেশ পাওয়া গেল না; যে ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া পালন করিলেন, তাহাদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিয়া উন্নীত করিলেন, তাহাদিগকে উন্নত রকমের গৃহকর্ম্মে প্রবেশ করিবার সুবিধা দিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। ইহার কারণ কি? কারণ এই, ঐ সকল স্থলে জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি জন্মে নাই; হৃদয়ে ধর্ম্মজীবনের উৎস খোলে নাই। সে সকল আত্মা ধর্ম্মের চর্চ্চার মধ্যে থাকিয়া মৃতই রহিয়াছিল।

যে আত্মাতে প্রেম জাগিয়াছে, তাহাকে যেখানেই রাখ ধর্ম্ম তাহার সঙ্গেই আছে। তাহাতে আত্মদৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রত। সে আত্মা একেবারে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে না। ক্ষণিক আসক্তির পাশে বদ্ধ হইতে পারে, দুই দিনের জন্য পথভ্রান্ত হইতে পারে, কিছুকালের জন্য প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হইতে পারে, কিন্তু তাহার মুক্তির দিন ত্বরায় আসে; তাহার হৃদয়-বাসী প্রেম আপনার শক্তিকে আবার জাহির করে; অনুতাপের অগ্নিশিখা আবার উত্থিত হয়; দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আবার জন্মগ্রহণ

করে ; এবং সে দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত আবার ঈশ্বর-চরণে পতিত হয়। এই জন্যই বলি ঈশ্বর-প্রীতিই মানবকে মুক্তি দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বর করুন আমাদের সকলের হৃদয়ে এই উৎস খুলুক।